অদ্বৈতবেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ

ড. শিখা কুণ্ডু
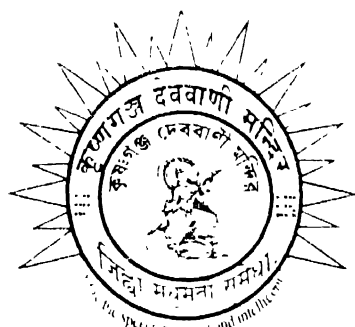
কৃষ্ণগঞ্জ দেববাণী মন্দির

বদনগঞ্জ, হুগলী (প.ব.)

ADAITAVEDANTEE SWAMI VIVEKANANDA

BY DR. SIKHA KUNDU

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৫,

কৃষ্ণগঞ্জ দেববাণী মন্দিরের পক্ষে
সম্পাদক ড. মাধবমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক
ফুলুই ফুল্লেশ্বর মন্দির নিউ ক্যাম্পাস থেকে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শরৎ বুক হাউস, ১৮ বি. শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ (পঃ বঃ),

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমিকা

বিগত শতাব্দীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বামী বিবেকানন্দের যে আবির্ভাব তা প্রকৃতির আকাশে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। জাতির জীবনের অন্ধকারময় রাত্রির তামসিকতার পুঞ্জীভূত পাহাড় অপসৃত হয়েছিল স্বামীজির আলোকোজ্জ্বল অভ্যুদয়ে। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে এসেছিল অভূতপূর্ব এক জাগরণ, অদৃষ্টপূর্ব এক উদ্দীপনা, কর্মোদ্যোগ, আশা ও আত্মত্যাগের জোয়ার। জগতের হিতার্থে ও পরসেবার্থে ত্যাগিশ্রেষ্ঠের এই কর্মপ্রেরণা শুধু তাঁর নিজের মহত্তর জীবনকেই ধন্য করেনি, সারা বিশ্ববাসীর প্রাণেও অভূতপূর্ব প্রেরণা, উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা যুগিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা অভিনব ও মৌলিক। ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার দ্বারা এটি বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে আচার্য শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্ত ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তার উৎকর্ষ এই, অদ্বৈতবেদান্ত কেবল শাস্ত্রনিহিতই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই বেদান্ত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আর বিবেকানন্দের মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদিত অধ্যাত্মবাদকে কেবলমাত্র উপস্থাপন করেননি, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বস্তুবাদকেও তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তায় সুসমন্বিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই, বস্তুকে বাদ দিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তা উদ্ভাসিত হতে পারে না। ''আত্মানম্ অধিকৃত্য বর্ততে ইতি অধ্যাত্মম্'' — অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করে বিদ্যমান যে শরীর ও ইন্দ্রিয় সেটিই 'অধ্যাত্ম' শব্দের অর্থ। 'অধ্যাত্মে ভব ইত্যাধ্যাত্মিক আত্মা।' সুতরাং বস্তুর মধ্যে ঐশী শক্তির ভাবনাই আধ্যাত্মিক ভাবনা। বস্তুকে বাদ দিয়ে আত্মশক্তির অভিব্যক্তি সম্ভবপর নয়। এই কারণে স্বামীজি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের বস্তুবাদ বা জড়বাদকে প্রাচ্য দর্শনের আত্মবাদের সঙ্গে সমন্বয় বিধান করে স্বীয় দার্শনিক চিন্তার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। জীবের জড়ভাব বা পশুভাবকে মন থেকে বিদূরিত করে ও দিব্যভাবকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক হৃদয়ে ব্যক্ত করে সেটিকে সর্বজন-উদ্ভাসিত করাই ছিল স্বামীজির চরম লক্ষ্য। পর্যাপ্ত ভোগ ছাড়া বিবেক. বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি ও সম্যক্ বুদ্ধি কখনই সম্পন্ন হয় না। কেননা প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির সোপান। অহর্নিশ বিষয়ভোগে আচ্ছন্ন হয়ে অবশেষে যে ব্যক্তি সর্বদাই বিষয়ের অসারত্বকে অনুভব করেন, তিনিই ত্যক্তসর্বস্ব ও আপ্তকাম হন। এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও প্রাচ্যের ত্যাগবাদকে সুসমন্বিত করে ভারতীয় দর্শনচিন্তাকে বলিষ্ঠ ও সঞ্জীবিত করেছেন। এবং এর দ্বারা তিনি বর্তমান মানব সমাজের অতিশয় উপকার সাধন করেছেন। তাই এই গ্রন্থে বিবেকানন্দের অমূল্য অভিনব মতবাদকে অদ্বৈত বেদান্তের কষ্টিপাথরে

যথাযথ বিচার করে যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করতে ও তাঁর মৌলিক ভাবনায় সুধীসমাজকে যথাসম্ভব উদ্বুদ্ধ করতে উৎসাহী হয়েছি ।

ভারতবর্ষের বুকে যুগে যুগে বিচিত্র ধরনের ধর্মমত ও পথ পুরাকাল থেকে অদ্যাবধি চলে আসতে দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বয়ং শিবের অবতার এক ঋষিরূপে।[১] সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে আগত এক ঋষি নারায়ণরূপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-সহায়করূপে সমগ্র পৃথিবীকে নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত করেছিলেন। স্বামীজির জন্মের পূর্বে মাতা ভুবনেশ্বরী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাঁর পুত্ররূপে জন্মাবেন । সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করেই জননী পুত্রের নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর, বাল্যকাল থেকেই যিনি ছিলেন শিবভক্ত। সঙ্গে ছিল ধ্যান ধ্যান খেলা। সাহস ছিল অপরিসীম। বুদ্ধি ছিল সুতীক্ষ্ণ । জাতিভেদের কুসংস্কার মনকে নাড়া দিত। পরবর্তী কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরই ঈশ্বর বিষয়ে সহজ সরল ব্যাখ্যায় ও দর্শন চিন্তায় অভিভূত হয়ে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের কাছেই দীক্ষা নেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অভাবের দায়ে পড়ে কিছু কাল অবিস্মরণীয় দুঃখকষ্টও পেয়েছিলেন । কিন্তু বেদান্তের চিন্তা ও শিক্ষা এবং অদ্বৈতমার্গের হাতছানি নরেন্দ্রনাথকে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নিকট হতে অদ্বৈতবেদান্তেব মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হলেন। অদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমত, যা ভগবান্ শঙ্করাচার্য এদেশে প্রচার করেছিলেন গুরু গোবিন্দপাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে, সেই বিদ্যায় তিনি পারদর্শী হলেন। উপলব্ধি করলেন, মানুষের মধ্যেই ভগবান্। শুধু তাই নয়, প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি বিরাজমান। আয়নাতে ময়লা জমে থাকলে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি আমাদের চিত্তদর্পণে মালিন্য জমে থাকায় মনুষ্যজীব নিজের মধ্যে আত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে না। যখন গুরুকৃপায় সমগ্র জগৎটাকে মায়াময় অতএব 'মিথ্যা' বলে মনে হয়, তখনই সাধক নিজের মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। আর তখনই তিনি উপলব্ধি করেন "ব্রহ্মই সত্য ও জগৎ মিথ্যা"। আসলে এই ব্রহ্মাণ্ডটি ব্রহ্ম হতেই জাত। একটি বীজের মধ্যে যেমন ভাবী কালের একটি বৃক্ষ বর্তমান থাকে তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেই সমগ্র জগৎ বর্তমান। ব্রহ্ম আপন ইচ্ছা অনুসারে মায়াকে সৃষ্টি করে মায়িক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই ব্রহ্মকে সত্য বলে জানতে পারলে মানুষ ব্রহ্মের সাথেই একীভূত হয়ে যায়। নিজের পৃথক অস্তিত্ব আর খুঁজে পায় না।

আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি যে ভাষণ দিলেন তা বিশ্বের দুয়ারে সনাতন হিন্দু ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করল। বিশ্বের প্রতিটি মানুষই যে ভগবানের সন্তান, তাই সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, একথা এক হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে শুনে পাশ্চাত্যবাসীদের চিত্ত আন্দোলিত হয়েছিল। চিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজি প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন। স্বামীজি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষই সমগ্র বিশ্বকে অধ্যাত্মবাদের জ্ঞানালোক দান করতে পারে, আর পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতের অন্নাভাব দূর করতে পারে। তাই তিনি যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যারই প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে জন্মগ্রহণ করে ভারতবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন । তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সহস্র সহস্র ভারতের যুবক জাতিভেদ ও ছুঁতমার্গের গণ্ডী পার হয়ে বেদান্তের অদ্বৈতভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছিল। স্বামীজির মতাদর্শকে অনুকরণ করে পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশন বা অপরাপর ধর্মসঙঘ ভারতবর্ষে তথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তের সমুজ্জ্বল ভাবনা পৃথিবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। তাই আজ সমগ্র পৃথিবী ভারতবর্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভূমি বলেই স্বীকার করে নিয়েছে। আর এই স্বীকৃতি স্বামী বিবেকানন্দেরই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

'স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবেদান্ত' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে আমরা বিভক্ত করেছি। এখন এই পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়কে সারতঃ সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই স্বামীজির দার্শনিক চিন্তার মৌলিক উৎকর্ষকে উপন্যাস করেছি ও পরে তাঁর দর্শনচিন্তার ভিত্তিভূমিকে সমুল্লেখ করেছি ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনব্যাপী কর্ম ও সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট, সেটি তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা ও তাঁর সত্যনিষ্ঠা। নির্মোহ সত্যানুরাগের জন্যই অনেক সময়ে তিনি নিজের পূর্ববর্তী ধারণাকে নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। এটা তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার ফলেই বিবেকানন্দ তাঁর তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুর কৃপায় পরম তত্ত্ব বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর জীবনের সর্বাবস্থায় দেখি তাঁর অবিচল ঈশ্বরবিশ্বাস যার ফলে তিনি সর্বদা মনে করতেন যে, এক মহাশক্তি তাঁকে যন্ত্রবৎ চালিত করছে, তাঁর নিজের কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নেই। আরও পাই, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বে তাঁর ছিল দৃঢ় প্রত্যয় যেটা সকলের মনে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দের সকল ভাষণ ও সকল চিন্তাই অদ্বৈতবেদান্তের অনুসরণে অগ্রসর হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় তাঁর দর্শনচিন্তাকে বিশেষভাবে মহিমান্বিত করেছিল। তবে উল্লেখ্য যে. বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ বিবেকানন্দকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল — তার চাইতেও তিনি অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন শঙ্কর বেদান্তের দর্শন চিন্তায় এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় ও দীক্ষায়। ''সর্বজীবে দয়া নয় — দয়া করার তুই কে'' — ঠাকুরের এরূপ বাণী স্বামীজির 'অহং জ্ঞান' বিসর্জনের নিমিত্ত হয়েছিল। ঠাকুর অর্ধবাহ্য দশায় একদিন নরেনকে বলেছিলেন ''দয়া নয়, দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীব

সেবা'' প্রতিটি মানুষ যে এক একটি শিব — এই চিন্তায় স্বামীজির দর্শন চিন্তা। এছাড়াও উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র-শঙ্করভাষ্য এই তিনটি অদ্বৈতবেদান্তের আকর গ্রন্থই স্বামীজির দর্শন চিন্তার মূল অবলম্বন । এর দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মৌলিক দার্শনিক চিন্তাকে সকল দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ভারতীয় দার্শনিকগণের কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। তিনি বলেছেন, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করা অবশ্যই সম্ভব। তিনি বর্ত্তমান সমাজে এবং দৈনন্দিন কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ অবশ্য করণীয় এ কথাও বলেছেন। বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দর্শন চিন্তার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবন আর লৌকিক অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য পুরোপুরি বর্তমান।

ভারতবর্ষের প্রাচ্যদর্শন যা সুপ্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছিল তা হল বেদান্ত। কঠোপনিষদে নচিকেতার ত্যাগ, সত্যবাদিতা ও আদর্শে যমরাজ পরিতুষ্ট হয়ে নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব দান করেছিলেন। মুণ্ডক উপনিষদে ও কেনোপনিষদে ব্রহ্মের সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপতা উপদিষ্ট হয়েছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রকটিত হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্ত-বিধৃত এই ''অহং ব্রহ্মাস্মি'' ভাবটি স্বামীজি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য বিদ্যা বেদান্তের শাশ্বত বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তবে এই বেদান্তের মহান উপদেশগুলি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে সারা ভারতবর্ষে প্রচার করেছেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পাশ্চাত্যেও তাঁর প্রচারিত প্রাচ্য বিদ্যা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

স্বামীজি রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বরাহ নগরে মঠ স্থাপন করেছিলেন। এবং সেখানে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করে অদ্বৈতবেদান্তের মহান আচার্য কর্তৃক পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সংঘের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সংঘ, যার মূল নীতি হল — ''আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ ।'' এরপর কিছুদিন বরাহনগরে থাকার পর স্বামীজি বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজক রূপে। এই সময়ে তিনি নানা তীর্থস্থান দর্শন করেছিলেন এবং অগণিত মানুষের শোচনীয় দুঃখ-জর্জরিত জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ঐসব মানুষের জন্য তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি ঐসব মানুষের দুঃখের কারণ খুঁজে বের করেছিলেন। এবং তার প্রতিকারও করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতীয়গণের এই দুঃখদারিদ্র্য, পরাধীনতা প্রভৃতি অসহনীয় দুরবস্থার প্রকৃত কারণ তাদের মানস দুর্বলতা ও মোহাচ্ছন্নতা । সুতরাং ভারতবাসীর এই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে হলে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন । অর্থাৎ ভারতের দুঃখদারিদ্র্য ও পরাধীনতাকে দূর করতে গেলে ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক

শক্তিসম্পন্ন হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। এই কারণে স্বামীজি সারা ভারতবর্ষের নিদ্রিত ও পরাধীন ভারতবাসীকে বেদান্তের তূর্য ধ্বনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন — "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[২] স্বামীজির এই দৃপ্ত আহ্বানে সমস্ত ভারতবাসীর সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হয়েছিল। মহাদুঃখের অবসান হয়েছিল। সুতরাং স্বামীজির দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি হিসাবে আমরা ভারতীয় সনাতন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ বা চিত্তে তার সতত সঞ্চারকে নির্ধারণ করতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে অদ্বৈতবাদ জগন্মিথ্যাত্ববাদ এবং দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ অরণ্যের বেদান্তকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত বেদান্তে নরনারায়ণ সেবা এবং মানব সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে পন্থা নির্দেশ করেছিলেন তাও এই অদ্বৈতভূমির উপরই প্রসারিত। তাই অদ্বৈতবেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের এবং কার্যধারার ভিত্তি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও স্বয়ং অদ্বৈতের শেষ সীমা নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হয়ে তাঁকে উপদেশ করেছিলেন — "অদ্বৈত সব শেষের কথা; অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।" অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যাবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখতেন না।

যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরমতত্ত্ব দুইয়ের ভাববর্জিত, সেটাই অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। আর এই অদ্বৈতবাদেরই আলোকে ধর্মসমন্বয় সম্ভবপর। কারণ অদ্বৈতবেদান্ত মতে ব্যাবহারিক ও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কাকেও (দ্বৈতবাদাদি কোন মতকেও) অস্বীকার করে না। ধর্মের মধ্যে যত মৌলিক কথা আছে মানবতা স্বরূপ, বিশ্বে সকলের অন্তরস্থিত মূল সত্য, সে সত্যের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্গে সম্বদ্ধ জন্ম মৃত্যুর রহস্য ইত্যাদি, প্রত্যেকটি বিষয়ে অদ্বৈতবেদান্ত নিরপেক্ষভাবে গভীর আলোচনা করে । শুধু তাই নয়, স্বামীজির মতে সমস্ত নীতির সর্বোত্তম ভিত্তি হতে পারে অদ্বৈতবাদ। ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব একত্ব বা সাম্য প্রভৃতি মতবাদ অবলম্বনে যে বিশ্বমানবতার সৌধ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তার মূলে আছে স্বামীজির প্রবর্তিত কর্মজীবনে প্রযুক্ত অদ্বৈতবেদান্ত । প্রসঙ্গত বলা যায়, মানবের অগ্রগতির মূলে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব, নির্গুণত্ব, অবিকারিত্ব প্রভৃতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আত্মবিশ্বাসের ফলে যে আত্মশ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তার ফলশ্রুতিরূপে মানবকে হীন কর্ম হতে নিবৃত্ত করে এবং উচ্চতর কর্মের প্রতি প্রেরণা দেয় এই অদ্বৈতবেদান্ত। স্বামীজি মানবজীবনে অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করেছিলেন এখানে আমরা তার কিছু আলোচনা করছি। তবে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য অদ্বৈত বেদান্তের আকর গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধনীয়।

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ম এবং মায়া উভয়কেই জগতের কারণ বলে নির্দেশ করেছেন।

ব্রহ্ম ও মায়া উভয়েই যথাক্রমে বিবর্তনের এবং পরিণামের মধ্য দিয়ে জগৎরূপ কার্যে বর্তমান। কারণ এদের উভয়ের গুণগুলিই কার্যে দৃষ্ট হয়। যেমন ঘটটি আছে — ঘটটি জড় ইত্যাদি ঘটাদি কার্যের জ্ঞানে ঘটের অস্তিত্ব ব্রহ্মেরই স্বরূপ এবং ঘটের জড়ত্ব মায়ারই স্বভাব। পরিণামের ক্ষেত্রে কারণসত্তার অতিরিক্ত সত্তা কার্যের সম্ভব হলেও বিবর্ত্তস্থলে কারণ সত্তার অতিরিক্ত সত্তা কার্যের থাকে না। আর শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন ('তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নম্')[১]। তাই প্রকৃতি রূপ কার্যও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হওয়ায় ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এরূপ অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয়। শঙ্করাচার্যের মত অনুসরণ করে স্বামীজিও বলেন, পরিদৃশ্যমান দ্বৈতজগতে দ্বৈতাতীত চরম সত্য আমাদের স্বীয় আত্মা — আর সেই আত্মা পরমাত্মায় অভিন্ন। জগৎ কখনই মায়াময় বা মিথ্যা হতে পারে না, যখন আমরা একে ব্রহ্ম হতে বিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করি। সত্য ব্রহ্মেরই উপর মিথ্যা জগতের প্রতিভাস হয়। যতক্ষণ জগতের জ্ঞান থাকে ততক্ষণ এটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলেই জগৎ মিথ্যা প্রতিভাত হয়। তখন সে কথা বলার মতই ভিন্ন ব্যক্তি থাকে না। ''যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ।''[৪] অতএব উপনিষদে বর্ণিত তত্ত্ব এই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সব কিছুই এই বিচিত্র জগৎ আপাত প্রতীয়মান হলেও সত্য নয়। শাস্ত্র এই ব্রহ্মকে সৎ চিৎ ও নিরতিশয়ানন্দ বলে বর্ণনা করেছেন। ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।''[৫] সত্য ও অনন্ত ব্রহ্ম। ''বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।''[৬] জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব ''তত্ত্বমসি' শ্বেতকেতো'' হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম। ''অহং ব্রহ্মাস্মি''[৮] — আমিই ব্রহ্ম। ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে আম্নাত হয়েছে।

তবে প্রশ্ন হতে পারে, ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হন, তা হলে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই নানাত্ব মাত্র অনুভব করি কেন ? সত্য অভিজ্ঞার বিরুদ্ধে যেতে পারে না কেন? এজন্যই শঙ্করকে সত্য এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে আপাত বিরোধের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। শঙ্কর বলেন, জগতের এই নানাত্বের কারণ হল মায়া। যখনই আমাদের ব্রহ্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তখন নানাত্ব থাকে না — সুতরাং এর কোন সত্যতা নেই। অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় এটা ভ্রান্ত দর্শন। অর্থাৎ অবিদ্যার জন্যই এই ভ্রান্তি। এই অবিদ্যা অনাদি। এই অবিদ্যাই সকল নানাত্ব দর্শনের কারণ — অবিদ্যাবশতঃ জগৎকে ও নানাত্বকে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হলে অবিদ্যার নাশ হয় এবং জগৎ ও তার নানাত্বের মিথ্যাত্ব সিদ্ধহয়। শঙ্কর যখন জগৎকে মিথ্যা বলেন, তখন তিনি উচ্ছেদবাদী বৌদ্ধদের মত এমন কথা বলেন না যে, জগৎটা একেবারেই কিছু নয়, তিনি এটাই বলতে চান যে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্ত বলে বুঝতে হবে। জগতের একটা আপেক্ষিক সত্তা আছে।

এটা আপাত সত্য। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব বলা যায়, যেহেতু মায়ার কোন বাস্তব সত্তা নেই সেহেতু এর দ্বারা ব্রহ্ম কোন ভাবেই যুক্ত হতে পারেন না কারণ ব্রহ্ম হলেন সত্যস্বরূপ। এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। ব্রহ্ম এবং মায়ার সম্পর্ক কাল্পনিক; ব্রহ্মের উপর মায়া আরোপিত হলেও ব্রহ্ম কোন ভাবেই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যেমন আরোপিত বলে বিবেচিত সর্পের দ্বারা রজ্জুর কোন পরিবর্তন হয় না।

দ্বৈতজগৎ হল সম্মুখে যা দেখছি, এটা একভাবে সৎ এবং আর এক ভাবে অসৎ, এটা সত্যাসত্য উভয়ই। এক পক্ষে জগৎ নিত্য ও সৎ; অর্থাৎ চিরদিনই এর কার্য্যপ্রণালী যথানিয়মে চলে আসছে, ও চলতে থাকবে। জগতে কেবল রূপান্তর ও অবস্থান্তর হচ্ছে; অনাদিকাল থেকেই লোকযাত্রা প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। এর বিরাম নেই। জগতের ব্যাবহারিক নিত্যতা সমস্ত আস্তিক দার্শনিকরাই মেনেছেন, এমন কি আচার্য্য শঙ্করও। যদিও জগৎ উক্ত ভাবে নিত্য, তথাপি প্রকৃত পক্ষে এটা নিতান্তই অবস্তু, এর নিজ সত্তাশক্তি নেই। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাই এর সর্বস্ব। এটি চিরকালই বস্তুরূপে প্রকাশিত হলেও এটি তত্ত্বতঃ অবস্তু। অদ্বৈতবাদীর মতে অদ্বৈত আত্মা পরমার্থ এবং দ্বৈত অনাত্মা অপরমার্থ। আর দ্বৈতবাদীর মতে আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই পরমার্থ, যেহেতু উভয়েই দ্বৈত সত্য। অদ্বৈতগণের মতে অদ্বৈত আত্মা মায়া দ্বারাই নির্দিষ্ট কালের জন্য ভেদগ্রস্ত হয়, কিন্তু স্বরূপত ভেদগ্রস্ত হয় না। এটা তত্ত্বত ভেদগ্রস্ত হলে আত্মার নিত্যত্ব হানি হবে। অদ্বৈতবাদিগণ জাতিবাদের নানা দোষ প্রদর্শন করেছেন, এবং অজাতিবাদ আশ্রয় করেছেন। মায়াকৃত ভেদ সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর একচন্দ্রের অনেক চন্দ্ররূপে এবং এক রজ্জুর সর্পধারাদি বিভিন্ন রূপে প্রতিভাসের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর দ্বৈতবাদিগণের মতে — জগতের স্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর সর্বদাই জীবজগৎ হতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ নিত্য, জীবও নিত্য। জীবজগৎ কখনও বিকশিত এবং পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই সেই একই রয়েছেন। গুণের জন্যই ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপন্ন, দেহের জন্য নয়। তিনি করুণাময়, ন্যায়বান্ ও সর্বশক্তিমান্। তাঁর নিকটে যাওয়া যায়, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা যায়, তাঁকে ভালবাসা যায়। তিনিও প্রতিদানে ভালবাসেন। এক কথায়, তিনি মানবীয়গুণসম্পন্ন যদিও মানব অপেক্ষা অনন্ত গুণে মহৎ। মানবের দোষগুলির কিছুই তাঁর মধ্যে নেই। তিনি নিরঞ্জন অনন্ত কল্যাণ গুণাধার এটাই হল দ্বৈতবাদীসম্মত ঈশ্বর তত্ত্ব। অদ্বৈতবাদী বলেন, যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা তাই নন, সৃষ্ট কার্যও তিনি। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এটা কিরূপে সম্ভব ? শুদ্ধ ব্রহ্মাই ঈশ্বর রূপে আবির্ভূত হলেন এবং অন্তর্যামী আত্মারূপে সকলের মধ্যে প্রকটিত হলেন। 'তৎ সৃষ্ট্বা

তদেবানুপ্রাবিশৎ' জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য'।[৯] সুতরাং তুমি আমি এবং অন্যান্য দৃষ্ট ভেদ সমন্বিত বস্তুসমূহ সব আত্মসম্মোহন মাত্র — প্রকৃতপক্ষে অসীম নিত্যমঙ্গলময় আত্মসত্তাই একমাত্র সত্তা। এই অখণ্ড সত্তাতেই আমরা এরূপ নানা স্বপ্ন দেখি। তিনিই সকল ভেদের উর্ধ্বে সকল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উর্ধ্বে, অনন্ত অসীম তাঁরই মধ্যে আমরা দেখি সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে। ভগবান্ শঙ্করের মতে এই ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম সর্বাবস্থারহিত তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নন। অতএব তত্ত্বত অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। শেষে বলা যায়, কেউ কেউ অদ্বৈতবাদী শ্রুতিকে আশ্রয় করে অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেউ কেউ দ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয়বর্জিত তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ।

এরপর এই অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ খ্যাপন করে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য আছে কিনা সমীক্ষা করেছি। বলা বাহুল্য স্বামীজি নিজের সন্ন্যাস জীবনকে সুদৃঢ় ও সার্থক করতে এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। বিবেকানন্দ মন-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, অদ্বৈতবেদান্তই সর্বাপেক্ষা অধিক বলপ্রদ, অধিক যুক্তিযুক্ত ও অধিক বিজ্ঞান সম্মত। দ্বৈতভাবনায় অভয় পদ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কেননা দ্বৈততত্ত্ব উপাসনায় ভয় ও দুঃখ থেকে নিস্তার নেই। ''দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।''[১০] এই কারণে শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ নিন্দিত হয়েছে। উপাসনায় (উপাস্য উপাসক ভাবস্থলে) দ্বৈতবুদ্ধি থাকে, এবং অদ্বৈতবুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত দুঃখনাশ হয় না। এ বিষয়ে হিতকারিণী শ্রুতির উপদেশ — ''তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।''[১১]

সুতরাং একত্ব দর্শনে মুমুক্ষুর সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নাশ হয়। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা উপাসনাকে দুঃখ নাশের হেতু বলেননি। আর উপাস্য দেবতাকে প্রকৃত ব্রহ্ম বলেন নি। তাই কোনোপনিষদে শ্রুতির উপদেশ — ''তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।''[১২] স্বামী বিবেকানন্দ শ্রুত্যুপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের এই উৎকর্ষকে হৃদয়ঙ্গম করে তার অনুপম বাণী রচনায় বিশেষভাবে এর গুণগান করেছেন। একথাও এখানে স্মরণীয় যে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাসনার স্থান না থাকলেও ব্যাবহারিককালে উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধুরন্ধর বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী তাঁর 'প্রস্থানভেদ' গ্রন্থে দ্বৈতাদি সমস্ত মতবাদই যে অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত তা সুষ্ঠু প্রতিপাদন করেছেন। অধিকারী ভেদে দ্বৈতবাদাদি নানা মতের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য মোক্ষতত্ত্ব। আর অদ্বৈতবাদে অন্যান্য মতের সমন্বয় স্বীকার না করলে শ্রুতিবাক্যসমূহের পূর্বাপর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়।

আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম, উপাসনা ও ভক্তি ব্যবহারিক হওয়ায় এবং মুক্তি পারমার্থিক হওয়ায় ভিন্ন বিষয়ত্ববশতঃ উভয়ের কোন বিরোধ হয় না। মুক্তি যেহেতু

অতি দুরূহ সেহেতু সোপানারোহণন্যায়ে অতি সূক্ষ্ম মোক্ষতত্ত্বকে লাভ করার লক্ষ্যে মন্দাধিকারীর জন্য নানা দেবতার ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হয়েছে। দুর্গম জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে নানা সাধনার মধ্য দিয়ে মুমুক্ষুকে অগ্রসর হতে হয়। এই কারণে শাস্ত্রে কর্মযোগ যম ও নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগও অভ্যাস যোগ সাধনা উপদিষ্ট হয়েছে। নানা যোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে তবেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা আসে। বিশেষ করে বিষয় বৈরাগ্য না হলে ও ঈশ্বরানুগ্রহ না হলে মুক্তি লাভের আশা দুরাশামাত্র হবে। সুতরাং সমস্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ অদ্বৈতবাদকেই আমরা সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ বলতে পারি। অদ্বৈতবাদ পক্ষে সমস্ত মতবাদের বিরোধ অপনীত হওয়ায় অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা উপাদেয় হয়। আর শ্রুতির পরম তাৎপর্যবিষয় হওয়ায় অদ্বৈতবাদই প্রেক্ষাবান্ মুমুক্ষুগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়। স্বামীজির প্রেক্ষিতে শ্রুতিসম্মত এই অদ্বৈতবাদই আমাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দেশের সকল মানুষের একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কল্যাণকর উপায়নির্দ্দেশক বিজ্ঞানই সমাজবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের শিক্ষায় মানুষ সমবেত ভাবে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ করে গড়ে তোলে জাতীয় সমাজ। এইভাবে বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজের সমতারক্ষার জন্য যদি কোন পথ নির্দেশের নিয়ামক কোন বিজ্ঞান থাকে তা হলে সেটাই হবে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তির একমাত্র সাধন। অদ্বৈতবাদ এমন একটি শ্রৌত বিজ্ঞান যা বিশ্বের মানবসমাজকে সেই অভূতপূর্ব আলোর পথকে নির্দ্দেশ করেছে । এইভাবে অদ্বৈতবেদান্তের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা বোধহেতু প্রীতির বিস্তার ঘটলে সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার প্রবৃত্তি আপনিই জন্মে। বিবেকানন্দের সমাজ কল্যাণের প্রেরণা এই পথেই এসেছিল। তাঁর মধ্যে যুগপৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। প্রথম কারণে তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর দ্বিতীয় কারণে ভগবান্ পতঞ্জলির যোগ উপাসনা তাঁকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল ।

স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তকে কর্মে পরিণত করতে গিয়ে বলেছিলেন, এটিকে সাংসারিক কাজে প্রয়োগ করতে হবে । সকল মানুষের জন্য সম-সুযোগ ও সম অধিকার পেতে হলে ধর্মের আচার, আনুষ্ঠানিকতা (বুজরুকি) বর্জন করতে হবে। আর জনগণের কল্যাণের জন্য কেবল অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেই হবে না, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একে বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি আরো মনে করতেন যে, অদ্বৈতবাদই সমাজবিজ্ঞানের উন্নতিতে চরম সত্য এবং সেই সত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে ক্রমশ বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত হবে এবং বিশ্বমানবের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। এইভাবে স্বামীজি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদকে প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞানের সাথে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্যকে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন ।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথমে আধুনিক কালে স্বামীজির প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রাসঙ্গি কতা আলোচিত হয়েছে ।

শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রচারিত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ সোপান ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্মচিন্তা। আর এই আধ্যাত্মিকতা বিবেকানন্দের মতে ধর্মের অকাট্য ভিত্তি। এখানে সাধক সমাধিস্থ হয়ে ভগবানের সঙ্গে লীন হয়ে যান। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করছে সেই হেতু অদ্বৈতবাদই অধিকতরভাবে বৈজ্ঞানিক ধর্ম।

"যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে ।।"[১৩]

ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যরাশি অধ্যাত্মভিত্তিক অদ্বৈত ধর্মপথেরই উপযোগী ।

স্বামীজির বিশ্বভ্রাতৃত্বভাবনা ও বিশ্ববন্ধুত্বভাবনাই বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতাকে দূর করতে সমর্থ। লক্ষণীয় এই যে, যখন ধর্ম লুপ্ত হবার উপক্রম হয় তখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আর তখনই ঐ ধর্মসঙ্কটকালে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি আমেরিকাতে স্বামীজির প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রবেশ দৃঢ়মূল হয়েছিল।

স্বামীজি চিকাগোতে হিন্দু ধর্মীয় ভাষণে বলেছিলেন, হিন্দুর সকল উপাসনাই বেদের অন্তর্ভুক্ত বেদান্তের এক একটি স্তর, তার মধ্যে অদ্বৈতভাবনা হল সর্বোচ্চ স্তর। আর এই স্তরের মাধ্যমে আমরা যে অহংগ্রহ উপাসনার কথা জানতে পারি তাতেই আধুনিক কালে অদ্বৈতবাদের প্রাসঙ্গিকতা এসে যায়। আবার আমরা এটাও দেখতে পাই যে, এই অদ্বৈতচিন্তা ভয়ঙ্কর বস্তুবাদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে । দুর্নীতির শ্রেণী শাসন ও নিম্নমানের কুসংস্কারের আকারে বস্তুবাদ যখন ভারতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল; তখন অদ্বৈতবাদী বেদান্তের যুক্তি ও তত্ত্ববাহী দর্শনকে হাতিয়ার করে স্বামীজি সকল ভারতবাসীর অন্তরে এক শাশ্বত চেতনার আধিপত্য সঞ্চার করেছিলেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায়, পৃথিবীর সহস্র সহস্র মতবিজৃম্ভিত সমাজে অদ্বৈতবাদ বয়ে এনেছে অহিংস অমৃতের ধারা। অদ্বৈত অমৃততত্ত্ব সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমদর্শিতার মন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ও পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা দূর করে কত কল্যাণই সাধন করছে ! আর অন্যান্য মতবাদগুলিকে সহ্য করে আপন ক্রোড়ে ঠাঁই দিয়ে নবনব রূপে ব্যাবহারিক স্তরে ও সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। জীবে প্রেম বা ভালবাসা মানুষের পরমধর্ম। এবং মানুষকে ভালবাসলেই পরমাত্মাকে ভালবাসা হয়। এইভাবে স্বামীজি দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তের অনুপ্রেরণা বিধান করে অদ্বৈতবেদান্তের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন ।

অতঃপর এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের

ডুয়ালিজম্ (Dualism) এর কোন মিল আছে কি না ? যীশুখ্রীষ্টের মানবীয় দৈবসত্তাবাদকে 'পাশ্চাত্যের ডুয়ালিজম্' বলা হয়। যদি কোন দিব্যচেতনা সম্পন্ন মানুষ যীশুখ্রীষ্টকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন বা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হন তবে তিনিও মানবীয় দৈবসত্তায় উন্নীত হয়ে যীশুখ্রীষ্টতুল্য হতে পারেন, এরকমই ছিল পাশ্চাত্যবিদ্‌গণের হিমালয়ের ন্যায় অটল বিশ্বাস। এই মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব উভয়ই বিদ্যমান। এখানে বলা চলে, যীশুখ্রীষ্টের মানব সত্তা হল প্রাচ্য মতে 'জীবভাব' এবং যীশুর দৈবভাব হল প্রাচ্যমতে ঐশ্বরভাব। লক্ষণীয় যে, সমস্ত জীবের মধ্যে এক ঐশী সত্তাই বিদ্যমান — অদ্বৈতবেদান্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে যদিও পাশ্চাত্য Dualism-এর তত্ত্ব ভারতীয় অদ্বৈতদর্শনের সদৃশ বলে মনে হতে পারে তথাপি অবশ্যই বলতে হয়, পাশ্চাত্যের Dualism কখনো প্রাচ্যের সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদের সমতুল হতে পারে না। বস্তুত পাশ্চাত্যের ডুয়ালিজম্ হল যীশুপ্রবর্ত্তিত একটি দ্বৈতমতবাদ। যীশু অনুভব করেছিলেন, তিনি পরম পিতার পুত্র। প্রাচ্য দ্বৈতদৃষ্টিতেও অনুভূত হয় যে, আমরা ভগবানের দাস। ভগবান্ আমাদের পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সুতরাং পাশ্চাত্যের 'ডুয়ালিজম্' এর সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের অদ্বৈতবাদের তেমন সামঞ্জস্য না থাকলেও দ্বৈতবাদের অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে।

এরপর এই অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের মিশ্রণে স্বামীজির দার্শনিক ভাবনার মৌলিকত্ব নিরীক্ষিত হয়েছে।

প্রতীচ্যশাস্ত্রাণি যথা স্মৃতানি
প্রাচ্যানি তেনাপি তথা বৃতানি।
প্রগাঢ়যুক্ত্যাদ্ভুতবাদশক্ত্যা
প্রেষ্ঠো গুরূণামপি সংবভূবে॥

বলা বাহুল্য Spiritual Interpretation of History তত্ত্বটি বিবেকানন্দের একটি মৌলিক মতবাদ। ভারতীয় ও অভারতীয় দর্শন সমন্বয়ে সমুদ্ভূত স্বামীজির দর্শনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন কোন বিষয়ে তাদের সাম্য ও তাদের স্বাতন্ত্র্য বৈষম্য কোথায়, এখানে সেটাই বিচার্য্য।

স্বামী বিবেকানন্দের নব নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত তাঁর নিজস্ব মৌলিকচিন্তা সমস্ত ভারতীয় দর্শনগুলিকে এক বিশেষত্ব দান করেছে। স্বামীজি তাঁর অভূতপূর্ব সাহিত্য রচনায় কোথাও ন্যায়কার, কোথাও যোগবাদী, কোথাও মীমাংসক, কোথাও বৈদান্তিক, কোথাও বুদ্ধবাদী ও জৈনবাদী, এমন কি কোথাও চার্বাক — মতাবলম্বী। ভারতীয় দর্শনগুলি বিশ্লেষণ করলে যেমন দেখা যায় স্বামীজির মৌলিকত্ব অসাধারণ তেমনই আবার পাশ্চাত্য দর্শন গুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, রেনাদেকার্ত,

স্পিনোজা, জন লক্, জর্জ বার্কল এইসব দার্শনিকদের দর্শনের সবকিছুর মীমাংসাকেই স্বামীজি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে স্বামীজির উদ্ভাসিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, যুগের চাহিদা মেটাতে গেলে আমাদের একই সময়ে সত্যিকারের বিজ্ঞান মনস্ক আর ঐতিহাসিক দর্শন মনস্ক হতে হবে। সত্যই অসাধারণ ও অনবদ্য স্বামীজির বিবেক মন্দিরে উৎসারিত এই অভিনব ও মৌলিক উদ্ভাবনশক্তি ।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল নবচেতনায় উন্মেষে বিবেকানন্দের আত্মদর্শন ও শাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ। মানুষের প্রধানতঃ এই স্থূল দেহ, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, এর পশ্চাতে বিদ্যমান মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা । আমরা জানি স্থূলদেহের সমুদয় গুণ ও শক্তি মন হতে গৃহীত, মন আবার আত্মার শক্তিতে শক্তিমান এবং তারই আলোকে আলোকিত। আত্মা অনন্ত (বিভু) লিঙ্গবর্জিত । আত্মাতে নরনারীভেদ নেই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারীভেদ। স্বামীজি এই আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবই ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু আত্মার স্বরূপ মায়ার আবরণে আবৃত। যখনই এই মায়ার আবরণ (অজ্ঞান) অপসৃত হয় তখনই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আ-ব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম। ভারতবর্ষের অদ্বৈতবেদান্তে এই পরিপূর্ণ জ্ঞান যে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে আলোড়িত করতে পারে তা স্বামীজি মনে মনে অনুভব করেছিলেন । আরো বলা যায়, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রিয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে অমৃতত্ব লাভের উপায় জিজ্ঞাসায় বলেছেন –- "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।"[১৬] এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, সংসারে যা কিছু আমাদের প্রিয়, তা আত্মার জন্যই। এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা যায়। এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন। ভগবদ্গীতা - উপনিষদে শ্রীভগবানও আত্মার অমরতার কথা বলে অর্জুনকে ক্লৈব্য পরিহার করার ও ভয়শূন্য হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উপনিষদের এই সকল ভাবনা, বিশেষ করে কঠোপনিষদের বীর্যবান্ ও শ্রদ্ধাবান্ নচিকেতার চরিত্র স্বামীজিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল । এইভাবে 'আমিই ব্রহ্ম, আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, শাশ্বত, সত্য, সৎ ও আনন্দঘন - এই উপলব্ধিতে স্বামীজির এই ঔপনিষদ অদ্বৈত চেতনা বিশ্বের সমাজজীবনকে আলোড়িত করেছিল। ভারতবর্ষের পরাধীনতার যুগে এক মহামানব নবীন সন্ন্যাসী বৈদান্তিক বাণী উপহার দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে নবচেতনার শিক্ষা দিলেন যে, মানুষ মর্ত্যবাসী হয়েও অমৃত স্বরূপ।

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বস্তুবিষয়ক উপলব্ধিতে একই চৈতন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, এবং ঐক্যবদ্ধ হয় বলে বিভিন্ন কালে একই আত্মার অভেদানুসন্ধান হয়। সুতরাং আত্মচেতনা ব্যতীত কোনও রকম চেতনা বা জ্ঞানই সম্ভবপর নয়। স্বামীজি

বলেছেন যে, আত্মচেতনার দ্বারা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। অসীম আত্মার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে প্রকাশ ঘটে। ক্রমবিকাশের আগে যে সব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, তারা বহিঃ পরিবেশ সম্বন্ধেই সচেতন ছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিল আন্তর পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুটি রূপ সম্বন্ধেই মানুষের চেতনা জাগ্রত হল। উপনিষদের ঋষিরা উপলব্ধি করলেন, বিশ্বরহস্যের কেন্দ্র মানুষের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে এবং এই কেন্দ্রকে খুঁজে পেলেই মানুষ তার শাশ্বত সত্তাকে অনুভব করতে পারে। আর তখনই উপলব্ধি হয় যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে সদাজাগ্রত আপন দেবতা বিদ্যমান। আর সেই দেবতার পূজা যদি মানুষের পূজাতে রূপান্তরিত হয় তবে সে পূজাই হবে প্রকৃত পূজা। তাই স্বামীজি বেদান্তকে নিয়ে এলেন ঘরের আঙিনায় মানুষের সেবার ভিতর দিয়ে ।এভাবে স্বামীজির প্রচেষ্টায় বেদান্তে পুঁথিগত বিদ্যা শাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগে পূর্ণ রূপ পেল।

স্বামীজি যে অদ্বৈতবেদান্তের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি। এই বেদান্ত যেমন পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে একটি সুদূর-প্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তেমনি ভারতেও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এই অদ্বৈত বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নবচেতনায় সঞ্জীবিত অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ তাঁর হৃৎপদ্ম, দেশের প্রতিটি নরনারী তাঁর জাগ্রত দেবতা, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর প্রাণ। এই দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনে এবার প্রধান কাজ। স্বামীজি স্বদেশবাসীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, দুর্বলতাই জাতীয় জীবনে সকল অবনতির মূল । তাই তিনি পুনরায় বলেছেন জাতি যদি ক্লীবতা ও জড়ত্ব পরিহার করে নতুন বলে বলীয়ান না হয় তা হলে জাতির পতন অনিবার্য। তাই তিনি আত্ম বলে উদ্বুদ্ধ হবার নবমন্ত্র শুনিয়ে জাতির জীবনে অমৃতরসের সিঞ্চন করেছিলেন। এই মন্ত্র ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তের মূলমন্ত্র। শেষে বলা যায় অধ্যাত্মচিন্তাভিত্তিক উপনিষদের 'ত্যাগ ধর্ম' শঙ্করের 'জ্ঞান ধর্ম' ও অর্জুনের 'কর্মযোগধর্ম' দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থলকে নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় করবে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত কেবল তত্ত্ব কথায় সীমাবদ্ধ থাকবে না — তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জন জীবন ও সমাজকে ধরে রাখবে ও পরিচালিত করবে — এটাই ছিল স্বামীজির স্বপ্ন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে ভারতীয়গণের অধ্যাত্মজীবন এবং এই জীবনে বিবেকানন্দের প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হয়েছে । পূর্ব পূর্ব জীবনের সূক্ষ্ম সংস্কার ও প্রবণতা নিয়ে আমরা জন্ম গ্রহণ করি, সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনের নতুন প্রবণতা অর্জন করি। শুভ প্রবণতা অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রগতির সহায়ক হয়, আর অশুভ প্রবণতা এর বাধা হয়ে ওঠে। পথের প্রতিবন্ধকগুলিকে জয় করে আমাদেরকে পরম

লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় — "সোনা রয়েছে আমাদের হৃদয়ে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না"। আমাদের সেই সোনার খনির সন্ধান করতে হবে। এবং এর ফলে আমাদের নতুন শক্তির উন্মেষ হবে ও অধ্যাত্ম পথে চলতে চলতেই জীব তার চরম লক্ষ্য পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে।

অধ্যাত্ম জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। অধ্যাত্ম জীবনকে একটি স্রোতস্বিনী বলা যায়, যার গতিপথ অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ-সমুদ্রের অভিমুখে। সেই পরম সত্তাকে রুচি অনুযায়ী প্রভু, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, আল্লাহ, গড্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। অধ্যাত্ম জীবন প্রবাহের গতি মসৃণ নয়। তাই এটি কখনো স্তব্ধ, কখনো নিশ্চল আবার কখনো বিপথে উৎসারিত হয়। এই প্রবাহ যাতে লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে সমভাবে চলে, সে দিকে নজর রাখতে পারেন একমাত্র প্রকৃত ধর্মপথিক। আর ধর্মের লক্ষ্য হলো দৃশ্যমান জগৎ থেকে স্বতন্ত্র অধ্যাত্মসত্য ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করা।

অধ্যাত্ম জীবন যাপন নিশ্চয়ই এক দুর্গম অভিযান, এক নির্ভীক কৃতিত্ব ও দুঃসাহসিক কর্মভার। এ কাজে যেমন বাধা ও বিঘ্ন আছে, তেমনই আনন্দ ও উত্তেজনা আছে। এর ক্রমবিকাশে কেউ কিন্তু বৈচিত্র্যহীন জীবন লাভ করেন না। কারো নিশ্চয়ই কিছু অনিশ্চিত পথের অভিযাত্রী হবার প্রবৃত্তি থাকে। তাই আধ্যাত্মিক অভিযানকে কখনো তুষারাবৃত চড়াই এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এতে প্রচুর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তাধারায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আর তাই বলা হয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই যথেষ্ট নয় যদি না তা ভারতের অধ্যাত্ম জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের এই অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠায় স্বামীজি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর জন্যও রেখে গেছেন অমূল্য পথ নির্দেশ।

ভারতীয় জাতীয় জাগরণ এবং মুক্তি সংগ্রামে স্বামীজির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐতিহাসিক আর.জি.প্রধান তাঁকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটার ফলেই স্বদেশপ্রেমের অনন্তপ্রবাহ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। দেশ জড়পদার্থ নয়, দেশ আমার জননী — এই বোধ যখন জাগ্রত হল, ঠিক তখনই জননীর শৃঙ্খলমোচনের আহ্বান যুববক্ষে সৃষ্টি করল অশান্ত কম্পন।

স্বামীজি ভারতবর্ষের বুকে আবেগময় অধ্যাত্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই মনে করতেন, অধ্যাত্ম চিন্তাই হল জাতীয় জীবনের প্রেরয়িত্রী। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, বিবেকানন্দ তা বুঝতেন না। তাই অনেক সময় অনেকেই অজ্ঞতাজনিত অপরাধে স্বামীজির চিন্তাধারাকে কটাক্ষ করেছেন।

'ধর্ম' বলতে তিনি বুঝেছেন পার্থিব যাবতীয় কর্মের মূল তত্ত্বকে উদারভাবে গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোপলব্ধি। ধর্মের কাজ হলো এক কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ। স্বামীজির মতে, "To be good and to be good is the whole of Religion." ভারতজাগৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভারতীয় বিশ্বজনীন উদার ধর্ম সংস্কৃতি, এটাই হল মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ অত্যাবশ্যক গুরুদায়িত্ব স্থান পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার মধ্যে। বুদ্ধিচাতুর্যে উদ্‌ভ্রান্ত বস্তুতান্ত্রিকতার মদে প্রমত্ত, জাগতিক বৈভবক্লেশে প্রপীড়িত পাশ্চাত্যকে পরিরক্ষার জন্য তিনি উদারহস্তে উপহার দিয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিকতা। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ধর্মীয় রূপান্তরই ভারতীয় জীবন সাধনার মূল মন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতীয়দের সর্বপ্রধান প্রেরণা। নিঃসন্দেহে স্বামীজির অভিনব জাতীয়তাবোধের পরিপূরক 'জগদ্ধিতায় ভাবনা' বিশ্বকল্যাণের পটভূমিকায় সুনিশ্চিত স্থান পাওয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনভূমি ব্যাপকতর ও উদারতর হয়েছে — সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর পর উপসংহারকল্পে ভারতের নানা বিচ্ছিন্নতা পীড়িত বর্তমান সমাজে স্বামীজির মতাদর্শ ও অদ্বৈতবেদান্তের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ধ্যান, ধারণা ও তিতিক্ষারূপ সাধনার ফল নিরূপিত হয়েছে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ জীবনের মুখ্য লক্ষ্য মোক্ষতত্ত্বে উপনীত হওয়ার জন্য ধ্যান, ধারণা ও তিতিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। যোগীরা বলেন, ধ্যানমগ্ন অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন আন্তর বস্তু অনুশীলনে রত থাকে, তখন এটা সেই বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয় এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের উপমায় মানুষের মন যেন একখণ্ড স্ফটিকের মত। ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ করতে করতে মনরূপী স্ফটিক নিজের স্বরূপ জানতে পারে এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয়। বলা বাহুল্য ব্রহ্মই মনের স্বরূপ। অন্য কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদেরকে সত্যের অধিকতর নিকটে নিয়ে যায়। স্বামীজি আরো বলেছেন যে, এইভাবে ধ্যানের দ্বারা মনকে একত্রিত করতে পারলে তার থেকে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে মনকে ধরে রাখাই হচ্ছে 'ধারণা'। আর দুঃখ প্রতিরোধ করবার চিন্তামাত্র না করে মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রেখে সর্ববিধ দুঃখের যে সহন — তাই 'তিতিক্ষা'।

অতঃপর বলা যায়, ভগবান্ বুদ্ধদেব যেমন সংসারের মায়া, মোহ, ধনদৌলতের প্রতি আসক্তি, বাসনা, দ্বেষ, হিংসা ও রাজসম্মান পরিত্যাগ করে কঠোর সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন — স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি সাংসারিক মায়ামোহ ও আসক্তি

ত্যাগ করে স্বাধ্যায়, ব্রহ্ম বিচার, সাধুসঙ্গ, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা আত্ম জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্মজ্ঞানলাভের পর তিনি কিন্তু মুনি ঋষিদের মত কেবল সমাধিস্থ হয়ে থাকেননি, বা সন্ন্যাস নিয়ে অরণ্যে বা গিরিগুহা কন্দরে ও গোপনীয় ভাবে কোথাও বাস করেন নি। সন্ন্যাসী স্বামীজি সকলের মাঝে থেকে অদ্বৈত তত্ত্ব কথা প্রচার করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ও স্বানুশীলিত পথে বিশ্ববাসীকে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর ধ্যান, ধারণা ও তিতিক্ষারূপ সাধনার ফল বর্ষিত হয়েছিল সারা বিশ্বে।

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই নব ভারত-স্রষ্টাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। নিম্ন ও পদদলিতদের জন্য তাঁর গভীর প্রীতি, সহানুভূতি ও জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম তৎকালে দেশের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। এটা লক্ষণীয় যে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অধিনায়ক হলেও তিনি তাঁর দেশবাসীকেই ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় সন্তান বলে মনে করেননি। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদের পূজারী।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির পথে প্রান্তরে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়িয়ে রাজন্যবর্গ থেকে কৃষকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী থেকে অস্পৃশ্য জাতি প্রভৃতি নানাবিধ মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন, তখন তিনি ভারতবাসীর নানা বিচ্ছিন্নতা পীড়িত বর্তমান সমাজের দুরবস্থাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এবং প্রতিকারের জন্য তিনি প্রত্যেক মানুষকে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন হতে বলেছিলেন — অদ্বৈতবেদান্ত এই শিক্ষা দেয় যে, জীব এই বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন। তাই যত আত্মা আছে, সব নিজেরই দেহ। কাউকে ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। আবার নিজের অন্তর হতে নিঃসৃত ঘৃণারাশি অন্যকে আঘাত করা মাত্র নিজেকেও আঘাত করবে নিশ্চয়ই। আবার নিজের অন্তর হতে প্রেম নির্গত হলে প্রতিদানে সে নিশ্চয়ই প্রেমই পাবে। কারণ আমিই বিশ্ব, বিশ্বই আমার দেহ। স্বামীজি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হতে এরূপ বিশ্বজনীন সাম্যবাদে উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে জীবে জীবে ভেদ নেই। স্বামীজি সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছেন, কখনও ভেবো না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এমন বলা ভয়ানক অভিশাপ। যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে আমি দুর্বল, আমি অপারক। এমন চিন্তাই একমাত্র পাপ। তুমি যা চিন্তা করবে, তাই হয়ে যাবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তবে দুর্বল হবে। তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে। জীবনের পরম সত্য এই — শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই আনন্দ ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস সম্পন্ন হও সেই বিশ্বাস বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান্ হও। এটাই আমাদের এখন দরকার। অধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান হলে অসাধ্য সাধন করা যায়।

সব শেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা অদ্বৈতবেদান্তের বাস্তবপ্রয়োগ অনুসরণে অগ্রসর হয়েছে। এর ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীন সাম্যবাদের শক্তিতেই আধুনিক কালের বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা একদিন অবশ্যই দূরীভূত হবে এবং বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তি অবশ্যই জাগরূক হবে।

১। বিবেকানন্দের শত - দীপায়ন । শ্লোক সংখ্যা - ১০
২। কঠ - ১/৩/১৪
৩। মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৩৬/৩০
৪। বৃহ ৪/৫/১৫
৫। তৈ ২/১
৬। বৃহ ৩/৯/২৮
৭। ছা ৬/৮/৭
৮। বৃহ ১/৪/১০
৯। তৈ ২/৬/৩
১০। বৃহ ১/৪/২
১১। ঈশঃ ৭
১২। কেন ১/৫-৯
১৩। ঈশঃ ৬
১৪। শ্বেত ২/৫
১৫। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন শ্লোক ১৩
১৬। বৃহ ২/৪/৩

প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তা ও তার ভিত্তি

হেষ্টি সাহেবের প্রেরণায় বিবেকানন্দের দর্শনমুখিতা

স্বামী বিবেকানন্দ দেশ ও বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে জগৎ জয় করেছিলেন এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছিলেন, এই কথা জন সমাজে প্রচলিত আছে। বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থায় বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। যখন ক্লাসে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা হতো তখন তিনি অধিক মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এবং পরে এই দর্শন তিনি অন্যান্য ছাত্রদের কাছে আলোচনা করতেন। এতে তাঁর দর্শন বিষয়ে জ্ঞান ক্রমশ বাড়তে থাকত। শুনা যায়, বিবেকানন্দ জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেষ্টি (Rev. W W Hostie) সাহেবের কাছে বেদান্ত দর্শন পড়েছিলেন। হেষ্টি সাহেব বিবেকানন্দের দর্শন অধ্যয়নের দক্ষতা দেখে বলেছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন প্রতিভাবান্ বালক। আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি কিন্তু এমন প্রতিভাবান্ ছাত্র আমার চোখে পড়ে নি; এমন কি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও নয়। এই বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা নাম রেখে যাবে।[১] বিবেকানন্দ হেষ্টি সাহেবের কাছেই দর্শন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আর এই দর্শন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তায় পরিণত হয়েছিল।

দর্শন চিন্তার উদ্দেশ্য

স্বামীজি মনে করতেন জীবন এবং জগতের নানা সমস্যায় পীড়িত হয়ে মানুষ দর্শনের আলোকে সমস্যার সমাধান করে এবং জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করে। সুতরাং দর্শন চিন্তাই বস্তুর তত্ত্ব বিষয়ে মানব মনে অন্তহীন জিজ্ঞাসার প্রসার ঘটায় ও সে বিষয়ে সমাধানের প্রকৃত সূত্র আবিষ্কার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পাইয়ে দেয়। মানুষ জগতের নানা কারণকে অনুসন্ধান করেছে। সে কারণ প্রকৃতিই হোক, বস্তুভূত পরমাণুই হোক আর সগুণ ব্রহ্মই হোক। সেখানে রয়ে গেছে মনীষী জনের আদিমতম দর্শন চিন্তার সাক্ষ্য। বলা বাহুল্য, দার্শনিক চিন্তায় মানুষের দুর্দম মননশীলতার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। ভারতীয় দর্শনাচার্যগণের মতে দর্শন আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শাস্ত্র। দর্শন জীবের মুক্তি প্রয়োজন সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় অবশ্য ভাবতীয় দর্শন যে

শুধুমাত্র অধ্যাত্ম বিষয়ই অবতারণা করেছে তা নয়। ন্যায় দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির আলোচনা আছে ও বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সাংখ্য দর্শনে কার্যকারণ সন্ধান ও প্রকৃতির পরিণামের আলোচনা এবং মীমাংসা দর্শনে বৈদিক কাজ কর্মের বিশেষ আলোচনা রয়েছে। লোকায়ত দর্শনের অস্তিত্বও সব দেশেই প্রসিদ্ধ।[১] আধুনিক যুগের উগ্রযুক্তিবাদী দর্শনের বাহক এবং প্রচারকেরা বললেন যে, দর্শনের উদ্দেশ্য হল সর্বব্যাপী সত্তার শুধু সুষ্ঠু ব্যাখ্যা নয়, দর্শনের উদ্দেশ্য চিন্তার স্বচ্ছতা। আর এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে বিবেকানন্দ কলেজের পাঠরত অবস্থায় পাশ্চাত্য দর্শন ও তর্ক শাস্ত্র খুব বেশি অধ্যয়ন করলেও বেদ ও ভারতীয় দর্শনে স্বল্প জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[৩]

বেদান্তাদি নানা শাস্ত্রে স্বামীজির গভীর জ্ঞান

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি বিশেষ ভাবে ভারতীয় দর্শন জানতে এবং বেদান্ত ও যোগ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে মনোযোগী হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর রচনা হতে জানতে পারি যে, তিনি উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য অধ্যয়ন করে রামানুজ ভাষ্যও অধ্যয়ন করেছিলেন। এছাড়াও বিবেকানন্দের আরও প্রিয় ছিল বিবেকচূড়ামণি, নির্বাণষট্ক প্রভৃতি আচার্য শঙ্করের বহু প্রকরণ গ্রন্থ। বিবেকানন্দের নানা পত্রে বেদের উবট প্রভৃতি নানা ভাষ্যের, ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্যের ও অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সকল গ্রন্থেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ভক্তি শাস্ত্রও তিনি অধিগত করেছিলেন। তাঁর অধীত ভক্তি শাস্ত্রগুলির মধ্যে নারদ সূত্র ও শাণ্ডিল্য সূত্র বিশেষ উল্লেখ্য।[৪] তিনি বিভিন্ন সভা মধ্যে যখন ভাষণ দিতেন তখন কিছু শ্লোক উল্লেখ করতেন। তিনি সেই শ্লোকগুলি বেশির ভাগ মনুসংহিতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র থেকে নিতেন। শেষ জীবনে তিনি আর একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন, এই গ্রন্থটি হল রঘুনন্দনের স্মৃতি (অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব)। বিবেকানন্দ এই সব শাস্ত্র যেভাবে একনিষ্ঠ হয়ে আয়ত্ত করেছিলেন তাতে তিনি অতি অল্প বয়সেই দর্শন শাস্ত্রের সুদক্ষ পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। আর এই দক্ষতায় তিনি সারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জনগণের কাছে শিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে দর্শন শাস্ত্রই অধিক আলোচনা করতেন।[৫] সবশেষে বলা যায়, তিনি আর একটি বিষয়ে যত্নবান্ হয়েছিলেন। সেটা হল গণিত ও গণিতজ্যোতিষ (Astonomy)[৬]।

বিবেকানন্দের দার্শনচিন্তায় হার্বাট স্পেন্সারের দর্শনের প্রভাব

বিবেকানন্দের ছাত্রাবস্থা থেকে দর্শন বিষয় আলোচনার ফলে তাঁর এতই দক্ষতা জন্মেছিল যে, তিনি হার্বাট স্পেন্সারের দর্শন গ্রন্থ পাঠ করে ঐ গ্রন্থের সমালোচনা পর্যন্ত করেছিলেন। তিনি স্পেন্সারের দর্শনগ্রন্থের সমালোচনা করে তাঁকে একটি পত্রও

লিখেছিলেন। তবে স্পেন্সার অবশ্য তাঁর পত্র পাঠ করে মুগ্ধই হয়েছিলেন। তারপর স্পেন্সার বিবেকানন্দকে সেই পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন যে, পরবর্তী সংস্করণের সময় তিনি সেগুলি সংশোধন করবেন। স্পেন্সারের মত দার্শনিকের এইরূপ অভিমত দেখে বিবেকানন্দের দর্শন বিষয়ে খুবই উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। অতঃপর বলা যায়, বিবেকানন্দের কলেজে পাঠ্য-জীবনের পরিব্যাপ্তিকালে হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় মতবাদ ছাত্রদের মধ্যে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত ইংরেজদের সব দিক দিয়েই অনুকরণ করছিল। পূর্ববর্তী যুগের তরুণরা যদিও প্রিস্টলি পার্কার এবং মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যামিল্টনের অনুরাগী ছিলেন, পরবর্তীযুগের তরুণরা অধ্যয়ন করতে লাগলেন স্পেন্সার মিল ও হ্যারিসন্ প্রমুখের গ্রন্থাদি। বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনবাদে আকৃষ্ট হলেন। আর পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনকে অনুকরণ করে অনেক কাজ ও করেছিলেন।[৭]

বিবেকানন্দ দার্শনিক হয়েও দার্শনিক পণ্ডিত হবার আকাঙ্ক্ষা করেননি বা দাবি করেননি। তিনি শুধু দর্শন বিষয়ের নানা চিন্তা করতেন— কীভাবে সকল ভারতবাসী জনগণকে দর্শন শিক্ষা ও বিশেষভাবে বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া যায়। আর এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে বেদান্তকে অবলম্বন করে নিজ সন্ন্যাস জীবনেও অদ্বৈতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জড়তা ও অজ্ঞতায় নিমগ্ন কোটি কোটি বুদ্ধিহীন ভারতবাসীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব উপলব্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল বেদান্ত প্রচার ও জীবনে তার অনুশীলন। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈশ্বরবুদ্ধিতে জীবের প্রতি অগাধ ভালবাসা। সুতরাং বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের দৃঢ় বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় দেব ও ঋষিগণের বংশধর ভারতবাসিগণের প্রতি তথা সমগ্র মানব সমাজের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসাকেই প্রধান অবলম্বন করেছিলেন।[৮]

বিবেকানন্দের দর্শনে শঙ্কর ও বুদ্ধের প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মনে হয়, তাঁর দর্শনখানি গড়ে উঠেছে দুটি মূল উপাদান হতে। একটি হল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং অপরটি হল বুদ্ধের সর্বজনীন প্রেমবাদ। প্রাচীন ভারতের এই দুই মনীষীর চিন্তা ধারা যে তাঁর উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্যের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, দক্ষ বিশ্লেষণ নৈপুণ্য এবং যুক্তি সম্মত অদ্বৈত চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল শঙ্করাচার্য প্রচারিত বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত। অপরপক্ষে ভগবান্ বুদ্ধের অহিংসা নীতি তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, যদিও বুদ্ধকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধের চিন্তায় আত্মার স্বীকৃতি নেই, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই, এগুলি তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বুদ্ধ জীবন যন্ত্রণা হতে মুক্তির জন্য সকল

মানুষকে ভিক্ষুর ব্রতে আহ্বান করেছিলেন। তাতেও তাঁর অনুমোদন ছিল না। এই কারণে তিনি একস্থলে তাঁকে গয়াসুর বলে অপবাদ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও ভগবান্ বুদ্ধের চরিত্রের একটি গুণ তাঁর শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তা হল তাঁর সকল জীবের প্রতি সুগভীর প্রেম। তাঁর কারুণিকত্ব বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল ।[৯]

এই দুই মহামনীষীর প্রভাব তাঁর উপর কত অধিক ছিল নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর কথা থেকে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ "তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয় অনন্ত সগুণ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রচার করলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য এটিকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানসূর্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়, এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হোক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও এতে থাকুক, এটা বিচারপূর্ণ হোক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন এতে উচ্চহৃদয় প্রবল ঐশ প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হবে। আর এই 'মণিকাঞ্চন যোগ' যেন বিবেকানন্দ দর্শনেই ঘটেছে । দর্শনের যে অভূতপূর্ব আদর্শ তিনি মানস পটে স্থাপন করেছিলেন, তা নিশ্চিত তাঁর চিন্তাধারাকে অতিশয় মহিমান্বিত করেছে ।[১০]

বিবেকানন্দের দর্শনে ভারতীয় দর্শনের অপূর্ব সমন্বয়

আমরা দেখি বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ভারতীয় দার্শনিকগণের কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিমনীষী, মহাপুরুষদের ন্যায় অমৃতের পুত্রদের জন্য জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিবিচার-ভিত্তিক দর্শন চিন্তা রাশির প্রকাশকালে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব (নিবৃত্তিধর্ম) অনুশীলনের ভিতর দিয়ে কেমন ভাবে মোক্ষের পর্যায়ে উন্নীত হতে হয় ও সমাজ জীবনে একটি মানুষ পশুত্বকে বর্জন করে মনুষ্যত্বের ধাপ পার হয়ে দেবত্ব লাভ করতে পারে, তা দেখিয়েছেন। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি একজন প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের এক যোগ্য উত্তরসূরী, যিনি ভারতবর্ষের সনাতন বৈদিক ধর্মকে বিশ্বের দরবারে শুধু পৌঁছিয়ে দেননি, ভারতের দর্শন চিন্তাকে তথা বেদান্তদর্শনকে, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে প্রমাণ করেছিলেন।[১১] দৃশ্-ধাতুর সঙ্গে করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে নিষ্পন্ন দর্শন শব্দটি কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ গোচরীভূত বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না । 'দর্শন' চর্মচক্ষুর সীমাবদ্ধতাকে উত্তীর্ণ করে চিরন্তন সত্যকে জীবনের পরম পাথেয় রূপে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। এই উপলব্ধি দর্শনকেই বিশেষ স্থান করে দিয়েছে, যা কিনা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের একাদশতম ইন্দ্রিয় মনের রাজ্যকে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত করেছে এবং আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে লোকোত্তর দেবত্বে

একাত্মতত্ত্বে। বিবেকানন্দের দর্শন সামগ্রিক ভাবেই মনকে জয় করতে শিখিয়েছে — কর্মযোগাদি সাধনার মাধ্যমে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে ঐ মনকে একান্তরূপে ঈশ্বরমুখী করেছে এবং সর্বান্তর্যামী এক আত্মচৈতন্যের জ্ঞানালোকে মনের অজ্ঞান মালিন্য দূর করে সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্তি ও চিরশান্তি বিধান করেছে।[১২]

বিবেকানন্দের দর্শনের উপজীব্য অদ্বৈতবাদ

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তায় প্রতিটি জীবের মধ্যে এক আত্মা এই তত্ত্বটি নিহিত। জীবদেহকে কেন্দ্র করে আত্মার অবস্থান। এই আত্মা শব্দটি যখন পরম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তিনি পরমাত্মা। জীব যখন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় এবং সকল জীবের মধ্যেই আত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করে তখনই তার আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাকার হয়ে যায়, যার অবশেষ হল 'অদ্বৈত তত্ত্ব'।[১৩]

আমরা কখনও দুই নই, সব সময়েই এক ও অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ম কখনও দ্বৈত ভাবে থাকতে পারে না। জীব যখন বুঝতে পারে যে, সে ব্রহ্মই, তখনই উদ্ভাসিত হয় ''অহং ব্রহ্মাস্মি''[১৪] ভাবের অভ্যুদয়। আসলে বিবেকানন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্যের ভাবাদর্শবাদকে। কিন্তু তিনি যুগ প্রয়োজনে সমাজ প্রবাহের আধুনিক দৃষ্টিতে অদ্বৈত বেদান্তকে পুনশ্চ ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর মধ্যে তুলে ধরতে ও প্রচার করতে চেয়েছেন। পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাক্রমে প্রাচীন বেদান্ত আধুনিক ঋষির মুখ নিঃসৃত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে তথা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছে। বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনা আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, চিকাগো শহর কেন্দ্রিক আমেরিকাতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।[১৫]

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তা বলতে শুধু জ্ঞান যোগকেই বুঝায় না। কর্মযোগের ভিতর দিয়ে কত সুন্দরভাবে জ্ঞানযোগ অভিব্যক্ত হয় এখানে তার নিদর্শন মেলে। এ বিষয়ে তিনি ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত মতের পৃষ্ঠপোষক। মূলতঃ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কোন পৃথক পৃথক বস্তু নয়। জ্ঞান না থাকলে কখনও নিষ্কাম কর্ম করা যায় না। আবার নিষ্কামভাবে কর্ম না করলে কখনো জ্ঞানযোগ পরিপুষ্ট হয় না। আর যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম করতে শুরুই করেনি (ন কর্মণামনারম্ভাৎ) তার ক্ষেত্রে কখনও নৈষ্কর্ম্য সম্ভব নয়। অর্থাৎ কর্মত্যাগ সম্ভব নয়। নিষ্কাম কর্ম চিত্ত শুদ্ধির প্রধান অবলম্বন। জ্ঞান ব্যতিরেকে যেমন নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়, তেমনি নিষ্কাম কর্মকে বাদ দিয়ে সন্ন্যাসে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার ভক্তি ব্যতিরেকে কখনো জ্ঞান সম্ভব নয়। দশ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে না পারলে মন জয় করা অসম্ভব। মন জয় হলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়।[১৬] কাজেই বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীদের উন্নতির পিছনে কর্মযোগের আবশ্যকতাকে বিশেষভাবে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি নিজে সন্ন্যাসী হয়েও কর্মবীর।

তাঁর বেদান্ত চিন্তা তাঁকে শুধু সন্ন্যাসী কর্মযোগী বলেই চিহ্নিত করেনি। তিনি ছিলেন আনন্দময় মুক্ত পুরুষ। কর্মযোগের মধ্য দিয়ে কীভাবে চরম তম অদ্বৈত তত্ত্বকে অবগত হওয়া যায় তা তিনি সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করেছেন। বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তাতে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ মিলেমিশে এককার হয়ে গেছে।[১৭]

বিবেকানন্দের দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তার উৎকর্ষ

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তার অন্তর্নিহিত ভাব এই, প্রত্যেক প্রেক্ষাবান্ মানুষই তাঁর জীবনে একটা চরম উদ্দেশ্য স্থির করতে চায়। আর সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যখনই সচেতন হয়ে ওঠে — যখনই সে চায় এই উদ্দেশ্যকে সচেতন ভাবে চরিতার্থ করতে, তখনই সে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, আর এই প্রশ্নই হল সমস্ত দর্শনের কেন্দ্র বিন্দু। ভারতে বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনায়, তত্ত্ব বিষয়ক এই মূল প্রশ্নই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই স্বামীজি বলেছেন, ভারতীয় দর্শন বিষয়ে উপরিউক্ত কথা যতখানি প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য অন্যান্য অভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তা নয়। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় যে প্রশ্নগুলি অথবা বিষয়গুলি প্রধানতঃ গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলির মূল নিহিত আছে মানুষের জীবনেই। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অথবা জীবনকে অস্বীকার করে ভারতীয় পণ্ডিতেরা কখনই দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। ভারতীয় চিন্তা ধারায় আদি উৎস বেদ ও উপনিষদেও এর ব্যতিক্রম নেই। ভারতীয় চিন্তা জগতে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে — ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটি পুরুষার্থকে স্বীকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ধারাতেই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে ও এই পরমপুরুষার্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই ভারতের দার্শনিকেরা জীবন দর্শনের মূল প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। দর্শন চিন্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করার চেষ্টায় ঐ কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দের চিন্তা শুধু আধ্যাত্মিকই নয়, মানবিক। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে যদি আমরা যথার্থত ভারতীয় বলে চিহ্নিত করতে চাই, তা হলে প্রধানতঃ এ অর্থেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পারিপার্শ্বিক মতাদর্শে নিমজ্জিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েও বিবেকানন্দের অন্তরে প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারা সুস্পষ্ট ভাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছে।[১৮]

ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। বেদনিরপেক্ষ বা বেদ বিরুদ্ধ মতবাদগুলি ছাড়াও বেদাশ্রয়ী দর্শনগুলিতে নানা মতভেদ দেখা যায়। তবে আমাদের মনে হয় যে, যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই বলবেন যে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। বেদান্তের সত্য তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল কোন আলোকে? এই প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তাধারা যে কোন দার্শনিক বিচারের ফল নয়, তিনি জীবনের নানা জটিল পরিস্থিতির সমাধানের মাধ্যমে অভিনব দার্শনিক তত্ত্বকে

উপলব্ধি করেছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসারে বলা যায় সমস্ত শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে অদ্বৈতবেদান্তে ।[১৯] এক এবং অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন', "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"[২০] ইত্যাদি বেদান্তের মহাবাক্যগুলি এই সত্যই প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে এই মহাবাক্য গুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে । কেউ দেখেছেন - উপনিষদে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, কেউ বা পেয়েছেন - দ্বৈতবাদ আবার কেউ কেউ বলেছেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বিবেকানন্দ এদের কোনটিকে সত্য বলে মনে করেছিলেন ? জগতের মূলে যে এক ব্রহ্ম এ সম্পর্কে কোন বৈদান্তিকেরই সংশয় আছে বলে মনে হয় না। অতএব সকল বৈদান্তিকই এক ব্রহ্ম একথা স্বীকার করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন পরস্পর বিরোধ আর মতভেদ উপস্থিত হয় তখনই এঁরা জগৎ সংসারের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা এই ব্যাখ্যার পর কেউ জগৎ সংসারকে ব্রহ্মের পরিণাম সত্য বলে মনে করেন। আর কেউ বা একে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত স্বীকার করে জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করেন।[২১]

অতঃপর বলা যায় অদ্বৈতবাদে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একক সত্তার সাহায্যে। আর একক সত্তা হল অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য সত্তা। তাই বলা যায়, এই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাকে জানতে পারলেই আমাদের তাত্ত্বিক সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। অবশেষে বলা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছাই সত্যানুসন্ধানের একমাত্র উপায়।[২২] বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তাধারাতে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় । স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন — "নিত্য শুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ. অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন। তার কখনই পরিণাম বা বিকার হয় না। আর এই সকল বৈচিত্র্য সেই একমাত্র আত্মাতেই কল্পিত হয়েছে মাত্র। আত্মাতেই নাম ও রূপে ব্যাকৃত এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিবেকানন্দ অপর এক জায়গায় বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের চরম লক্ষ্য। যতক্ষণ না "অহং ব্রহ্ম" — এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হবে ততক্ষণ এই জন্ম মৃত্যুগতির হাত থেকে নিস্তার নেই।[২৩]

তবে অদ্বয় ভাববাদের অন্যতম উদ্‌গাতা স্বামীজির চিন্তা ধারার বৈশিষ্ট্য পারমার্থিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ততখানি সুস্পষ্ট নয়, যতখানি সুস্পষ্ট এই ব্যাবহারিক জগৎ এর ব্যাখ্যায়। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" — এই বাক্যটির প্রথম অংশ সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তা ধারায় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য হয় তো দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্র জগৎকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের মত স্বামীজি মায়াবাদকে স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজের কথায় 'কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হল ? এর উত্তরে বলা যায়, বাস্তবিক সেটি বহু হয় না। মায়ার প্রভাবে এক অদ্বৈত তত্ত্ব বহুরূপে প্রতীত হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না। এই বহুত্ব কাল্পনিক. এক অদ্বিতীয় কূটস্থ ব্রহ্মতত্ত্বের বিবর্তনমাত্র ।

তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য যেমন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" বলে ব্যাবহারিক

জগৎকে অবিদ্যা কল্পিত বলে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎকে উড়িয়ে দিয়েছেন --- স্বামীজি কিন্তু তা করেন নি। তিনি জগতের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। এ বিশ্বে যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায় বা অনুভব করা যায়, সে সমস্তকে ভগবানেরই সৃষ্টি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে জগৎ ভগবানের নিবাস স্থল। কাজেই ব্যবহারিক জগৎকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেই তিনি Practical Vedanta তত্ত্বচিন্তা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২৬]

বিবেকানন্দ কর্তৃক কর্মময় জগতে পরম সৎ-এর অস্তিত্ব উপলব্ধি

কর্মময় জগতের মধ্যে 'পরম সৎ' - এর অস্তিত্ব উপলব্ধি কতদূর যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও স্বামীজির পক্ষে এহেন যুক্তি গুরুত্ব হারায় নি আজও। কারণ নিছক তত্ত্ব কথা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল ব্যবহারিক জীবনের গ্লানি দীনতা আর বৈষম্যকে তত্ত্বের আলোকে সমুজ্জ্বল করে তাঁকে সুন্দরতর করে তোলা। ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যতিরেকে কেবল মাত্র পারমার্থিক তত্ত্বের আলোচনা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় তা অসম্ভবও বটে। এটাই ছিল তাঁর Practical Vedanta চিন্তার উত্থিত বীজ। এর ফলে তাঁর দার্শনিক সচেতনতা প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে।[২৭]

অদ্বৈত বেদান্তের মতে, বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা মোক্ষ লাভ করতে পারি। মোক্ষ লাভে আমাদের কর্ম বন্ধন সর্বথা ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর সংসারে নিজস্ব কোন কর্তব্য থাকে না। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta তত্ত্বের অনুসন্ধান করে বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানী সামাজিক সেবার কর্তব্য থেকে মুক্ত নন। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে যা কর্তব্য তারই ব্যাখ্যা পাই স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta দর্শন তত্ত্বে।[২৮]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে কার্যে পরিণত বেদান্তের ব্যাখ্যা

স্বামীজি কার্যে পরিণত বেদান্ত বলতে কি বলতে চেয়েছেন, তার অন্যতম ব্যাখ্যা তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নানা দিক হতে দেখলে এটা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করা অবশ্যই সম্ভব। তিনি আরো বলেছেন যে, আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্গীতা যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এটা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে; সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ কর্মবীর অর্জুনকে জীবনের সংকটময় মুহূর্তে যে উপদেশ দিয়েছেন তা দর্শন তত্ত্বেরই। আবার গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে — তীব্র কর্মানুশীলতা, কিন্তু তার মধ্যে আবার চির শান্তভাব। এই তত্ত্বকে 'কর্ম রহস্য' বলা হয়েছে, আর এই

অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য।[২৭]

দৈনন্দিন কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ

স্বামীজি মনে করেন, সমাজে এবং কর্মজীবনে অদ্বৈত বেদান্তের প্রয়োগ সম্ভব এবং এর উপযোগিতা আছে — তা বুঝবার জন্য তিনি আরো বলেছেন "এই রূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাই যে, বেদান্ত দর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু এর প্রধান প্রধান অংশ গুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক অনুশীলিত হতে পারে। স্বামীজি বলেছেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিণী পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার কাজের তাড়না কিছুই নয়, এই যুদ্ধ কোলাহলের মধ্যেও অর্জুন উচ্চতম দর্শনের তত্ত্ব কথা শুনবার এবং সেটা কার্যে পরিণত করবার প্রেরণা ও উন্মাদনা উভয়ই পেলেন। সুতরাং আমরা আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরাম প্রিয় কর্ম জীবনে বেদান্তের অনুশীলন কেন করতে পারব না ?[২৮]

[Everything goes to show that this Philosophy must be very practical; and later on, when we come to the Bhagavad-Gita most of you, perhaps, have read it, it is the best commentary we have on the Vedanta Philosophy - curiously enough the scene is laid on the battle field, where Krishna teaches this Philosophy to Arjuna; and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of it eternal calmness. This is the secret of work, to attain which is the goal at the Vedanta.]

এই সব আলোচনায় বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন যে, উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ভগবদ্গীতা উপনিষদ্ বেদান্ত বিদ্যার উদ্ভব অরণ্যে বা গিরিগুহায় সীমিত নয় এবং তার প্রয়োগ এবং সাধনা কেবল অরণ্যবাসী বা গুহাবাসিগণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমাজের সর্বক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবনের সর্ব কর্মে বেদান্তের প্রয়োগ, এর যথার্থ ব্যবহার সম্ভব, শুধু যে সম্ভব তা নয়, প্রয়োগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।[২৯]

বিবেকানন্দ আরো বলেছেন যে, ভক্তিতে যেমন সকল মানুষের অধিকার আছে, তেমনি আত্ম তত্ত্বের চিন্তায়, ব্রহ্মচিন্তায় সকল মানুষেরই অধিকার আছে। তবে তা মুখ্য অধিকার না হোক গৌণ অধিকার অবশ্যই আছে।[৩০]

কর্মজীবনে বেদান্ত কথাটির মর্মার্থ

এখানে উল্লিখ্য এই যে, বিবেকানন্দ Practical Vedanta কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এবং প্রত্যেকটি অর্থই যুক্তি সঙ্গত ও বেদান্ত শাস্ত্র অবিরুদ্ধ। প্রথম অর্থটি এই যে, যদিও বেদান্তের সন্ন্যাসী সেবকগণ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাধন

চতুষ্টয় সম্পন্ন সন্ন্যাসীই বেদান্তের মুখ্য অধিকারী, তথাপি তাঁরাই গৃহস্থাদির গৌণ অধিকার বা মন্দ অধিকার অস্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্যও গৃহস্থের গৌণ অধিকার স্বীকার করেছেন। এবং উপনিষদের ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের আলোচনা যে রূপ পরিবেশে, যে রূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত দেখা যায়, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আত্মচিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা সর্বাবস্থায় সকল স্তরের মানবই করতে পারে।[৩১] বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধব্যাপৃত ক্ষত্রিয় অর্জুনকে আত্ম তত্ত্বাদি বেদান্ত উপদেশের ঘটনার দ্বারা এটা বুঝতে হবে যে, কর্ম জীবনে ও ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত উপদেশের প্রয়োজন ও উপযোগিতা একান্তরূপে স্বীকার্য।[৩২]

বিবেকানন্দ Practical Vedanta কথাটির অপর একটি অর্থ নিরূপণ করেছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব। যিনি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[৩৩] — এই আত্মাই ব্রহ্ম। 'তত্ত্বমসি'[৩৪] তুমিই তিনি — এই অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তাঁর অবশ্যই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় ও সকলের প্রতি সেবা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' সর্বদা মানুষের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে (ঈশ্বরকে) প্রেমপূর্বক সেবা করতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। আর এটাই হল বিবেকানন্দের মতে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।[৩৫]

ভদবদ্গীতায় স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে —

"লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।"[৩৬]

— অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় নিষ্পাপ দ্বিধাহীন ঋষিগণ সর্বভূতের হিতে রত থেকে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে থাকেন। অভিপ্রায় এই, বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ বিবেকানন্দকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল — তার চাইতেও তিনি অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন বেদান্তের দর্শন চিন্তায় এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় ও দীক্ষায়। "সর্ব জীবে দয়া নয়, দয়া করার তুই কে" — ঠাকুরের এরূপ বাণী স্বামীজির 'অহং জ্ঞান' বিসর্জনের নিমিত্ত হয়েছিল। ঠাকুর অর্ধবাহ্য দশায় একদিন নরেনকে বলেছিলেন "দয়া নয়, দয়া নয় শিব জ্ঞানে জীব সেবা"। প্রতিটি মানুষ যে এক একটি শিব — এই চিন্তায় স্বামীজির দর্শন চিন্তা। বিশ্বের নিখিল বস্তুতে ব্রহ্ম বিদ্যমান।[৩৭] উপনিষদের বাণী "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[৩৮]। আর সেই ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে। কাজেই মানুষকে সেবা করলেই ব্রহ্মকে সেবা করা হয়। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা অরণ্যে বসবাস করে সর্বত্যাগী হয়ে ব্রহ্মের উপাসনা করতেন; এবং নিজের মধ্যেই ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করতেন। স্বামীজি ঋষিদের সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবৎ সত্তা খুঁজে পেলেন। এবং ঈশ্বরসেবার উদ্দেশ্যে জীব সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।[৩৯]

অবশেষে বিবেকানন্দ কর্মজীবনে বেদান্ত (Practical Vedanta) কথাটির অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে, বেদান্তে কেবলমাত্র তার চরম প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই বুঝায় না। বেদান্তের সাধন শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এবং

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য প্রভৃতিকে নিয়ে বেদান্ত দর্শনে সাধন অধ্যায় নামে একটি অধ্যায় রচিত রয়েছে। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে কর্মানুপ্রবেশ অসম্ভব হলেও বেদান্তের সাধনাংশ সম্পূর্ণরূপেই অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, সম্পূর্ণ অভ্যাস সাপেক্ষ (Practical)। অতএব লক্ষ্য করা যায় যে, বিবেকানন্দ 'কর্মজীবনে বেদান্ত ও শীর্ষক ভাষণগুলিতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থতা প্রেম প্রভৃতি এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সাধনেরও আলোচনা করেছেন।[৪০]

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্য

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তায় ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু তাঁর মৌলিক তত্ত্ব জানতে পারি। তিনি বলেছেন ধর্ম মূলতঃ ব্যাবহারিক জগতের জিনিস। কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রধানতঃ ব্যাবহারিক জগতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও কোনো এক অর্থে একমাত্র ধর্মই জীবকে, ব্যাবহারিক জগৎকে অতিক্রান্ত করার উপায় নির্দেশ করতে শেখায়। এই ব্যাবহারিক জীবনকে সর্বাত্মক ভাবে সুষম ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে পারে একমাত্র ধর্মই। প্রশ্ন এই, অন্য কিছুই কি ব্যাবহারিক জীবনকে সর্বাত্মক ভাবে সুষম আর সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে পারেনা? ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য বহু শাস্ত্রের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। সেগুলি কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় অথবা যদি সেগুলি একেবারে অপ্রয়োজনীয় না হয়; তবে কতটুকু তাদের প্রয়োজনীয়তা ? আর তাদের প্রয়োজনীয়তার কোন অর্থেই বা ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার সমান নয় ? এখানে বক্তব্য এই, ব্যাবহারিক জীবনে অন্যান্য শাস্ত্রগুলির প্রয়োজনীয়তাবোধ — পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র সচেতনতা আছে তিনি স্বীকার করবেন না। আর রাজনীতিশাস্ত্র, অর্থনীতিশাস্ত্র, সমাজতন্ত্রবিদ্যা, কামশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগুলির ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ছাড়া সব শাস্ত্রই মূল্যহীন অকিঞ্চিৎকর হবে। এই সমস্ত শাস্ত্রে আমরা পাই বিশ্ব প্রকৃতির বহুল বৈচিত্র্যের বহু বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা। আর পাই এই বহুল বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী বিভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা। কাজেই এই সমস্ত শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যে পদে পদে উপলব্ধি করা যায় তা অনস্বীকার্য। তবে ব্যাবহারিক জীবনের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই যেন ধর্মের পূর্ণতর আর ব্যাপকতর পটভূমিতে যথাযথ সমাধান খুঁজে পায়। আর জনহিতকর সর্বজনীন প্রয়োজন যদি ধর্ম মেটাতে না পারে তবে তার মূল্য কখনই বিশ্বজনীন ও শাশ্বত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।[৪১] অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে স্বামীজি একথা বলেছেন —

"If a religion cannot help man whenever he may be, whenever it stands it is not of much use. it will remain only a theory for the chosen few."[৪২]

(ধর্ম যদি মানুষকে রক্ষা করতে বা তাকে সাহচর্য্য দিতে না পারে; তাহলে তা যতই নীতিমূলক হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য ও গ্রহণ যোগ্যতা যতই মহৎ হোক না কেন, তা মানুষের প্রকৃত পক্ষে কোন কাজে আসে না, তা কেবল গ্রন্থে নিবদ্ধ তত্ত্ব ও নীতিমালা

হিসাবেই স্থবির হতে বাধ্য)

অতঃপর বিবেকানন্দ আবার বলেছেন, "প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ধর্মের যাচাই চলবে না"। কেবল তাই নয়, ধর্মের মাধ্যমেই যে কোন কিছুর (সৎ কর্ম ও সচ্চিন্তার) পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় — সমস্ত কালের সমস্ত ধর্মের ভিতরেই একটিমাত্র ধ্রুব সত্যের অনুসন্ধান চলেছে — সত্যই ধর্মের প্রতিষ্ঠা "সত্যং ধর্মে প্রতিষ্ঠিতম্" "সত্যং বদ ধর্মং চর।"[১১] একথাও বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ—

"It has been the season at all nation it is the goal of religion and this ideal is expressed in various languages in different religions".[১২]

সকল রাষ্ট্রের সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হল আদর্শ ও মূল্যবোধের সুশৃঙ্খল উপস্থাপন। ধর্মের ভাষা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন হলেও মূল উদ্দেশ্য হল মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের জাগরণ।

স্বামীজির ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনার তাৎপর্য্য

সাধারণতঃ সকল ধর্মেই এই শাশ্বত ধ্রুব সত্যটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঈশ্বর সাধনা ও ধারণার মধ্যে। তাই ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে স্বামীজির চিন্তাধারায় আমরা কি পাই তা বলা দরকার। প্রশ্ন উঠতে পারে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা চৈতন্য স্বরূপ এক সত্তায় বিশ্বাসী, ঈশ্বরের ধারণায় তাঁদের বিশ্বাস কতখানি যুক্তি সঙ্গত ? ঈশ্বর বলতেই বুঝি অতি লৌকিক একটি সত্তা। তিনি অতিলৌকিক হলেও এই লৌকিক জগতের সৃষ্টিকর্তা পালন- কর্তা এবং সর্বতো ভাবে এই লৌকিক জগতের সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রক। কিন্তু জগৎকে যদি সত্য বলে স্বীকার না করি তা হলে জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর সত্যত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বাদ দেওয়া যায় না। এর আগেই আমরা দেখেছি বেদান্তের মতবাদকে স্বামীজি বাস্তব জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং ব্যবহারিক বস্তু জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গ্রহণ করেছেন। তাই লৌকিক জগতের সীমার মধ্যেও যাঁর অসীম প্রকাশ তাঁর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বিবেকানন্দের কাছে কিছু কম ছিল না। তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। কেবলমাত্র লৌকিক জগৎ বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়, এই ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে পারমার্থিক ক্ষেত্রে উত্তরণের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের ধারণাকে স্বামীজি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তার সাক্ষাৎকারের উপায় হিসাবে স্বামীজি জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম এবং ভক্তির গুরুত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরে নিয়োজিত হলেই চৈতন্য স্বরূপ পরম সত্তার সাক্ষাৎকার হতে পারে — এই বিশ্বাস স্বামীজির মনের গভীরে উপ্ত ছিল।[১৩]

ঈশ্বর সম্পর্কে স্বামীজি আরো বলেছেন — জীব ব্যষ্টি ও ঈশ্বর সমষ্টি এই তত্ত্বটি বুঝতে হলে মাণ্ডুক্যোপনিষদের উক্তি স্মরণ রাখা উচিত। সেখানে স্পষ্টভাবেই

'প্রাজ্ঞ' যে মূল জীব, অর্থাৎ ব্যষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্যরূপ যে জীব তাকেই সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন করে বলা হয়েছে; "এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবোপি যোহিভূতানাম্"[৪৬] — অর্থাৎ ইনিই (প্রাজ্ঞ জীবই) সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, ইনিই সব কিছুর উৎপত্তির কারণ এবং সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। এইরূপে কারণ শরীর ব্যষ্টি অজ্ঞানে উপহিত যে জীব সে সমষ্টি অজ্ঞান রূপ কারণ শরীরে উপহিত ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অভিন্ন বলে নিরূপিত হয়। ঐ স্থলে কারণ ঈশ্বরকেই কারণ জীবের সমষ্টি বলা হয়েছে। জীব ও ঈশ্বরের এই একত্ব উপাসনাকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হয়েছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৪৭], 'তত্ত্বমসি'[৪৮], 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[৪৯] ইত্যাদি মহাবাক্যে এই তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

সবশেষে স্বামীজি ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন, যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ঈশ্বরের স্বরূপ, ঐশ্বর্য আর সৃষ্ট জগতে তাঁর সম্বন্ধে এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কেউ বা একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কেউ উপাসনা করেন নিরাকারের। কেউ পূজা করেন সাকারের। কেউ বা ঈশ্বর মানার জন্য জাগতিক সমস্ত কিছুর থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে চান, কেউ বা আবার বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন। এপ্রসঙ্গে স্বামীজির মতের দুটি দিক সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান প্রয়োজন। একটি হল ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, অপরটি হল অপরাপর ধারণা গুলির প্রতি তাঁর নমনীয় মনোভাব।[৫০]

বিবেকানন্দের দর্শনে জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা

বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন চিন্তায় ধর্ম ও ঈশ্বরের ন্যায় জগতের সৃষ্টির কথাও বলেছেন। দৃশ্যমান বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কোথা থেকে হল কি প্রকারে হল এই নিয়ে প্রশ্ন সংশয় ও তার সমাধান চিরদিনই মানব মনকে আলোড়িত করেছে তার পরিচয় বেদোপনিষদে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। এরই উল্লেখ করে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন প্রকৃতি নামক সমুদায় সত্তার (পদার্থের) উদ্ভব কথা স্মরণাতীত কাল হতে মানব মনের উপর কাজ করছে, মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রমাগত মানব হৃদয়ে প্রশ্ন উঠেছে; এগুলি কি ? এগুলির উৎপত্তি বা কোথা থেকে ? মানবের অতি প্রাচীন রচনা বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে, দেখতে পাই কোথা থেকে জগৎ এল ? যখন "অস্তি নাস্তি" কিছুই ছিল না "অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল,[৫১] তখন কে এই জগৎ সৃষ্টি করল ? কেমন করেই বা করল ? কে এই রহস্য জানে ? বর্তমান সময় পর্যন্ত এই প্রশ্ন তো এসেছে ? লক্ষ লক্ষ বার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে, আরও লক্ষ লক্ষ বার এর উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ তা নয়। প্রত্যেকটির উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে — কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্য ক্রমশঃ বাহু প্রসারিত করছে।

স্বামীজির কথা, আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করছি, তা বর্তমান কালের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করার চেষ্টা করব।[৫২]

স্বামীজির সৃষ্টিতত্ত্ব সমীক্ষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব

বিবেকানন্দের উপরিউক্ত এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, জগৎ প্রভৃতি প্রকৃতির সৃষ্টির কারণ তত্ত্ব বিষয়ে তিনি উপনিষদ্ ও দর্শনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়ে জড় বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তকেও গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দ দুরূহ ভারতীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তকে বুঝবার জন্য কখন কখন আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছিলেন। সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন বেদ বিরুদ্ধ নয়, বরঞ্চ বেদ সম্মত।[৫৩]

দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিতত্ত্ব উন্মোচনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়

স্বামীজি জগৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন, এমন এক সময় ছিল যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, জগৎ ছিল না, এই গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর গ্রাম, মনুষ্য ইতরপ্রাণী উদ্ভিদ, বিহঙ্গসহ আমাদের জননী বসুন্ধরা, এই অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি ছিল না — এ বিষয় পূর্ব হতেই জানা ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ? কি করে মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল, তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।[৫৪]

[Our mother earth with the seas and occans, the rivers, and mountains, cities and villages, human races, animals, plants, birds, and planets and luminaries, all this infinite variably of creation, had no existence. Are we sure of that ? We will try to trace how this conclusion is arrived at.]

উদ্ভিদ জীবন আসে বীজ হতে, আবার বীজই পরিণত হয় উদ্ভিদে। মনুষ্য জীবন আসে জীবাণু হতে আবার জীবাণুতেই ফিরে যায়। এ থেকে আমরা কি শিখি ? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা কার্য; আর সূক্ষ্ম ভাব এর কারণ। সর্বদর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল বহুদিন পূর্বে প্রমাণ করেছেন 'নাশঃ কারণলয়ঃ'। অদ্বৈত বেদান্তও সে কথাই বলেছে। বেদান্ত দর্শনের "তদনন্যত্বম্"[৫৫] ইত্যাদি সূত্র থেকে জানতে পারি। কার্য কারণাত্মক, কারণই কার্যের স্বরূপ। কার্য কারণের সঙ্গে অভিন্ন, কারণ হতে পৃথক নয়। কারণের অতিরিক্ত সত্তা কার্যের নেই। যেমন সমুদ্রের অতিরিক্ত সত্তা তার নেই, মৃত্তিকার অতিরিক্ত সত্তা ঘটাদির নেই। কারণটিই রূপ বিশেষ ধারণ করে 'কার্য'

নামে পরিচিত হয়। যে উপাদান গুলিতেই টেবিলের উৎপত্তি সেটাই কারণ আর টেবিলটি কার্য, ঐ কারণগুলিই এখানে টেবিল রূপে প্রকটিত। এইভাবে স্বামীজির মতে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাচ্য বিদ্যাই প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে।

[What do we learn from this ? That the manifested or the grosser state is the effect, and the finer state the cause. Thousands of years ago, it was demonstrated by Kapila, the great father of all philosophy, that destruction means going back to the cause. If this table here is destroyed, it will go back to its cause, to those fine forms and particles which, combined, made this form which we call a table.][৫৬]

পুনরায় সৃষ্টির পূর্বে কিছু কাল এই কারণের অব্যক্ত কার্যোৎপাদন শক্তির প্রয়োজন। বীজকে মাটিতে দীর্ঘদিন রাখলে পরে বীজ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে পরে অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই দীর্ঘকাল অদৃশ্য ও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে থাকতে হয়, যাকে প্রলয় বা 'সৃষ্টির পূর্বাবস্থা' বলে, তারপর আবার সৃষ্টি হয়।

স্বামীজি এই চক্রাকার পরিণামকে পাশ্চাত্যবাসীকে সহজভাবে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — 'সূক্ষ্মরূপ গুলি ব্যক্ত হয়ে স্থূল হতে স্থূলতর হয়, যতদিন না এরা এদের চরমসীমায় পৌঁছায়। চরমে পৌঁছালে তারা আবার সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম হতে আবির্ভাব ক্রমশ স্থূল হতে স্থূলতর রূপে পরিণতি কেবল যেন এদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্তন, একেই বর্তমান কালে ক্রমবিকাশবাদ বলে। এরা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু আমাদিগকে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে জানতে হবে। তা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রম সংকোচন প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ যা হতে বৃহৎ বৃক্ষটি এসেছে। আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ঐ বীজ রূপে ক্রম সংকোচন হয়েছে। অতএব যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হল, প্রকৃতপক্ষে তা সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসংকুচিত ভাব, এটাই পরে মহাপুরুষ রূপে ক্রমবিকশিত হয়।'[৫৭]

এইরূপে বিবেকানন্দ জড়বাদী বৈজ্ঞানিক গণের ক্রমবিকাশবাদ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ভারতের শাস্ত্রীয় পরিণামবাদের অপর অংশ ক্রমসংকোচনবাদ যোগ করে এবং বীজ বৃক্ষ ন্যায় প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জড় শক্তি মন চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চেতনেরই প্রকাশ। যা কিছু দেখা শোনা বা অনুভব করা সবই তাঁর সৃষ্টি, ঠিক বলতে গেলে তাঁরই পরিণাম — আরও ঠিক বলতে গেলে বলতে হয়, তিনিই স্বয়ং বিশ্বরূপে বিরাজমান। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[৫৮] তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রম সংকুচিত হয়ে অণু হন, আবার ক্রম বিকশিত হয়ে পুনরায় ঈশ্বর হন, জগৎ প্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই কেবল

মানব যুক্তি ও মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। এক কথায় বলতে গেলে, আমরা তা হতেই জন্মগ্রহণ করি, তাতেই জীবিত থাকি আবার ফিরে যাই।[৫৯] উপনিষদের উপদেশ — ''যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।''[৬০]

বিবেকানন্দের মতে দেহেন্দ্রিয়াতীত আত্মতত্ত্ব

বিবেকানন্দ স্থূল শরীরে দৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মন ইন্দ্রিয়ের বিস্তর তফাতের কথা প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন — চর্মচক্ষু না থাকলে বাইরের জগতের কোন কিছু দেখা সম্ভব নয়, তা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয় যে, চর্মচক্ষু থাকতেই হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর পশ্চাতে মস্তিষ্ক স্নায়ু কেন্দ্র থাকবেই যেখানে যথার্থ ইন্দ্রিয়টি বর্তমান। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চর্মচক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ুকেন্দ্র স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকলে প্রকৃত দর্শন ক্রিয়া অসম্ভব। শুধু চক্ষু নয় কর্ণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাইরের কর্ণ কেবল যন্ত্র মাত্র। যন্ত্র থাকতেই হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। মনের সঙ্গে কানের সংযোগ না থাকলে শ্রবণেন্দ্রিয় শুনেও কিছু শুনে না। যেমন — একটি সভাতে কোন এক ব্যক্তি সেখানে বসে থেকেও, তাঁর মনঃ সংযোগ যদি না থাকে তা হলে সেই সভার আলোচনা শুনতে পাবে না। আবার মনও কেবল বাহক মাত্র। তাঁর কাজ হল বিষয় বস্তু বুদ্ধিকে প্রদান করা। কিন্তু বুদ্ধিকে প্রদান করলেই যথেষ্ট হল না।[৬১] বুদ্ধির কাজ হল কোন বিষয় শরীরের অধীশ্বর আত্মার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আত্মার কাছে পৌঁছালে তবে জ্ঞান নিষ্পত্তি হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে যন্ত্রগুলি মানুষের স্থূল দেহের বাইরে অবস্থিত। ভারতীয় দর্শনে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয় গুলিকে সূক্ষ্ম শরীর নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম বলে অভিহিত হলেও এটা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর যে কোন সময় ধ্বংস হয়। সূক্ষ্ম শরীর সহজে নষ্ট হয় না, পরন্তু এটা কখন বলিষ্ট, কখন দুর্বল হয়। যেমন — বৃদ্ধ লোকের মন কখন সবল থাকে কখনও দুর্বল থাকে। শরীরের যেমন উন্নতি অবনতি আছে মনেরও তেমন উন্নতি অবনতি হয়ে থাকে। কাজেই মন ও আত্মা কখনই এক নয়। আত্মার কোন ক্ষয় বা অধঃ গতি নেই। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ, তাই তার হ্রাস বৃদ্ধির কোন সম্ভবনা নেই।[৬২] এইভাবে বিবেকানন্দ স্থূল শরীর চর্মচক্ষু প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কথা বলে শরীরাদি নিষ্ঠ স্বপ্রকাশ আত্মাকে প্রতিপাদন করেছেন। মন সম্পর্কে আরও বিস্তৃত রূপে অন্যত্র বিবেকানন্দ বলেছেন, আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা যাঁর পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা — 'চতুর্মুখ' বলে পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে যাঁকে মহৎ বলা হয়েছে ও দার্শনিক কর্ত্তৃক 'মন' বলে কথিত হয়, তা মস্তিষ্ক রূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই 'মহৎ' এর কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি মনের যোগ ফলকে 'সমষ্টি মন' বলা যায় তাকেই আত্মা বলা হয়েছে।[৬৩]

স্বামীজির মতে বিজ্ঞান নতুন আবিষ্কার নয়

জগৎ সৃষ্টির বিবর্ত্তনকে বোঝাতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন যে, আধুনিক কালে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহ, আমাদের কাছে নতুন বলে প্রতিভাত হলেও এগুলি অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উত্তাপ, তড়িৎ, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত শক্তি সমূহকে একটি শক্তিই বলা যেতে পারে। অতি প্রাচীন কালে সংহিতা আবিষ্কার করেছিল সমস্ত শক্তির একত্বভাব। সেই শক্তি হল প্রাণ। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে গেলেও — এই অনন্ত প্রাণ শক্তি সমূহ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায় না। সেই প্রাথমিক অবস্থাতে যা হতে উৎপন্ন হয়েছিল তাতে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে কিছু কালের জন্য অবস্থান করে। এটাই হল জগৎ প্রপঞ্চের প্রলয় অবস্থা। প্রাণ শক্তি সমূহ আদি প্রাণে লীন হয় এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়। আসলে সম্পূর্ণ রূপে গতিশূন্য না হলেও 'আনীদবাতং' (ঋক্‌বেদ) এই মন্ত্র অনুসারে প্রাণ গতিহীনভাবে স্পন্দিত হয়েছিল । ভূতবস্তু বা জড়পদার্থের ক্ষেত্রে তারা আকাশে লীন হয়, কারণ আকাশই হল আদিভূত। সৃষ্টির কালে ঐ সমস্ত শক্তি প্রকাশিতহয়। ঐ প্রকাশকেই সৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয়েছে । আর ভূত সকল যা আকাশে বিলীন হয়েছিল; তাও আকাশ হতে প্রকাশিত হয়। তখন স্পন্দন যত দ্রুত হয় তেমনিতর ভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে আকাশই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।[৬৪]

বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন চিন্তায় সৃষ্টি ও জগৎ প্রসঙ্গে স্থূল দেহের কথা, স্থূলদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত সূক্ষ্মদেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির কথা মনের বিভিন্ন অবস্থা বা বৃত্তিভেদের কথা দেহ ও মনের পরিবর্তনশীলতার কথা ও মনোবৃত্তিতে উদ্‌ভাসিত নিত্যবিজ্ঞান রূপ আত্মতত্ত্বের কথা সবই অতি সংক্ষেপে নিরূপণ করেছেন। কারণ, প্রকৃত বেদান্তীর ন্যায় ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব নিরূপণেই তাঁর অধিক আগ্রহ উৎসাহ ও দৃঢ়তা লক্ষিত হয়।[৬৫]

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তায় গীতার প্রভাব

বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন চিন্তায় ঈশ্বর তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনার পর গীতোক্ত তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, গীতায় কোন নতুন তত্ত্বের অবতারণা করা হয়নি। বেদ ও উপনিষদে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলিই গীতায় সমীক্ষিত হয়েছে । বিবেকানন্দ গীতার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেয়েছেন সেগুলি তিনি সকলকে ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন । বিবেকানন্দের মতে গীতাই বেদান্তের বা উপনিষদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। তিনি বলেছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বেদের একমাত্র প্রামাণিক টীকা 'গীতা' সর্বজনের জন্য ও সর্বকালের জন্য রচিত হয়েছে । এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির অবলম্বনীয় মার্গ সহজভাবে উপদিষ্ট হয়েছে। তুমি যে কাজই কর না কেন সবই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হোক এটাই গীতোপনিষদের শিক্ষা।[৬৬]

বিবেকানন্দ গীতার নিষ্কাম কর্ম উপাসনার উপদেশ পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন কর্মযোগীর চিত্তে বিষয় অনাসক্তির সমাবেশ হয়। কর্মে ব্যাপৃত থেকেই কর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে।

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ।[৬৭]

অর্থাৎ এই সংসারে যথাবিহিত কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করেই মানুষ শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। এই প্রকারে কর্ম করলে মনুষ্য কর্মবন্ধনে লিপ্ত হবে না। এটা ব্যতীত অন্য পথ নেই ।

আমরা কার্যে আসক্ত হই সেই জন্যই আমাদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেবল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করলে সেই কর্ম আর কোনো নতুন ফল উৎপন্ন করে না, বরং কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করলেই কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু একেবারে আসক্তি শূন্য হয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করা কার পক্ষে সম্ভব ? এই নিরাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে ? যিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের মধ্যেই সেই পরমতত্ত্ব স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা লোভ ও অহঙ্কার থেকে বিমুক্ত, তিনিই নিষ্কাম কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন।[৬৮] স্বামীজি অন্যত্র বলেছেন, চিত্তশুদ্ধির সাক্ষাৎ সাধন হলেও জ্ঞানলাভই নিষ্কাম কর্মের চরম ফল, কেননা সাত্ত্বিক কর্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। গীতায় কথিত হয়েছে ঃ

"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।"[৬৯]

— হে পার্থ, সকল কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

বিবেকানন্দ আরো বলেছেন যে, গীতায় যে কেবল জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করা হয়েছে তা নয়, গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ভক্তির কথা বলেছেন তার অর্থ ঈশ্বরকে নিবিড় ভাবে ও নিষ্কাম ভাবে ভালবাসা, "যে কেউ ভক্তিভরে আমার উদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি।" এই হল ভক্তের প্রতি ভগবানের আশ্বাস। "যদি শক্তি থাকে, বেদান্ত দর্শনের ভার গ্রহণ কর এবং স্বাধীন হও, যদি তা না পারো তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাও যদি না পারো, কোনো প্রতীকারের উপাসনায় ব্রতী হও। তাও যদি না পারো, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে সৎ কাজ কর। তোমার যা কিছু আছে, ভগবানের সেবায় সেগুলিকে উৎসর্গ কর। যদি তুমি কিছুই করতে না পারো, একটি সৎকাজও যদি তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হতে পারে তবে প্রভুর শরণ লও।"[৭০] গীতায় ভগবানের উক্তি —

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।[৭১]

আরো বলেছেন —

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।।[৭২]

অর্থাৎ সর্ব ধর্ম বিসর্জন পূর্বক ঈশ্বরে একান্ত শরণাগতি রূপ ভক্তির দ্বারা সমস্ত মৃত্যুময় বন্ধন হতে সমস্ত দুঃখের নাশ হয়। আর ভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন, ভক্তির দ্বারাই যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্তি রূপ মুক্তি হয়, তা স্বয়ং ভগবান্ গীতায় স্পষ্টতঃ বলেছেন, 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া'। সুতরাং ভক্তি ও জ্ঞান সমন্বিত হয়ে মুক্তির সাধন হয় ।

দার্শনিক বিবেকান ন্দ গীতা সম্পর্কিত একটি ভাষণে গীতার শিক্ষা আলোচনায় বলেছেন, অর্জুন নিজের আত্মীয় স্বজনকে দেখে অস্ত্রাঘাত করতে পারছেন না। অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই মমতার বশবর্তী হই ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই । পশুর মত আমরা আবেগের অধীন। একেই আমরা বলি 'অনুরাগ' বা আসক্তি। আসলে এটা অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের তমঃপরিণাম সম্মোহ ।এটাই বন্ধনের মূল কারণ ।[৭৩]

গীতায় যে তত্ত্বটিকে বিবেকানন্দ মুখ্য বলে মনে করেছেন তা হল — "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে"[৭৪] — 'পার্থ তুমি বীর' তোমার এ ক্লীবতা সাজে না। বিবেকানন্দের মতে এই একটি শ্লোক পড়লেই গীতার লক্ষ্য যে কর্ম প্রেরণা তা (সম্যকরূপে) অনুভব করা যায়। কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার বিবক্ষিত মুখ্য অভিপ্রায় নিহিত। লোককে পাপী বলে দোষী না করে তার অন্তরে যে পাপ আছে তাকে নিন্দা কর আর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর । ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলেছেন, "নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' — তোমাতে এটা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপকে ভুলে আপনাকে পাপী, রোগী শোকগ্রস্ত করে তুলেছ এটা তো সমীচীন নয়। যে কার্য অন্তরের শক্তির উদ্রেক করে দেয়, সেটা পুণ্য আর যেটা শরীর মনকে দুর্বল করে; সেটাই পাপ।[৭৫]

সর্বশেষে বলা যায় যে, বিবেকানন্দ সমগ্র গীতাকে পৃথক্ করে সম্যক্ আলোচনা করবার সময় পাননি। তবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষণে গীতার অংশ বিশেষের আলোচনায় যা পাই তাতেই গীতার তাৎপর্য্য, বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর মতকে বিশেষ রূপে ধারণা করা যায়। তা আমরা স্বামীজির গীতা চিন্তায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছি ।

এইভাবে আমরা দেখি স্বামীজির চিন্তাধারা গীতা ও উপনিষদের মূল ভাবধারাকে অনুসরণ করেছে। নীতির রাজ্যে মৌলিক সমস্যা হল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে, কাজেই সে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের দ্বন্দ্ব নীতির ক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা ।

বিবেকানন্দের দর্শনে ঔপনিষদিক উদারতম নীতি

ঔপনিষদিক দৃষ্টিতে স্বামীজি উদার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে হৃদয় বৃত্তির প্রসারের

ভিত্তিতেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ ও ভালবাসার বিস্তারে । এই পথেই মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি ধীরে ধীরে শোধিত হতে পারে। ঠিক কথা বলতে কি মানুষ যে সর্বক্ষণই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে ঠিক তা নয়। সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ করতে সক্ষম। প্রয়োজন হলে বন্ধুর জন্য বন্ধু আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্বত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই, যা মা করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরার্থ বৃত্তি দুর্লভ নয়।[৭৬]

আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে কেন এমন হয় ? উপনিষদ বলেন, জায়ার নিকট পতি যে প্রিয় হয়, তা পতির কারণে নয়, মায়ের নিকট সন্তান যে প্রিয় হয় তা সন্তানের কারণ নয়, আত্মার তুষ্টির কারণে পতি, পুত্র, ভার্যা প্রিয় হয়, ''পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। না বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি''[৭৭] — আত্মার কারণেই এরা সকলে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মীয় পরিজন বন্ধু সাধারণ মানুষ সকলকে ব্যাপ্ত করে আত্মা বিরাজমান, সেই কারণেই মানুষের নিকট মানুষ প্রিয় হয়। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের ভিত্তিই হল স্ব স্ব হৃদয়ে সর্বদা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর ঈশ্বরের উপলব্ধি । এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ এবং সেই ঘনিষ্ঠতাবোধ বিশ্বমৈত্রী বিশ্বপ্রেম সৃষ্টি করে। এই কারণে স্বামীজি উপনিষদের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠতা বোধের ভিত্তিকে আত্মীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্মীয়তা বোধের ভিত্তিতে স্বার্থ সংযম পূর্বক পরার্থপরতা নীতি অভ্যাস করতে শিক্ষা দিয়েছেন ।

বিবেকানন্দের বাণীতেও অনুরূপ ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, ''ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায়। 'স্ব'-এর বা এই অহং -এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। সেই অহং একটা লোক বিবাহিত হলে দুই জন হল। তাদের আবার সন্তান সন্ততি হলে অনেকগুলি হল — এরূপে 'অহং' এর বিস্তৃতি হতে থাকে সকলকে আপন করে নেওয়ার বুদ্ধিতে সমগ্র জগৎ তার আত্মীয় স্বরূপ হয়ে যায়। এটা ক্রমশ বর্দ্ধিত হয়ে সর্বজনীন প্রেম — অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই আনন্দময় ঘনীভূত প্রেমই ঈশ্বর।[৭৮]

বিবেকানন্দের দর্শনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ ধর্মেরও আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেব সকলের জন্য ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন সৎকর্ম বা সদ্ ধর্মের কথা প্রচার করে। এই জন্যই বিবেকানন্দের কাছে বুদ্ধদেবের স্থান ছিল সুমহান। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের সকল মতের সমর্থক ছিলেন না বটে । তিনি নিজেই বলেছেন যে ''অনেক বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে''। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও স্বীকার করেছেন, ''জগতের আচার্য গণের মধ্যে একমাত্র তাঁরই কার্য কোনরূপ আভ্যন্তরীণ পক্ষপাতরূপ অভিসন্ধি ছিল না।'' ভগবান্ বুদ্ধ বলেছিলেন, কেউই তোমাকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর; নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর''।[৭৯]

ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর কারণ ''বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তার যদি কোনোরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোনো মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সৎকর্ম ও সৎচিন্তা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গমার্গ অনুশীলন দ্বারা চরমাবস্থা (বোধিসত্ত্ব) লাভ করতে পারে। বুদ্ধদেব এই চরমাবস্থা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যথোচিত কর্ম সাধনার দ্বারা। 'তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করেছিলেন; তাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় সূচ্চ আধ্যাত্মিক কর্ম দ্বারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারা যায়।[৮০]

বুদ্ধদেবের শিক্ষার প্রতি বিবেকানন্দের আকর্ষণের আর একটি কারণ তাঁর বিস্ময়কর ভালবাসা। ''যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখ মোচন ভিন্ন অপর কোনো কিছুই অপেক্ষা রাখে না।'' ''মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মানুষ ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। এই সর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো। মানুষকে ভালবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছিল।[৮১]

সবশেষে বলা যায়, বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই দর্শন চিন্তার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবন আর লৌকিক অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য পুরোপুরি বর্তমান।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তায় আমরা এক অদ্ভুত অনুপম সমন্বয় লক্ষ্য করি — আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকের সমন্বয়, পার্থিব ও অপার্থিবের সমন্বয়, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে সমন্বয়, ধর্মে ও বিজ্ঞানে সমন্বয়, ধর্মে ও কর্মে সমন্বয়, জ্ঞানে, প্রেমে ও ভক্তিতে সমন্বয়, সনাতনে ও নবীনে সমন্বয়; অতীতে,

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সমন্বয়; আত্মার্থে ও পরার্থে সমন্বয় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সমন্বয়, ভোগে ও ত্যাগে সমন্বয় একের সঙ্গে বহু বৈচিত্র্যের সমন্বয় এবং সরূপে অরূপের - সসীমে অসীমের সমন্বয়। এই সমন্বয়াত্মক উদার দৃষ্টিই বিবেকানন্দের বেদান্তকে নবরূপ দান করেছে। শক্তিতে বিপুল, ধ্যানে গভীর, কর্মে কুশল, ধর্মে নিষ্ঠা ও আত্মায় শ্রদ্ধা — এই হল বিবেকানন্দের অসাধারণত্ব। যে বিবেক নিয়ত বিবদমান শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার নয়, যে বিবেক পূর্ণ জ্ঞান সদা আনন্দময়, যেখানে আনন্দই বিবেক, তিনিই এই বিবেকানন্দ।[৮২]

১। স্বামী বিবেকানন্দ । প্রথম ভাগ প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ৭০ উদ্ধৃত ।
২। দর্শন জিজ্ঞাসা, পৃঃ- ১৩
৩। স্বামী বিবেকানন্দ , প্রথমভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ৫৫
৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ- ৫-১০
৫। লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ-৩
৬। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথমভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ৫০
৭। স্বামী বিবেকানন্দ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ- ১০৬
৮। উদ্বোধন ৬৮ তম, পৃঃ- ৪৮১
৯। যুগদিশারী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৯৯
১০। The complete works. P. 139-140
১১। যুগদিশারী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ১৫০
১২। বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ, পৃঃ- ১
১৩। মুণ্ডক উপনিষদ, মন্ত্র সংখ্যা ৪৫ (ব্যাখ্যার অংশ)
১৪। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ - ১.৪.১০
১৫। স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ- ৩৩
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ৩/৫
১৭। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১২৯
১৮। উদ্বোধন ৮৮ তম বর্ষ, পৃঃ- ৯২ - ৯৩
১৯। The complete works. vol-II, P. 358-359
২০। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ - ৩.১.১
২১। The complete works, vol-I, P. 360-361
২২। The complete works, vol-I, P. 362
২৩। Ibid. vol - II. P. 275
২৪। ব্রহ্মসূত্র-ভূমিকা - ৩২-৩৩
২৫। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষ, পৃঃ- ৮১
২৬। ঐ, পৃঃ- ২৩
২৭। The complete works. vol-II. P.292
২৮। Ibid – P. 296

২৯। The complete works, Vol. II, P. 292
৩০। উদ্বোধন ১০০ তম বর্ষ, পৃঃ- ১৯৯
৩১। ঐ, পৃঃ- ৪৮২
৩২। যুগদিশারী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ১৮০
৩৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ - ২/৫/১৯
৩৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ - ৬/৮/৭
৩৫। যুগদিশারী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৮০
৩৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫/২৫
৩৭। রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃঃ- ১৩১
৩৮। ছান্দোগ্যোপনিষৎ - ৩/১৪/১
৩৯। রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃঃ- ১৩১
৪০। স্বামীজির বাণী ও রচনা সংকলন, পৃঃ- ৬৯-৭০
৪১। বিবেকানন্দের স্মৃতি, পৃঃ- ৩২৪
৪২। The complete works, Vol. VI, P. 9
৪৩। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ - ১.১১.১
৪৪। The complete works, Vol. VIII, P. 81
৪৫। The complete works, Vol. I, P. 384
৪৬। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ - ১/৬
৪৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ - ১.৪.১০
৪৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ - ৬.৮.৭
৪৯। বৃহদারণ্যকোপনিষদ - ৩/৪/৫
৫০। The complete works, Vol. VIII, P. 67
৫১। Ibid. vol - II, P. 203
৫২। Ibid. P. 203
৫৩। বৃহদারণ্যভাষ্যবার্তিক, ১/৪/৪০২
৫৪। The complete works, Vol. II, P. 204
৫৫। ব্রহ্মসূত্র - ২/১/১৪
৫৬। The complete works, Vol. II, P. 205
৫৭। The complete works, Vol. II, P. 206
৫৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৩/১৪/১
৫৯। The complete works, Vol. II, P. 204 – 206
৬০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - ৩/১/১
৬১। The complete works, Vol. II, P. 215
৬২। The complete works, Vol. III, P. 400
৬৩। Ibid. P. 401
৬৪। The complete works, Vol. III, P. 398 – 399
৬৫। Ibid – P. 244
৬৬। The complete works, Vol. III, P. 245

৬৭। ঈশোপনিষদ্ - ১/২
৬৮। The complete works, Vol. I, P. 264
৬৯। গীতা — ৪/৩৩
৭০। স্বামীজি গীতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।
৭১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ১৮/৫৬
৭২। ঐ — ১২/৭
৭৩। The complete works, Vol. II, P. 459
৭৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২/৩
৭৫। The complete works, Vol. I, P. 460
৭৬। উদ্বোধন ১০০ তম পৃঃ- ২০২
৭৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ - ২/৪/১১৫
৭৮। ভক্তি রহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ- ১৪৭
৭৯। The complete works, Vol. IV, P. 135
৮০। Ibid – P. 136
৮১। The complete works, Vol. VIII, P. 100
৮২। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যা-এর পত্রিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তার ভিত্তি

নদী নিজের জল পান করে না, গাছও নিজের ফল খায় না, এদের অস্তিত্ব যেমন পরের জন্য, তেমনি যুগে যুগে মহাত্মারা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা মানব জাতিকে শান্তি ও আনন্দ এনে দেন। তাঁরা নিজেরা ভয়ংকর মায়া সমুদ্র অতিক্রম করে নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যদের অতিক্রম করতে সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের জীবন ও বাণী সব যুগের সব মানুষেরই প্রেরণার উৎস।

ভারতবর্ষের প্রাচ্যদর্শন যা সুপ্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছে তা হল 'বেদান্ত'। কঠোপনিষদে নচিকেতার ত্যাগ, সত্যবাদিতা ও আদর্শে পরিতুষ্ট হয়ে যমরাজ নচিকেতার কাছে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। কঠোপনিষদে খুব সুন্দরভাবে সেটা আম্নাত হয়েছে। মণ্ডুকোপনিষদে ও কোনোপনিষদে সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতা উপদিষ্ট হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রকটিত হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্ত - বিধৃত এই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবটি স্বামীজি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছে অপরিপক্ক অবস্থায় একদিন তিনি বলেই ফেললেন 'ঘটি টাও ব্রহ্ম, বাটীটাও ব্রহ্ম ? এটা কেমন করে সম্ভব' ? ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন 'হ্যাঁ জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম। পরে এটা বুঝতে পারবি।' স্বামীজি পরবর্ত্তী জীবনে এটি যে শুধু বুঝেছিলেন তাই নয়, প্রাচ্যের এই বৈদান্তিক আদর্শকে সামাজিক স্তরে কল্যাণের পথে নামিয়ে এনেছিলেন।[১]

আধ্যাত্মিকতাই স্বামীজির বেদান্ত চিন্তার মুখ্য ভিত্তি

অতীতের বহু শতাব্দী ধরে প্রতিভাশালী মনোদেহবিজ্ঞানীদের প্রয়োগ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত সকল আধ্যাত্মিক রীতিকে যাঁরা অধিগত করতে পারেন, তাঁরাই আধ্যাত্মিক শক্তিকে আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার লাভ করেন। এবং এই অধিকার অনিবার্যরূপে ও প্রকাশ্য ভাবে কর্ম শক্তির মধ্যে আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হাজার হাজার সুবিধাবাদী পাশ্চাত্যবিদ্যাবিৎ যোগের রীতিগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্য ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁদের এই বাণিজ্যিক যোগ ব্যবস্থার কোনো সম্পর্কই ছিল না। তাঁদের কাছে আত্মবিশ্বাস ছিল বিনিময়ের মাধ্যম, যা দিয়ে তারা অর্থ, শক্তি, স্বাস্থ্য, শারীর সৌন্দর্য যৌনশক্তি প্রভৃতি পার্থিব বস্তুকেই লাভ করতে পারত। কিন্তু এমন কোনো প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি নেই যিনি যোগের এরূপ অপব্যবহার দেখে বিরক্তি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা অনুভব করেন না। এবং তাদের প্রতি এই বিরক্তি, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাকে বিবেকানন্দ যে ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনভাবে আর কেউ করেননি। যা মুক্তির

পথ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে এরূপ হীনভাবে ব্যবহার করাকে — চিরন্তন আত্মতত্ত্বকে লাভ করবার মূল উপায়কে রক্তমাংসের হীনতম কামনার, দম্ভ ও শক্তিমদমত্ততার অস্ত্রে পরিণত করাকে যে কোন নিঃস্বার্থ ধর্ম বিশ্বাসীই অধঃপতিত জীবের লক্ষণ মাত্র ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেন না।[২]

বেদান্তসম্মত প্রকৃত যোগগুলিকে আমরা আধ্যাত্মিক দৈহিক ও মানসিক সংযম বলতে পারি। বিবেকানন্দ তাঁর গ্রন্থে এরূপ চারটি যোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ এই চারটি যোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় অনুশীলনের আদর্শই তিনি প্রচার করেছেন। সেখানে একটি যোগ বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয়েছিল। সেটিকে তাঁর নাম অনুসারেই চিহ্নিত করা যায় — সেটি হল বিচার বা বিবেকের যোগ। এই যোগটিই তাঁকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যকে মিলিত করতে প্রেরণা দিয়েছিল। বস্তুত এই যোগ জ্ঞানযোগ — জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধি লাভের উপায় অর্থাৎ শুদ্ধ মনে জগতের পরমতম সারবস্তু আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান।

অতীব দুঃসাধ্য এই 'জ্ঞানযোগ' মার্গে দুঃসাহসিক অভিযানের কাছে মেরুর বিজয়ও যেন শিশুক্রীড়ামাত্র। এই অভিযানে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর প্রতিযোগী, শাস্ত্রনির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত পথেই এর অভিযান। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মত এটা যেখানে ইচ্ছা, যেমন ভাবে ইচ্ছা আরম্ভ করা যায় না।[৩]
এর জন্য সযত্নে সুকঠোর শিক্ষা লাভ করতে হয়। আর এরূপ শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন 'রাজযোগের'। রাজযোগ বা ধ্যানযোগ স্বয়ং স্বতন্ত্র। এটি সর্বোচ্চ জ্ঞানযোগমার্গীর প্রস্তুতি পর্ব। জ্ঞানযোগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, অন্যান্য যোগের মত পরম আত্মাসত্তাই এর বিশেষ লক্ষ্য হলেও এর আরম্ভণীয় ক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের যুক্তি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে এটা কোন রূপ অনিশ্চয়তার ভঙ্গীতে গ্রহণ করে না। ''অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের মূল উৎস''।[৬]
মুক্তিতে (সত্যে) উপনীত হবার দ্বিতীয় পথ হল হৃদয়ের অন্তঃস্থিত ভক্তিযোগ। ঈশ্বরের ঘনীভূত প্রেমই ভক্তি। হৃদয়ের মধ্যে যে সকল বৃত্তি স্বভাবত প্রতিকূলরূপে প্রকটিত হয়, সেগুলির সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সকলকে বিশেষভাবে সচেতন হতে বলেছিলেন। নচেৎ এই ভক্তিমার্গকে অনুসরণ করা অন্নগতপ্রাণ এই যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আর মনের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করার প্রকৃষ্ট উপায় হল কর্মযোগ। শমদমাদি কর্মসংস্কৃতিরূপ কর্মের গূঢ় কৌশলকেই 'কর্মযোগ' বলে। ভগবদ্ গীতায় উক্ত হয়েছে — 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।'[৭] কর্মের সাফল্যে ও বৈফল্যে চিত্তের সমত্ববুদ্ধিকে যোগ বলা হয়েছে। ভগবানের উক্তি — 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে'[৮] স্বামীজির প্রচারিত কর্মযোগের বাণী সরাসরি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ

করে চেতনাকে জানিয়ে দেয়। কর্মের প্রকৃত শক্তিকে সম্যকভাবে লাভ করে উচ্চতম উদ্দেশ্যে (স্বার্থকে ত্যাগ করে পরার্থে) আমাদের নিয়ত কর্ম করতে হবে। আলস্যকে সর্বথা ত্যাগ করতে হবে। আর সত্যকে অনুসরণ করে শারীরিক ও মানসিক সকল অসদ্‌ভাবকে প্রতিরোধ করতে হবে। স্বামীজিপ্রোক্ত এই কর্মযোগ সাধনা মানুষের সকল প্রকার দুঃখমোচনের অপরিহার্য্য সোপান।

স্বামীজি মনে করতেন, শরীরগত অভাব পূরণ করে অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম কিন্তু অভাব যত অধিক সাহায্যও যত সুদূরপ্রসারী হয়, উপকার ততই মহত্তর হয়। যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করতে পারা যায়, অবশ্যই তার উপকার করা হল; যদি এক বৎসরের জন্য তার অভাব দূর করতে পারা যায়, তবে তা অধিকতর উপকার হয়; আর যদি চিরকালের জন্য সব অভাব দূর করতে পারা যায়, তবে সেটাই হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করতে পারে। অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে, কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই সকল অভাববৃত্তি চিরতরে বিদূরিত হয়। অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্যই মানুষের প্রকৃষ্ট সাহায্য, মানুষকে যিনি পরমার্থজ্ঞান প্রদান করতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক । আমরা দেখতে পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করার জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁরাই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্ম প্রচেষ্টার প্রকৃত ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যিনি সুস্থ ও সবল, তিনিই অসাধ্য সাধনেও দক্ষ হতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক ও মানসিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে সাহায্য। অন্নবস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর-প্রাণদান অপেক্ষাও এটা মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞতা মহা মৃত্যুতুল্য। এর পরই অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব অপরকে সাহায্য করার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয় — সর্বনিম্নেও। কারণ এটা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত হলে মানুষ যে কষ্ট পায়, খাওলেই তা চলে যায়; তবে ক্ষুধা আবার ফিরে আসে। কিন্তু সব দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হবে, যখন আমার সর্ববিধ অভাব দূর হবে। তখনই কোনও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমাদেরকে কষ্ট দিতে পারবে না, কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণাই বিচলিত করতে পারবে না। অতএব সর্ববিধ অভাব ও দুঃখ মোচনের জন্য আমাদেরকে আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন হতে হবে । বেদান্তের এই অমূল্য ধারণাকে বিবেকানন্দ তাঁর দার্শনিক চিন্তার মূল ভিত্তিভূমি করেছিলেন।[১]

ভারতবাসীর জীবনে স্বামীজির বেদান্তভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য বিদ্যা বেদান্তের শাশ্বত বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বেদান্তের মহান উপদেশগুলি মানব জাতির সমক্ষে উপস্থিত করবার ভার দিয়েছিলেন — যেমন, সত্যের একত্ব, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং সমস্ত ধর্মের সমন্বয়। যৌবনের প্রারম্ভেই স্বামীজি স্বীয় অনুভূতিবলে নিজের ভবিষ্যৎ জেনেছিলেন এবং পরে পাশ্চাত্যে প্রচারকালে বলেছিলেন, 'যেমন প্রাচ্য ভূ-ভাগে ঘোষণা করবার জন্য বুদ্ধের বিশেষ একটা বাণী ছিল আমারও তেমনি পাশ্চাত্য দেশে ঘোষণা করবার একটি বাণী আছে।[৮]

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ত্যাগীরাই সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, ভোগীরা নয়। আমরা দেখি বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ও গুরু নানকের মত মহাত্মারা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। জনসাধারণের মনের উপর তাঁদের আধিপত্য রাজা বা সম্রাটের চেয়ে অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।[৯]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁর কয়েকজন যুবক শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে নিকটবর্তী বরাহনগরে একটি মঠ স্থাপন করলেন, সেখানে তাঁরা ত্যাগের জীবন অবলম্বন করলেন এবং অবশেষে অদ্বৈত বেদান্তের মহান আচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সংঘের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সংঘের প্রতিষ্ঠা হল[১০], যার মূল নীতিকথা হল ''বিদ্ধি আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ''[১১]। অর্থাৎ আপনার মোক্ষ ও জগতের হিতসাধনের জন্য তত্ত্বকে জানো।

ভারত ভ্রমণকালে স্বামীজির দারিদ্র্য দুঃখ অনুভব ও তার প্রতীকার

পর্যটন স্পৃহা ভারতীয় পরিব্রাজকদের মজ্জাগত। কথায় বলে — ''রমতা সাধু রহতা পাণী''। সাধু যদি প্রবহমাণ নদীর মত অবিরাম চলতে থাকেন তবে স্রোতস্বতীতে যেমন ময়লা জমে না, সাধুর জীবনও তেমনি নিষ্কলঙ্ক থাকে। কিছুকাল পরে বিবেকানন্দ মঠ ছেড়ে পরিব্রাজক হলেন। তিনি সমগ্র ভারত বেশির ভাগ পদব্রজে পর্যটন করলেন, এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করলেন। এইভাবে তিনি অগণিত মানুষের শোচনীয় দুঃখজর্জরিত জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। একবার তিনি তাঁর স্বাভাবিক তেজস্বিতার সঙ্গে বলেছিলেন, এই জন্মে যে ঈশ্বর এক টুকরো রুটি দিতে পারলেন না, পরজন্মে সে ঈশ্বর স্বর্গরাজ্য দেবেন — এই রূপ বিশ্বাস করা স্বপ্নাতীত। তিনি বলেছিলেন, ধর্মকে পালন করা ভারতীয়গণের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন - ''খালি পেটে ধর্ম হয় না।'' তিনি সাধারণের দুরবস্থার

প্রতি স্থানীয় শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন, "নিখিল বিশ্বে আত্মরূপে যে করুণাময় ভগবান্ বিরাজমান একমাত্র সেই ভগবানে আমি বিশ্বাস করি। সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র দুঃখ যন্ত্রণাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি। আর সর্বোপরি আমাদের উপাস্য পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ সব জাতির দরিদ্র-নারায়ণ এরাই সব সময়ে আমার আরাধ্য।"[১২]

বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ কালে আরো বলেছেন যে, "বেদান্তের আবির্ভাব আমাদের এই দেশেই। যুগযুগান্তর ধরে আমাদের জনগণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের স্পর্শ করা অপবিত্রতা, তাদের সঙ্গে উপবেশন করা অপবিত্রতা, অন্ত্যজ হয়ে তারা জন্মেছে, অন্ত্যজ হয়েই তারা থাকবে। পরিশেষে তিনি কার্যসূচী দিয়ে বলেছেন, "আমি আবার তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তোমাদের কর্ত্তব্য কর্মসূচী হবে। প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমাদেরকে যেতে হবে দুঃখার্ণবে নিমজ্জমান ভারতের লক্ষ লক্ষ জনগণের কাছে এবং তাদের তুলতে হবে হাতে ধরে। এরূপ কার্যসূচী উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "পবিত্রব্রতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যেতে হবে দেশের আনাচে কানাচে, প্রচার করতে হবে মুক্তির বাণী, সহায়তার বাণী, সামাজিক উন্নতির বাণী এবং সাম্যের বাণী।[১৩]

স্বামীজি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করার জন্য ভারত পরিক্রম করেন। তাঁর বাসনা ছিল সমস্ত ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত মূল রহস্যপূর্ণ কথাকে আবিষ্কার করা। তিনি ভেবেছিলেন, বহু আঘাত ও বিপদ সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা যে জাতি কুল হারিয়ে ফেলেনি বা সংস্কৃতির দিক থেকে বর্ণ সংকর হয়ে যায়নি এর মূল রহস্য সন্ধান করা প্রয়োজন। ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার বহু অংশ হয় স্বাভাবিক নিয়মে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নয় খ্রীষ্টীয় ধর্মের চাপে এমনভাবে রপান্তরিত হয়েছে যে, আজ সেই ধর্মচর্চা জীবন থেকে সরে গিয়ে স্মৃতির যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অনুরূপ বা অধিকতর প্রবল আঘাত এলেও ধর্মপ্রাণ প্রাচীন ভারত কি মন্ত্র বলে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, স্বামীজি সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রম করে ও সর্ব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গ লাভ করে সেই রহস্যের শাশ্বত স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।[১৪]

তাছাড়াও স্বামীজি ছিলেন স্বদেশ প্রেমের মর্মস্পর্শী উদ্‌গাতা। তার বাণী সমূহ থেকে আমরা জানতে পারি, স্বামীজি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে এসে বলেছেন, "এখন আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে আসলাম, কিন্তু হায়, এদেশের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে আমি কীরূপ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হয়েছি তা বলা যায় না। চক্ষুর অশ্রুধারা রুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এদের দরিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করে, এদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা

বৃথা প্রয়াসমাত্র হবে। এই কারণেই ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকা যাচ্ছি''।[১৫]

স্বামীজি আরো বলেছেন, ''ভারতবর্ষে দীন হীন লোককে আমরা কি চক্ষে দেখে থাকি তা চিন্তা করে আমার হৃদয় দারুণ ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠছে। এই অবনত অবস্থা হতে উঠবার, এই দুর্দ্দশা হতে উদ্ধারের কোন সুযোগ, কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছে না। দিন দিন তারা দুর্গতির অতলে ডুবছে। নিষ্ঠুর সমাজ তাদের উপর যে মুষ্টির আঘাত বর্ষণ করছে, তা তারা অনুভব করছে, অথচ জানে না — কোথা হতে তারা আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। তারা ভুলে গেছে যে তারাও মানুষ, এর পরিণামই দাসত্ব। ওহে উৎপীড়ক দুরাত্মাগণ তোমরা জাননা — উৎপীড়ন এবং দাসত্ব একই জিনিসের এপিঠ ও ওপিঠ। এবং দাসত্বই উৎপীড়িতের ভাগ্য লিপি।[১৬]

অতঃপর আমরা দেখেছি যে, বিদেশীয় ভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় মন যে যুগে দাসত্বের মনোভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সেই যুগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

ভারত পরিক্রমণ কালে স্বামীজি অনুধাবন করেছিলেন, পুরাতনের নিন্দা বা সমালোচনার দ্বারা জাতির সংশোধন হতে পারে না। সর্ব সাধারণের মধ্যে চিরন্তন নীতি শিক্ষা বিস্তার করাই হবে ভারতের উন্নতির অন্যতম পথ। তাই স্বামীজি বলেছেন যে, বৈদেশিক শিক্ষাকে মূর্খের মতো অনুসরণ না করে দেশীয় শিক্ষার আদর্শ ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। দেশকে বুঝতে ও জানতে হবে। জাতীয় জীবনে গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার যাতে শুভঙ্কর লক্ষ্যের অভিমুখী হয় তা দেখতে হবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রচলিত সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। স্বামীজি একবার কাশীর পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রকে বলেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন বলে হৃদয়কে পাষাণ করতে পারবেন না, বরং সন্ন্যাসীর হৃদয় গৃহস্থের চেয়েও কোমল হবে, অপরের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগের অংশী হবে।[১৭]

স্বামীজি ভারত পরিক্রমায় প্রাচীন ভারতের মহিমার পরিচয় পেয়ে ও ভারতের সাধারণ মানুষের ধর্মভাব, সততা এবং চরিত্রের পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন; আবার উচ্চবর্ণের মানুষের স্বার্থপরতা ও শোষণের নগ্ন রূপ দেখে ব্রিটিশ শাসক বর্গের নিপীড়ন ও অত্যাচারের ভয়াবহ চেহারা দেখে পীড়িত হয়েছিলেন ও গভীর মর্মবেদনায় দগ্ধ হয়েছিলেন।[১৮]

স্বামীজি দীর্ঘদিন ভারত ভ্রমণের ফলে দেখলেন যে ''ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের বন্ধু কেউ নেই, সাহায্য করবার কেউ নেই। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তার উপর ক্রমাগত আঘাত করছে। দীর্ঘকাল নির্যাতনের ফলে তারাও যে

মানুষ, এ কথা তারা ভুলে গেছে। দারিদ্র্যে অশিক্ষায় দেশ জর্জরিত। ক্ষমতাশালী যাঁরা, তাঁরা জনগণের এই দুঃখ মোচনের জন্য সাহায্যও করতে চান না। তাঁরা এদেরকে নিজেদের ভাই বলে ভাবতে এমন কি, মানুষ বলেও ভাবতে ভুলে গিয়েছেন। যে ভারত মানুষকে স্বরূপত ভগবান্ বলে ঘোষণা করেছে, সেই ভারতের সন্তানগণ আজ মানুষকে মানুষের সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত, কী শোচনীয় পরিণাম।[১৯]

তখন ভারতের ঘোর দুর্দিন। আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক সব বিষয়েই ভারত তখন অতি অবনত এবং ভারত তখন পরাধীন, ধর্মের নামে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানকে তারা আঁকড়িয়ে আছে, ধর্মের অপব্যবহারও চলছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক দৈন্যেরও সীমা নেই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিতে আস্থা হারিয়ে বিজেতা জাতির জড়বাদ মূলক সভ্যতাকে গ্রহণ করতে সে উদ্যত। জড়বাদের কি মোহই না তারা সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ভারতবাসীর এই অত্যধিক মোহ দেখে দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণ কালে ব্যথিত চিত্তে স্বামীজি বিস্মৃতপ্রায় ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। দুর্বল চিত্ত ব্যক্তিগণকে বিশ্বনাথ যেন রক্ষা করেন।[২০]

ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দেশবাসীর এই নিদারুণ দুঃখ যতই তাঁর নজরে পড়েছে ততই তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে। হৃদয়ে সে বেদনা যে কত গভীর, তার সামান্য আভাস পাওয়া যায় আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি যা বলেছিলেন, তা হতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পরবর্তীকালে বলেছিলেন "স্বামীজি বললেন, হরি ভাই দেখছি আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে। অপরের জন্য ভাবতে শিখেছি। বিশ্বাস কর খুব তীব্র ভাবে এটা অনুভব করছি । আর বলবার পরই তাঁর দুচোখ অশ্রু ঝরে পড়ল, তাঁর মুখে এই করুণা মাখা কথা যখন শুনলাম, তাঁর মহান বেদনার রূপ যখন চোখে পড়ল, তখন আমার ভিতরটা যে কি হচ্ছিল একবার কল্পনা কর দেখি। তিনি আরো বললেন ভাবলাম এ তো বুদ্ধদেবেরই ভাষা, এ তো বুদ্ধেরই হৃদয় ! আর পরিষ্কার বুঝলাম যে, মানব জাতির সমস্ত দুঃখ কষ্ট এসে স্বামীজির হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছে। এই সমবেদনায় তাঁর বুক ফেটে যেত, চোখ দিয়ে রক্ত অশ্রু ঝরে পড়ত। তবে এই রক্তাশ্রু বিফল হবে না। দেশের জন্য অশ্রুর প্রতিটি বিন্দু থেকে তাঁর অমিত শক্তি মর্মের প্রতিটি অগ্নিময়ী বাণী থেকে দলে দলে মহাবীরেরা সব জন্ম লাভ করবে, তাদের চিন্তা ও কার্যে গোটা জগৎটা কেঁপে উঠবে।[২১]

এই অপার করুণা ও সমবেদনার অসহ্য ব্যথা নিয়ে সারা দেশ ঘুরতে ঘুরতে তিনি দিনের পর দিন ভারতের দুর্দশার প্রতীকারের উপায় চিন্তা করেছেন। এ চিন্তায় তাঁর হৃদয় এত অলোড়িত হয়েছে যে বহুদিন রাতে ঘুমাতে পর্যন্ত পারেন নি। বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছে ।

খেতড়ির রাজা, রামনাদের রাজা, মহীশূরের মহারাজা প্রভৃতি এবং বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাবধারায় তখন অনেকেই অনুপ্রাণিত। তবু তিনি দেখলেন কাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ এদেশে পাওয়া দুর্ঘট। বিলম্ব আর সহ্য হচ্ছিল না। কিভাবে কাজ আরম্ভ করবেন, কোন পথে প্রথম পদক্ষেপ করবেন, তা ভেবে তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না। তাঁর হৃদয়ের বেদনা শুধু বেড়ে চলেছিল, আর বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল।[২২]

এইভাবে অসহ্য যাতনা বুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মাকে দর্শন ও ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সমুদ্রে অবতরণ করলেন, সাঁতারে ভারতের মূল ভূভাগ হতে বিচ্ছিন্ন সমুদ্র মধ্যস্থ ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর গিয়ে উঠে বসলেন। সামনে প্রসারিত ভারতের দিকে চাইলেন, ভারতের অতীত মহিমা ও সমৃদ্ধির কথা, তার বর্তমান হীনতা ও দারিদ্র্যের কথা আর তার প্রতীকার ও ভবিষ্যতে ভারতের লুপ্ত মহিমা উদ্ধারের কথা যুগপৎ মনে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। বাইরে শিলাতটে মূর্ছিত তরঙ্গ মালায় সাগর বিক্ষুব্ধ, আর প্রতীকারের পথহারা হতাশার শিলা তটে মূর্ছিত হয়ে সমবেদনার উত্তাল তরঙ্গে তার অন্তর বিক্ষুব্ধ। ঝরে পড়ছিল আর তাঁর পদ্ম-পলাশের মতো বিশাল নয়ন দুটিকে সজল করে তুলেছিল।

স্বামীজির সহসা অন্তরের বিক্ষোভ থেমে গেল, মানস-সায়র নিস্তরঙ্গ হল, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যান লব্ধ অদ্ভুত আলোকে নিশ্চিত পথের সন্ধান পেলেন। তিনি বুঝলেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণ; এই প্রাণ শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়েছে বলেই তার এই অবনতি। জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সে সবল হয়ে আবার নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বক্ষ স্ফীত করে দাঁড়াতে পারবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিষয়েই ভারত আবার উন্নত হবে। জাতির এই প্রাণ শক্তিকে সতেজ করতে হবে।[২৩]

বর্তমান সংকটময় অবস্থার প্রতীকারের উপায়

স্বামীজি সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি সমাজের দীন, দরিদ্র, দুর্বল জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা করাকে জাতীয় পাপ বলে মনে করতেন। এবং তিনি বিভিন্ন সমস্যার মূল (অশিক্ষা) উৎপাটনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ভারতের নিজস্ব জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি বিস্তৃতি ও পরিণতি বিধান করতে হবে, সমাজের সংস্কার ও স্বাভাবিক বিকাশের উপর জোর দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্ম শক্তির ভিত্তিতে বলীয়ান হওয়া। স্বামীজি সমাজ সংস্কারকদের

আহ্বান করে বলেছিলেন সমাজশক্তির ও রাজশক্তির অন্তর্নিহিত পরম শুভ শক্তি আধ্যাত্মিকতাকে (যা আজ লুপ্তপ্রায়) তাকে উদ্ধার করতে পার কি ? তোমরা সমতা শক্তি ও কর্মশক্তির দিক দিয়ে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েও যুগপৎ সম্পূর্ণ রূপে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সহজাত প্রকৃতির দিক দিয়ে ভারতীয় (হিন্দু) হতে পার কি ? এই রূপই করতে হবে এবং আমরা তাই করব।[২৪] ঘৃণিত লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষকে স্বামীজি আমার ভাই বলে একেরই সন্তান বলে (শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ)[২৫] অপার সহানুভূতির সঙ্গে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে শিক্ষারূপ উপকরণ দিয়ে নরের মধ্যে নারায়ণের পূজা করেছিলেন।

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি অছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। কিন্তু সে শিক্ষা কেবল পাঠ্য পুস্তকগত বা আক্ষরিক নয়। যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর সামর্থ্য দেয়, এবং যে শিক্ষায় আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। বস্তুতঃ তাঁর মতে লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ এবং নারীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তাকেই স্বামীজি জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য পরম সত্য লাভ, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। ব্যাবহারিক জগতে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি কোন ভেদ করেননি।[২৬] উপনিষদের ''ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী''[২৭] — তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারী ও তুমি— এই তত্ত্বটি তাঁর হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল ।

স্বামীজি বলেছেন যে, সমাজের অবিকশিত অবস্থায় রাজশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শৈশবে পিতা কর্তৃক পুত্র পালনের ন্যায় সমাজের রাজকর্তৃক প্রতিপালন অবশ্যস্বীকার্য। তবে ছেলে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন যেমন তাকে মিত্রের মত দেখতে হয়, তেমনি সমাজের বিকাশ ঘটলে জনসাধারণের মতামত নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতে হয়। ভারতবর্ষে এরূপ হয় না, তাই ভারতবর্ষ আজ পরাধীন। স্বামীজি বলেছেন, যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, সত্যনির্ভর না হয়, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম সংস্কৃতি বিমুখ হয় তবে রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হয় এবং তখনই শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয় ।[২৮]

এরপর রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অবলম্বন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের একের প্রাধান্যে ও অন্যের অপ্রাধান্যে জাতির কী ফল হয় তা বলে স্বামীজি তাঁর নিজস্ব চিন্তার কথা বলেছেন, 'যদি এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায় যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ এইসব গুলিই ঠিক

বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটা আদর্শ রাষ্ট্র হবে।[২৯]

স্বামীজি অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, যাঁরা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করেছেন, দরিদ্রের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষা লাভ করেছেন, এমনকি যাঁদের ক্ষমতা প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখ দৈন্যের উপরই নির্মিত, তিনি এই সকল বিশেষ সুবিধা ভোগীদের উপর নির্মম কশাঘাত করে বলেছেন, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি তোমরা শূন্যে বিলীন হও।[৩০]

আমরা স্বামীজির বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, তিনি চেয়েছিলন সম্পূর্ণ এক নতুন সমাজ যেখানে সকলের একই অধিকার থাকবে। তিনি একটা চিঠিতেও অত্যন্ত জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন — 'আমি সমাজের আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তন বিরোধী থসথসে জেলি মাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কিনা দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব একেবারে সম্পূর্ণ নতুন সরল অথচ সবল সদ্যোজাত শিশুর মতো নীরব ও সতেজ সমাজসংস্কার। কারণ পুরোহিত, অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর শোষণের ফলে দরিদ্রগণ আরও দরিদ্র হয়েছে বলে বিবেকানন্দ চেয়েছেন এই সকল শ্রেণীর কবল মুক্ত সমাজ ।[৩১]

বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্র্যের মূলে অবশ্য সামাজিক কারণকেও মুখ্যতঃ দায়ী করেছেন। জমিদারও অভিজাত শ্রেণীর নিদারুণ শোষণ ও নিষ্পেষণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। এই দরিদ্রের কান্না তাদের কানে পৌঁছায়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার কবছে। তখন ধনীরা তাদের সোনা রূপার থালায় অন্নগ্রহণ করেছে ।[৩২]

অতএব দেখা যাচ্ছে, সমাজ সংস্কারদের মূল ত্রুটি হল তাঁদের অর্থনৈতিক চেতনার অভাব, কিন্তু তাঁরা সমাজ সংস্কারের উপর যত জোর দিয়েছেন তত জোর দেননি দরিদ্রসমস্যার উপর। উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা জনগণের শোষণকে দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে সে যুগে নির্দেশ করেছেন একমাত্র বিবেকানন্দ। তাঁর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট চেতনা ছিল বললে কম বলা হয়, তাঁর এবিষয়ে চেতনা ছিল সদা জাগ্রত । তিনি অভিজাত শ্রেণীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেন, যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন শান্তি নেই। আর তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁক জমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।[৩৩]

ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য অবসানের জন্য বিবেকানন্দ কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেন। যেমন ভারতের দারিদ্র্য মোচনের জন্য বিবেকানন্দ পৌরোহিত্যের অবসান ও উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের অবসান চেয়েছেন। বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পেয়েছি। কিন্তু তাঁরা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরালেন। এক কথায় আমাদের সমাজ ভয়াবহ পৈশাচিক স্বাধীনতায় উন্মত্ত। এখানে বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা মুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী যা কিছু অর্থাৎ জাতিভেদ, পৌরোহিত্য চক্রের সৃষ্টি, অধিকারী ভেদ এ সকলের অবসান ঘটাতে হবে। স্বামীজি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, যে সকল সামাজিক নিয়ম এই সর্বজনীন স্বাধীনতার আনন্দের ব্যাঘাত করে, তা অকল্যাণকর এবং যাতে তার শীঘ্র নাশ হয় তাই করা উচিত।[৩৪]

লোকাচারের অন্তর্নিহিত সত্য সমূহ আবিষ্কার

স্বামীজির ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোকাকার সম্পর্কে নিজস্ব একটা বিচার পদ্ধতি ছিল। তিনি মনে করতেন বেশ কিছু দেশাচার প্রাচীন কাল থেকেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যে সকল লোকাচারকে আপাত দৃষ্টিতে বর্তমানে কুসংস্কার বলে মনে হয় সেগুলির পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বামীজির একটা উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায়। হিন্দু সমাজের মধ্যে নতুন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ মাখন প্রভৃতির সরবরাহ, পশুগণের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা ও তাদের পরিচর্যা বিধান ইত্যাদি ভাব যে পূর্ব হতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল প্রাচীন কালে ভক্তিভাবে গোসেবা তারই পরিচয় প্রদান করে।[৩৫]

অতএব এ থেকে বেশ বোঝা যায়, ভারতবর্ষের লোকাচার ও জীবনাচরণের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর কত বেশি ছিল। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, স্বামীজি অনুভব করতেন যে, যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কার্য করেন তবে তাঁকে ভারতীয় প্রণালীতেই করতে হবে। এই ভারতীয় প্রণালী বলতে স্বামীজি কি বুঝাতেন তাও জানা যায় নিবেদিতার রচনাবলী থেকে। সামান্য তুচ্ছ আচার নিয়মকেও তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না। এই সকলের প্রত্যেকটি তাঁর মতে ভারতীয় চেতনা আয়ত্ত করবার উপায় স্বরূপ।[৩৬]

স্বামীজি কেবল লোক সাধারণের আচার আচরণ গুলি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হতেন না। সেই সব আচরণের অন্তর্নিহিত সত্যটিতেও আবিষ্কার করে চোখের সামনে তুলে ধরতেন। নিবেদিতা বলেছেন, কোন একটা প্রথা শিক্ষা দেবার সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত

আদর্শ দেখিয়ে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামীজির ছিল। আজ পর্যন্ত ফুঁ দিয়ে আলো নেভানো মহা অপবিত্র ও অসভ্য জনোচিত কার্য ভেবে আমরা শিহরিয়ে উঠি; আবার শাড়ি পরা ও অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত করার অর্থ অভিমান ও হামবড়াভাবের পরিবর্তে সর্বদা নম্র মধুরভাবে সকলকে মানিয়ে চলা — এ সকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটি আদর্শের অভিব্যক্তি বলে ভারতের সর্ব সাধারণের পরিচিত, পাশ্চাত্যবাসী আমরা হয়তো যথার্থভাবে বুঝে উঠতে পারি না। স্বামীজি সর্বদাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন যে, ভারতীয় চেতনা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটি নাটি ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৭]

স্বামীজি লোকাচার সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, ''কোন পুরুষের সম্মুখে আমাদের মেয়েরা কখনও আহার করে না।'' মেয়েরা বলে ''মরে যাব, তবু স্বামীর সম্মুখে কিছু চিবাতে পারব না।'' মাঝে মাঝে ভাই ও বোনেরা এক সঙ্গে বসে খেতে পারে । ধরুন আমি ও আমার ভাগিনী একসঙ্গে খাচ্ছি, এমন সময় ভগিনীর স্বামী দরজার গোড়ায় এসে পড়ল তখনই ভগিনী খাওয়া বন্ধ করে দেবে, আর স্বামী বেচারা সরে পড়বে।[৩৮]

অতএব উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি থেকে বোঝা যায় ভারতীয় পারিবারিক জীবন ও তাঁর লোকাচার সম্পর্কে স্বামীজির ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল।

স্বামীজি পদব্রজে তার ভারত পর্যটনের কালে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তার মূল তত্ত্বটিকেপ্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছিলেন. প্রাচ্য দেশসমূহের অধোগতির যে কারণ স্বামীজি বিশ্লেষণ করেছেন তা একান্ত ভাবেই বাস্তব সম্মত। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, সাধারণ মানুষকে ক্ষমতাশীলদের শোষণ ও অত্যাচার, নারী জাতিকে হেয় জ্ঞান - এগুলিই তাঁর মতে ভারতবর্ষের অধঃ পতনের মূল কারণ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ বলেই তিনি সমাজের তৎকালীন যে চিত্র এঁকেছেন তা অতীব মর্মস্পর্শী এবং বাস্তব। রোষদৃপ্ত কিন্তু বেদনামথিত ভাষায় যখন তিনি বলেন, 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়া ফুল খেয়ে থাকে আর দশ বিশ লাখ উচ্চ বিত্ত ব্যক্তিগণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন ও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক। সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য'' তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃ পতিত ও অন্তঃসারশূন্য রূপটি আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কোন আদর্শ অবলম্বন করে ভারতবর্ষ নব জীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, তা পরিষ্কার ছিল তাঁর কাছে সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সংকোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসো, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বেঁচে থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।[৩৯]

অবশেষে বলা যায়, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করে তৃণমূল থেকে যে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন তাকে নতুন করে তিনি আবিষ্কার করলেন আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে। পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে কি করে মানুষের জাগতিক জীবন যাত্রার বিষয়গুলি এত সহজে এবং অল্প সময়ে সমাধান করে ফেলল — সেটিকে মূল থেকে অনুসন্ধান করাই ছিল স্বামীজির আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্য।[৪০] অপরদিকে পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রগতিশীল ভারতবর্ষে মানবসম্পদ এত উচ্চ গুণমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ-দারিদ্র্য, অসহায়তা, চারিত্রভ্রষ্টতা, মেরু দণ্ডহীনতা ও পরাধীনতা এত দ্রুত তাকে শোচনীয় অবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে সেটিও স্বামীজির অনুসন্ধানের একটি বিষয় ছিল। ছয় বছর ধরে ভারত পরিক্রমায় যে প্রশ্ন তাঁর মনে বার বার উত্থিত হয়েছিল তা হল এই এত বৃহৎ এত মহান ভারতবর্ষে কেন এত দুঃখ দারিদ্র্য, কেন এত অসহায়তা এবং কেন তার পরাধীনতা ? আর সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই স্বামীজি গিয়েছিলেন আমেরিকায় — নবোত্থিত স্বাধীনতা প্রাপ্ত সদা জাগ্রত একটি মহাদেশে, যেখান থেকে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবেন, আবিষ্কার করবেন তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভারতর্ষকে । আরো বলা যায়, স্বামীজি শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে স্বাধীন আমেরিকাকে যেমন আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি স্বাধীন দেশ আমেরিকার প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, বললে খুব কমই বলা হবে। ভারত সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধিতে এক নবতর দার্শনিক চেতনায় তিনি উদ্বোধিত হয়েছিলেন। তাঁর এই 'ভারত-আবিষ্কার' ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদা বোধ, স্বাতন্ত্র্য দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে নতুন করে উদ্ভাবিত করার প্রথম পদক্ষেপ, এককথায় পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রথম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা ।[৪১]

বিবেকানন্দ যখন ভারত ভ্রমণ করছিলেন তখন শুনলেন যে, চিকাগোতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবে। বহু ভারতীয় শাসক ও ক্ষমতা শালী ব্যক্তি তাঁকে ঐ সভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি রূপে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। মাদ্রাজে অবস্থান কালে তিনি স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসাগরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁকে অনুগমন করতে ইঙ্গিত করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অশরীরী বাণীও তাঁর কানে এল ''যাও'' । অবশেষে বিবেকানন্দ সম্মতি দিলেন ।[৪২]

বিবেকানন্দ ধর্ম মহাসভায় যোগদানের পর পাশ্চাত্য জগতেব অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। যথা — মাক্সমুলার, পল ড়য়সন, উইলিয়াম জেমস, রবার্ট ইঙ্গার, সোল, নিকলো টেসলা, সারাবার্ণ হার্ড এবং মাদার কালভে তাঁর আত্ম জীবনীতে

লিখেছিলেন যে, তাঁর শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তিনি বিবেকানন্দের কাছে ঋণী। তিনি চিকাগোতে জনভি রকফেলারের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকারের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিখে গেছেন। স্বামীজি রকফেলারকে বুঝিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে এই উদ্দেশ্যে ধনদৌলত দিয়েছেন। যাতে তিনি পরের কল্যাণ সাধন ও সাহায্যের সুযোগ পান।[৪৩]

বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষের নিদ্রিত ও পরাধীন ভারতবাসীকে বেদান্তের তূর্য ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ করতে লাগলেন, ''উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত''।[৪৪] যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে ততদিন নিশ্চিন্ত থাকবে না।

বিবেকানন্দ আরো বলেছেন যে ''উপনিষদ প্রতি পৃষ্ঠায় আমাকে তেজবীর্যের কথা বলে থাকে। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায় ? দুর্বলতা দ্বারা কি দুর্বলতা দূর হবে ? উঠে দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর।''[৪৫]

এই বীর্য লাভের প্রথম উপায় — ''উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, আমি আত্মা, তরবারি আমাকে ছেদন করতে পারে না, কোন অস্ত্র আমাকে ভেদ করতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, আমি সর্বশক্তিমান, আমি সর্বজ্ঞ''। অতএব এই আশাপ্রদ মুক্তিপ্রদ বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর। বলো না আমরা দুর্বল। আমরা সব করতে পারি, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিময় আত্মা রয়েছে, আত্মায় বিশ্বাসী হতে হবে।[৪৬]

বেদান্তের এই সকল তত্ত্ব কথা কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকে না, বিচারালয়ে, ভোজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে সর্বত্র এইসকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে হবে।[৪৭]

স্বামীজির চিন্তাধারায় সম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মেনে নিয়ে স্বামীজি বিশ্বাস করতেন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মহান আদর্শ। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ছিল বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে অখণ্ড ভারতবর্ষের এক অখণ্ড সত্তা। সমসাময়িক যুগে অপর কোনও নেতা স্বামীজির মতো প্রাদেশিক অথবা আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে ভারতীয়ত্ব বোধের অতখানি মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ এবং আচণ্ডাল ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতিতে। অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শোষিত দরিদ্র জনগণ ছিল 'দরিদ্রনারায়ণ'।[৪৮]

স্বামীজির ভবিষ্যবক্তৃ সুলভ আহ্বান, ''ওঠো জাগো''। সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল তাঁর এই বাণী। স্বামীজির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতীয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজের পুনরুজ্জীবনকে বিকশিত করে তুলেছে। অবশ্য এই আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জাতীয় সংহতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা। এই কারণে বিদেশী শিক্ষার ফলে

স্বপ্নাবিষ্ট নিদ্রিত দেশকে জাগাবার জন্য তিনি নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে দেখিয়েছিলেন জীবনের নতুন মূল্যবোধ। ধর্মই ছিল তাঁর একমাত্র মৌল ভিত্তি। তাই ধর্মের মাধ্যমে কুসংস্কারকে দূর করে তিনি ভারতের নিদ্রিত মানুষকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।[৪৯]

নিবেদিতা স্বামীজিকে ভারতবর্ষের পুরাতন ও নতুন ভাবধারার সংযোগ পুরুষ রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুদের আচার - আচরণের প্রাচীন ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে তার উপযোগিতাকে অন্বেষণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক জীবন থেকে কুসংস্কার গুলিকে বাদ দিয়ে নবীন ভারতকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারায় সমৃদ্ধ হতে বলেছেন। নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজিকে যে রূপ দেখেছি' গ্রন্থে বলেছেন যে, স্বামীজি হিন্দুর জীবনে প্রচলিত বিধিগুলিকে সব সময়েই নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এটাই দেখাতে চাইতেন যে, আধুনিক যুগের দেশ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কি ভাবে সেগুলিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। তিনি চাইতেন, প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের বিষয়গুলি দেশীয় লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হোক, আর লৌকিক আচার আচরণ রীতিনীতিগুলিও শাস্ত্রীয় ধারার সঙ্গে ক্রমশ সংযুক্ত হোক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র পৃথিবীর সর্বকালের সমস্ত কল্যাণপ্রদ জিনিসগুলি আত্মস্থ করেও ভারতবর্ষেব সন্তান সন্ততিরা যেন একান্তভাবে ভারতীয় লোক সংস্কৃতির মানসিকতাতেই বর্ধিত হয়।[৫০]

পূর্বেই বলা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবৃত্তির দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নত দেশগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন; কোন কোন দেশ উন্নত হবে, আর অন্য দেশগুলি পিছিয়ে থাকবে এরকম ব্যবস্থা চলতে দেওয়া সঙ্গত নয়।[৫১]

শিক্ষা ভিখারী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পরম পূজারী স্বামীজি সেদিন উপলব্ধি করে ছিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ, যুক্তিনির্ভর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানোও আমাদের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। এই বিষয়ে স্বামীজির চিন্তাধারা ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি চাইতেন যে, নতুন ভারতবর্ষ অবশ্যই পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করবে, যুক্তির কাছে পরাভব মানবে অন্ধ কুসংস্কার, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটিও তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন ভারতের দর্শন, অধ্যাত্ম চিন্তা এবং সংস্কৃতির চর্চার পুনরাবিষ্কার ঘটাতে হবে, দূর করতে হবে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ, আর তার চাইতেও যা বেশি মাত্রায় প্রয়োজনীয় তা হলো ভারতীয় হিসাবে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ।[৫২]

সবশেষে বলা যায়, স্বামীজি সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য অনেক পথ হেঁটে,

মানুষের সংসারে অগণিত লোকায়ত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের আচার-বিচার, সংস্কার ভাবধারা, দুঃখ-দারিদ্য, সম্ভ্রমবোধ ও মহত্ত্ব সবকিছুই বিচার ও পর্যালোচনা করে কেবল ভারতীয়ের নয়, বিশ্ব মানবের বাঁচা ও বড় হবার পথকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কথায় "হে বন্ধুগণ তোমাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ, তোমাদের জীবন মরণে আমার জীবন মরণ। আমাদের প্রয়োজন শক্তি, শক্তি কেবল শক্তি। আর উপনিষদসমূহই সমস্ত শক্তির বৃহৎ আকরগ্রন্থ। উপনিষদ যে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। এর দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী করতে পারা যায়। উপনিষদ্ সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা (দৈহিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক) অর্জিত হোক — এটাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।

উপনিষদের প্রতিপৃষ্ঠা আমাদেরকে তেজ ও বীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপনিষদ বলেছেন — "হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠে দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর কোথাও মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা 'ভয়শূন্য হও' এই কথা প্রযুক্ত হয় নি।

তাই বলা যায়, স্বামীজির অভিনব দর্শন চিন্তায় সমস্ত ভারতবাসীর সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হচ্ছে, মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হচ্ছে, মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হচ্ছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের অন্ধকার ভেদ করতে অসমর্থ, সেখান হতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হচ্ছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অনন্ত আধার স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন এটা স্পষ্টতর, গভীরতর হচ্ছে, যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শ মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে প্রাণসঞ্চার করছে, নিদ্রিত শব জাগ্রত হচ্ছে। কেউ এখন আর এর গতিরোধে সমর্থ নয়, ইনি আর নিদ্রিত হবেন না — কুম্ভকর্ণের ন্যায় সকল ভারতবাসীর দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙছে। কোন বহিঃশক্তিই এখন আর এঁকে দমন করতে পারবে না।

১। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথমভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ৯৯

২। The life of Vivekananda and the Universal Gospel P 132 দ্রষ্টব্য।

৩। বিশ্ববাণী দ্বিতীয় খণ্ড। পৃঃ ৩৪

৪। ঐ পৃঃ ৪৪

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ২/৫০
৬। ঐ ২/৪৮
৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা সঙ্কলন। পৃঃ ১৬
৮। স্বামীজির বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ- ৩২৩
৯। উদ্বোধন ১০০ তম, পৃঃ- ৪৯২
১০। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ১১৯
১১। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ- ১১০
১২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ১৯৩
১৩। স্বামী বিবেকানন্দ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ- ৮ - ৯
১৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ - ২১১ - ২১২
১৫। Life of Vivekananda. P. 30
১৬। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ১৮৯
১৭। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃঃ- ১৫৫
১৮। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ- ১৫
১৯। ভারত পুনর্গঠন, পৃঃ- ৮
২০। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৩৬৩
২১। Life of Vivekananda. P. 31
২২। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৮৪৭
২৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ৩১৭-৩১৮
২৪। The complete works vol - VIII. P 29-30
২৫। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, মন্ত্রসংখ্যা - ২১
২৬। যুগদিশারী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ১৯৭
২৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, মন্ত্রসংখ্যা - ৪/৩
২৮। The complete works. Vol - IV. P. 46
২৯। স্বামীজির বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ- ৩৪৯
৩০। The complete works. Vol VIII. P -330
৩১। বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ- ১০৯
৩২। স্বামীজির বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ- ২৩৮
৩৩। The complete works. Vol. V. P. 58
৩৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ- ২৬
৩৫। স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ- ১২৬
৩৬। ঐ, পৃঃ- ২৪৯-২৫০
৩৭। স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ- ২৫০-২৫১
৩৮। The complete works. Vol VIII. P 67
৩৯। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, পৃঃ- ২৯-৩০
৪০। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ১৬
৪১। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, পৃঃ- ১০২২
৪২। Life of Vivekananda. Vol- I. P.380

৪৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৫৩
৪৪। কঠোপনিষদ্ - ১/৩/১৪
৪৫। The complete works. Vol III. P.37
৪৬। The complete works. Vol.III. P 244
৪৭। Ibid. P 245
৪৮। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৯৩
৪৯। স্বামী বিবেকানন্দ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৫৫
৫০। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৬৬৯
৫১। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৯০
৫২। উদ্বোধন ৬২ তম বর্ষ, পৃঃ- ২০২-২০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব সমীক্ষা ও স্বামীজির প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি

অদ্বৈতশব্দের অর্থ

যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরম তত্ত্ব দুইয়ের ভাব-বর্জিত, সেটাই অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। 'অদ্বৈত' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয় "দ্বিধা + ইতম্ = দ্বীতম্ অর্থাৎ দুই ভাগ প্রাপ্ত। দ্বীতস্য ভাবঃ দ্বৈতম্ "দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্‌ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে।" ন দ্বৈতম্ = অদ্বৈতম্ অর্থাৎ দুইয়ের ভাব-বর্জিত। এখানে যে বস্তুটি দুইকে প্রাপ্ত হয় না, বা যার দ্বিতীয়ত্বের অভাব হয়, সেই বস্তুটি জগতের কারণ হয়। যার থেকে কার্যভূত জগৎ বা জগতের অন্তর্গত কোন পদার্থ ভিন্ন নয়, যেহেতু জগৎ বা তদন্তর্গত কোন পদার্থের কারণাতিরিক্ত সত্তা সম্ভবপর হয় না। অতএব যে মতে জগতের মূল কারণ এক অদ্বিতীয় সেই মতবাদের নাম অদ্বৈতবাদ।[১] এখানে বক্তব্য এই, সমগ্র বিশ্বটি ব্রহ্ম থেকেই জাত। ব্রহ্ম এবং বিশ্ব পৃথক দুটি তত্ত্ব নয়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[২] — তত্ত্বত ব্রহ্ম ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই নেই। যেমন ব্রহ্ম সমস্ত পদার্থ মধ্যে বিদ্যমান, তেমন সকল পদার্থই ব্রহ্মে অন্তর্গত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[৩]। 'আত্মনা পূরিতং সর্বম্'[৪]। 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'[৫]। কাজেই ব্রহ্ম সত্তার অতিরিক্ত সত্তা বিশিষ্ট কোন বস্তুই পরিদৃষ্ট হয় না। দুটির কোন প্রশ্ন আসতেই পারেনা। কারণ দুটির প্রশ্ন এলে ব্রহ্মের ব্যাপকতা হানি হয়। তখন ঈশ্বর অসম্পূর্ণ হন। কিন্তু ঈশ্বর কখনো অসম্পূর্ণ হতে পারেন না। তিনি এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছেন আপন ইচ্ছা অনুসারে। কাজেই তাঁর ইচ্ছাশক্তিই এই জগৎ। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। একটি চনক বা ছোলার দুটি দানা যেমন খোসা দিয়ে আবৃত থাকে। সুতরাং কার্য তার প্রকৃতি কারণ থেকে ভিন্ন নয়। যেমন অলঙ্কার সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয়, অলঙ্কার সুবর্ণাত্মকই। তেমনি জগৎ তার প্রকৃতি কারণ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই। এজন্য তদনন্যত্বম্ ইত্যাদি সূত্রে কার্য ও কারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। এইভাবে আচার্য শঙ্করের অলোকসামান্য প্রতিভা বলে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।[৬]

স্বামীজির দৃষ্টিতে ভারতবাসীর জীবনে বেদান্তের স্থান

বেদের অন্তভাগ উপনিষৎই মূলত বেদান্ত। উপনিষদ্-উদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞান ভারতের অক্ষয় সম্পদ। ভারতের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিই অদ্বৈতবেদান্ত। এটা অনায়াসেই বলা চলে যে, বেদান্তই ভারতীয় জাতির আনন্দের মূল উৎস, বেদান্তই জাতির আত্মা, বেদান্তই জাতির প্রাণ। সুতরাং জাতির সকল উন্নতির চেষ্টা, সমস্ত রকমের হিতকর চিন্তা, সকল প্রাণ স্পন্দন বেদান্তোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানকেই কেন্দ্র করে প্রবর্তিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করেও অদ্বৈতবেদান্তের মূল তত্ত্বগুলিকে ব্যাবহারিক জীবনে রূপায়িত করে বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা বহুধা বর্ধিত করেছেন।[৭]

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ পক্ষে অবিদ্যার আশ্রয়ানুপপত্তি দোষ

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর প্রমুখ দার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বিবিধ ভেদসম্বলিত এই জগৎ অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত — মিথ্যা। কিন্তু বিরোধীগণের মতে একথা যুক্তিযুক্ত নয়। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কাকে আশ্রয় করে ভ্রম উৎপাদন করে? জীবকে আশ্রয় করে ভ্রম উৎপাদন করে, একথা বলা যায় না; কারণ 'জীব' ভাবটিও অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত। সুতরাং পরভাবী কার্যকে পূর্বভাবী কারণ অবলম্বন করতে পারে না। আবার ব্রহ্মকে আশ্রয় করেও ভ্রম উৎপাদন করতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ, তাতে অজ্ঞান কোনরূপেই থাকতে পারে না। আর যদি অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করে থাকে তবে তাঁকে (ব্রহ্মকে) আর সর্বজ্ঞ বলা যায় না।[৮]

এর খণ্ডন

শঙ্করের মত অনুসারে বলা যায়, জীবকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় বললে যে দোষের আশঙ্কা করা হয়েছে, তা অমূলক; কারণ অবিদ্যা ও জীবভাব পূর্ব ও পরভাবী দুটি বস্তু নয়, এরা একই বস্তুর দুটি দিক যেমন একটি মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ। জীবভাবেরই অপর নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পক্ষান্তরে ব্রহ্মকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় বললেও দোষ হয় না। ব্রহ্মে আশ্রিত অবিদ্যা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করবার মায়াশক্তি, তার প্রভাবে জীবের ব্রহ্মে জগদ্‌বুদ্ধি হয়। কিন্তু এতে ব্রহ্মে কোন দোষ স্পর্শ হয় না, যেমন যাদুকরের যাদুশক্তি দ্বারা যাদুকর প্রতারিত হয় না, কেবল অজ্ঞ দর্শকই প্রতারিত হয়।

অবিদ্যাবৃত ব্রহ্মের স্বপ্রকাশানুপপত্তি দোষের খণ্ডন

আচার্য শঙ্করের মতে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত বা তিরোহিত হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশস্বভাব; তাঁর প্রকাশের তিরোধান হলে তাঁর স্বরূপেরই নাশ হয় এবং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। বিরোধীগণের এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায়, অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয়, এই কথার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয়, যেমন মেঘ দ্বারা সূর্য আবৃত হলে আমরা একে দেখতে পাই না। কিন্তু যেমন মেঘ সূর্যের প্রকাশ-স্বভাবের বিনাশ করতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপকে নাশ করতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি সূর্য দেখতে পায় না বলে সূর্যের প্রকাশরূপ স্বভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।[৯]

ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব এবং একমাত্র ব্রহ্মের সত্যত্ব পর্যালোচনা

বিকারমাত্রই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কল্পিত। যা কল্পিত তা মিথ্যা। একের কল্পিত নানারূপ সত্য হবে কিরূপে ? একই চন্দ্রে কল্পিত দ্বিচন্দ্র দর্শন সত্য হয় কি ? এরূপ এক অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে অবস্থিত থাকে বলে বিভিন্ন কার্যবর্গ সত্য বলে ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কার্যবর্গ সত্য নয়, মিথ্যা। এখানে লক্ষ্য করবার এই যে, অদ্বৈতবেদান্তের মতে জগৎ মিথ্যা হলেও শুক্তি রজতের ন্যায় প্রাতিভাসিক নয়, জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। 'ব্যাবহারিক সত্তা' বলতে যাবৎ ব্যবহারকাল স্থায়ী সত্তা। শঙ্করাচার্য তদীয় ভাষ্যে স্পষ্ট করেই জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করেছেন এবং প্রাতিভাসিক বস্তু হতে জাগতির বস্তুর আপেক্ষিক অধিক সত্যতাও স্বীকার করেছেন। শুক্তি রজতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের তাৎপর্য এই যে, অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের স্বরূপজ্ঞান উদিত হলে অধ্যস্ত বা আরোপিত বস্তুর যে জ্ঞান তিরোহিত হয়, ঐ জ্ঞান ও ঐ জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। মিথ্যাত্বের এই মূল নীতি প্রাতিভাসিক শুক্তি রজত এবং ব্যাবহারিক বস্তু জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই তুল্যরূপে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জগতের মিথ্যাত্বসাধনে শুক্তি - রজতের দৃষ্টান্ত অসংগত নয়। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"[১০] এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"[১১] এই ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এখানে মিথ্যাত্ব শব্দের তুচ্ছসত্তাকত্ব অর্থ নয়, মিথ্যা শব্দের অর্থ সৎ-অসৎ-অনির্বনীয়।[১২]

শঙ্করের মত

জগৎ যে শাঙ্কর বেদান্তের মতে কেবল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মানস কল্পনাই নয়, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চেরও একটা আপেক্ষিক বাস্তবতা আছে, এটা দেখা গেল। এই জগতের মূলে ব্রহ্ম বিদ্যমান। ব্রহ্মই জাগতিক বস্তু কল্পনার মূল। ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই জগৎসত্তা অনুভূত হয় । মিথ্যা জগৎ ও সত্য বলে মনে হয়। জগৎ ব্রহ্ম হতেই জাত, ব্রহ্মেতেই অবস্থিত এবং পরিণামেও ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে। যেমন ঘটাদি মৃত্তিকা হতে জাত, মৃত্তিকাতেই স্থিত এবং মৃত্তিকাতেই লীন। মৃত্তিকারই যেমন ত্রৈকালিক সত্তা, সুতরাং

উপনিষদে প্রকৃতিভূত মৃত্তিকাকেই সত্য বলা হয়েছে এবং বিকৃতিভূত ঘটাদি মিথ্যা। তেমনই জগতের প্রকৃতি ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু বিকৃতিভূত জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিদান। তাই জগৎকর্তৃত্বই ব্রহ্মের লক্ষণ রূপে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[১৩] সূত্রে এবং ভাষ্যে উক্ত হয়েছে । অদ্বৈতবেদান্তীগণের মতে জগৎকর্তৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নয়, তটস্থ লক্ষণ বা উপলক্ষণ মাত্র। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'[১৪] এটাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। জগৎ অবিশুদ্ধ, ব্রহ্ম বিশুদ্ধ; জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য; জগৎ সধর্মক, ব্রহ্ম নির্ধর্মক । অশুদ্ধ, মিথ্যা, সধর্মক জগৎ ও তার উৎপত্তি প্রভৃতির সঙ্গে সত্য, শান্ত, বিশুদ্ধ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোনরূপ যথার্থ যোগ থাকতে পারে না। সুতরাং জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের নিদানত্বকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণও বলা যায় না। এটিকে লক্ষণ বা পরিচায়ক মাত্রই বলতে হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুতরাং ব্রহ্মই সব। জগৎ ব্রহ্মের মায়িক অভিব্যক্তি।[১৫] শাস্ত্রে আছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শ্রুতেঃ'।[১৬]

সর্বজ্ঞাত্ম মুনির মত

সর্বজ্ঞাত্ম মুনিও জগৎ যে মিথ্যা তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনিও বলেছেন জাগতিক বস্তুগুলির ব্যাবহারিক জীবনে সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। চক্ষুরাদি প্রমাণের সাহায্যে লোকে বিষয় প্রত্যক্ষ করে থাকে। প্রমাণের সাহায্যে যে বস্তু নিশ্চিতরূপে জানা যায়, একে একেবারে অসত্য বলা যায় কি রূপে ? বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এরূপ ক্ষণিক বস্তুর প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ করা চলে না। কারণ, যে দেখে সেই দ্রষ্টাও ক্ষণিক, দৃশ্যও ক্ষণিক, দর্শনও ক্ষণিক। সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তবে দ্রষ্টার বিষয় দর্শন সম্ভব হতে পারে কি ? এই মতে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অদ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি অবিদ্যাকল্পিত হলেও প্রমাণের সাহায্যে জড় বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব নয়। স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম অপ্রমেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। লৌকিক প্রমাণ সকল অপ্রমেয় ব্রহ্মে প্রযোজ্য নয়। কেবল 'তত্ত্বমসি'[১৭] প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ বিচারের ফলে ত্বম্ - শব্দবাচ্য জীবের তৎশব্দবাচ্য নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ সাক্ষাৎকার উদিত হয়। ব্রহ্মই মায়ার এবং মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চের সাক্ষী আশ্রয় এবং ভাসক। এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশে বিভাসিত। অধিকারী কূটস্থ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তুলনায় ব্যাবহারিক জগৎ প্রপঞ্চ প্রমাণগম্য হলেও অসত্য। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা প্রমাজ্ঞান হলেও তার সত্যতা অদ্বৈতবেদান্তের মতে গৌণ বা ব্যাবহারিক, জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের সত্যতা পারমার্থিক। সাংসারিক আনন্দ পরমানন্দের আভাস মাত্র, ব্রহ্মানন্দই বস্তুতঃ আনন্দের পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণ আনন্দ। ''ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি ।''[১৮] আকাশাদির নিত্যতা ব্যাবহারিক, তত্ত্বত পরব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ । যা সত্য তাই জ্ঞান;

যা জ্ঞান তাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন হলে আনন্দ দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয়ে যায়। পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে দৃশ্য আনন্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানই আনন্দ, আত্মবোধই আনন্দ, ব্রহ্ম আনন্দের সমুদ্র।[১৯]

স্বামীজিকর্তৃক শঙ্করমতের প্রসার

আচার্য শঙ্কর এইভাবে অদ্বৈত বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তের প্রভাব ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সর্বধর্ম সমন্বয়কার শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যে এই অদ্বৈতবেদান্তের বাণী প্রচার করেছিলেন।[২০]

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ব্রাহ্মসমাজ অদ্বৈতবেদান্তকে বর্জন করেছিলেন এবং হিন্দুসমাজও নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু স্বামীজির অদ্বৈতবেদান্তের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি গৌরবজনকভাবে বাঙালীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন যদিও প্রথমে বেদান্ত তত্ত্বকে ভক্তি সাধনের মূলতত্ত্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি পরে অদ্বৈত-তত্ত্বকে সারতত্ত্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা স্বামীজির বেদান্ত প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ সেপ্টেম্বরের এক প্রার্থনায় কেশব সেন সমর্থিত এই অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হয়েছে 'বুদ্ধির অতীত দুজ্ঞেয় পদার্থ তুমি, একথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেউই জানে না — কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছু বুঝতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবেন আমাতে ? আমি যাব হরির বাড়িতে, না হরি আসিবেন আমার বাড়িতে ? একই কথা প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম।'

কেশব সেনের পর আর একজন দার্শনিক মিসেস অ্যানী বেসান্ত 'থিয়োসফি' র পথে ক্রমে বেদান্ত চিন্তায় মগ্ন হলেন। স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করে ভক্তির পথেই তত্ত্বের উপলব্ধি করেছিলেন। এখানেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতপার্থক্য। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিরস শুকিয়ে যাবে এই ভয়ে অদ্বৈতবেদান্ত বর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ভক্তির পথেই অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্বে প্রবেশ করেছিলেন। কেশব সেনও এই পথেই বেদান্ত তত্ত্বকে অনুধাবন করেছিলেন।[২১]

বেদান্ততত্ত্ব সমীক্ষায় স্বামীজির অন্তর্দৃষ্টি

স্বামী বিবেকানন্দ 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের 'ব্রহ্ম ও জগৎ' সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন যে, তখন আবার জড়বাদের মেঘে গগন আচ্ছন্ন হল — সম্ভ্রান্ত লোক যথেচ্ছাচারী

ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য এসে বেদান্তকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি সেটাকে একটা যুক্তি সঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করলেন। উপনিষদে বিচারভার বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিবাদের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য এর জ্ঞানবাদের দিকে ঝোঁক দিলেন। আর এর দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি বিচারের সাহায্যে প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হলো। অর্থাৎ বিবেকানন্দ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে উপনিষদের সারতত্ত্ব বলে গ্রহণ করে দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে তাকে প্রয়োগ করেছিলেন।[২২]

রোগ দূর করতে হলে সর্বাগ্রে ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহের ব্যাধি নিরাকরণের জন্য প্রথমতঃ ব্যাধির কারণ নিরূপণ করলেন। তিনি অতুলনীয় মনীষা ও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বুঝলেন যে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে না পারলে মুমূর্ষু জাতির বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। আধ্যাত্মিক দুর্বলতাই জাতীয় জীবনে সকল অবনতির কারণ। সুতরাং ক্লীবতা ও জড়তাকে পরিহার করে জাতি যদি নতুন বলে বলীয়ান না হয় তা হলে জাতির পতন অনিবার্য। তাই তিনি আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হবার নবমন্ত্র শুনিয়ে জাতির জীবনে অমৃতরসের সিঞ্চন করেছিলেন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'[২৩] অদ্বৈতবেদান্তের এই মন্ত্র ভারতীয়গণের পরম সঞ্জীবনী শক্তি। স্বামীজি বুঝেছিলেন, বেদান্ত জ্ঞানই স্থিতির মূল ভিত্তি। অদ্বৈতবেদান্ত জ্ঞানের শত সূর্য-সম প্রোজ্জ্বল আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বই উদ্ভাসিত হয়ে নতুন পথে জীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ করবে। এটাই ছিল বীর সন্ন্যাসীর স্থির বিশ্বাস।[২২]

বেদান্তের অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নই আমরা নিত্য মুক্ত। শুধু তাই নয়, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা কিংবা ভাবাই অসংগত। কেননা এটা আমাদের একটি ভ্রম; এটি নিজেকে নিজে সম্মোহিত করা মাত্র। তাই স্বামীজি বলেছেন — যখনই তুমি বলো আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটা শিকল জড়াচ্ছ মাত্র। তিনি আরো বলেছেন, দুর্বলতাই সংসারের সমুদায় দুঃখ ভোগের একমাত্র কারণ, আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখ ভোগ করি। আমরা দুর্বল বলেই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করে থাকি। দুর্বল বলেই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদেরকে দুর্বল করবার কিছুই নেই, সেখানে মৃত্যু বা কোন রূপ দুঃখ থাকতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই দুঃখভোগ করছি। তাই ভ্রান্তি ত্যাগ করো, সব দুঃখ চলে যাবে। এই সকল কঠোর দার্শনিক বিচার ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা শাস্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক চিন্তায় উপনীত হলাম।[২৪]

স্বামীজি যেভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তের তাত্ত্বিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন তা অতুলনীয়। বেদান্তের আচার্যগণ স্থির করেছিলেন, এই শিক্ষা সর্বজনীন করা

যেতে পারে না, কারণ তাঁরা যে সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হয়েছিলেন, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না রেখে যে প্রণালীতে তাঁরা ঐ সকল সিদ্ধান্ত লাভ করেছিলেন সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখলেন — ঐ প্রণালী অতিশয় জটিল। তাঁরা ভাবতেন, প্রাত্যহিক কর্মজীবনে এগুলির শিক্ষা সম্ভবপর হতে পারে না আর এরূপ দর্শনের অবলম্বনে নৈতিক শিথিলতা দেখা দিবে।[২৬]

কিন্তু স্বামীজি বলেছেন যে, আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হবে। বরং এটা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অদ্বৈততত্ত্ব দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করবার একমাত্র ঔষুধ।[২৭] তবে এটাই যদি সত্য হয় তবে আনন্দ সহকারে বার বার সত্যানুভূতির শক্তি নিয়ে বলো, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত ছিলাম, চিরদিন মুক্ত থাকব। বেদান্ত হতেই এই মহান ভাবটি সঞ্চারিত হবে, এবং এই ভাব চিরদিন প্রাণবন্ত থাকবে। এই তত্ত্বটি সত্য। আমরা জানি যা সত্য তা সনাতন। আর এই সত্য আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সেটি কারও বিশেষ সম্পত্তি নয়। পশু, মানুষ ও দেবতা এই এক সত্যের অধিকারী।[২৮]

আমেরিকা প্রবাসে স্বামীজির অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে আরো কথা জানতে পারি আলাসিঙ্গাকে লিখিত একখানা পত্র থেকে। এতে তিনি বলেছিলেন — "এখন তোমাদের কাছে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু, সব বেদান্তের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত — এই তিনটি স্তর আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হল ধর্মের সার কথা, ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার, মত ও বিশ্বাস প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম, এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ — ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্ম, আর সেমেটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম। অদ্বৈতবাদ এর যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম। এখানে মন্তব্য এই, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে ধর্মের প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।[২৯] তবে একটা কথা বলা অবশ্য প্রয়োজন, স্বামীজি সকল মানুষের মধ্যে যে এক ধর্মের জয়গান করেছিলেন তা এই অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তা-প্রসূত সনাতন বৈদিক ধর্ম। স্বামীজি বলেছেন মানুষের মধ্যে যখন অদ্বৈত বেদান্তের সকল মহিমা প্রবেশ করবে তখন মানুষ তত্ত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে শিখবে এবং তাদের মন থেকে বিপরীত ধারণাগুলি বিদূরিত হবে।[৩০]

অতঃপর বলা যায়, সমস্ত বিশ্বে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে যে ধর্ম ও নীতি প্রচার করেছেন তার উৎস এই অদ্বৈত বেদান্ত এবং যদি পৃথিবীতে

কোন দিন সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই অদ্বৈততত্ত্বের আশ্রয়েই হবে। মানুষের ভয়ে মানুষ দায়ে পড়ে যে সাম্যনীতি মেনে নেয়, দায় শেষ হলে সে আর টিকতে পারে না। বিনাশের ভয়ে যে আন্তর্জাতির ঐক্য আমরা আজ আকাঙ্ক্ষা করছি তাও কোন দিন যথার্থ ঐক্যের সন্ধান দেবে না। ঈশ্বরের ভয়ে বা তাঁর কৃপা লাভ করার আশায় যেটুকু ঐক্য ও সাম্যের কথা মুখে বলি তাও স্থায়ী মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। যেমন অন্ধকারে অগ্রসর হওয়া যায় না, তেমনি নিজের স্বরূপ না জেনে নিজের অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। অনুরূপ ভাবে জগতের স্বরূপ না জেনে জগতের উন্নতি সাধন করা যায় না। পরমাত্মার সঙ্গে সমস্ত জীবাত্মার এবং সমস্ত জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একত্বকে না জানলে জীবলোকের কল্যাণ কল্পে এক পা অগ্রসর হতে পারা যায় না। সকল নীতিশিক্ষা, ন্যায়শিক্ষা, সকল প্রেম ও দয়া ঐ একত্বের বোধ হতেই নিঃসৃত হবে। অতঃপর স্বামীজি বলেছেন, কেবল অদ্বৈতবেদান্তের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হতে পারে। আর অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দেয়, অপরকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই হিংসা করছ। কারণ তারা সকলেই যে তুমি। তুমি জানো, সকল হাত দিয়ে তুমি কাজ করছ, সকল পা দিয়ে তুমি চলছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখ সম্ভোগ করছ, আবার তুমিই রাস্তায় ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি বিদ্বানেও তুমি। দুর্বলের মধ্যেও তুমি সবলের মধ্যে তুমি, এই তত্ত্ব অবগত হয়ে সকলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেই জন্য কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নয়। কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অদ্বৈতবেদান্তই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা; অন্যান্য মতবাদ তোমাদেরকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হব, এর কোন হেতু নির্দেশ করতে পারে না। একমাত্র অদ্বৈতদর্শন নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ।[৩১]

অদ্বৈতবেদান্তের বৈশিষ্ট্য তিনটি — প্রথমটি হলো বিশ্ব অবিমিশ্রভাবে এক, তাতে একটি মাত্র সত্তা বিদ্যমান এবং তিনি হলেন ব্রহ্ম বা আত্মা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু ও নানা বস্তু সমন্বিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয় তা ভ্রান্ত, এই জগৎ ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাকে বহুরূপে দেখি। আর তৃতীয়টি এই, ব্রহ্ম চিৎ শক্তি বিশিষ্ট।[৩২] অবশ্য অদ্বৈতবেদান্তের তিনটি মূলতত্ত্বেই স্বামীজির বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসীর গীতিতে কবিতার অংশ বিশেষ এই

"একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়,
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া"।[৩৩]

অদ্বৈতবাদ হতে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এসে পড়ে। তখন দার্শনিকের উপলব্ধিতে বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। এই সেই উপনিষদেরই উপলব্ধি — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[৩৪] — বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু আছে তা সকলই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ। ভিতরে, বাইরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে যেখানে যা কিছু দেখতে পাই, অনুভব করি তা সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল অস্তিত্বই থাকে না। 'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ নেদমমূলং ভবতি'[৩৫] — হে সৌম্য। পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ সমস্তই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ সৎবস্তুকে কেন্দ্র করে অবস্থিত, মূলে সেই অখণ্ড সত্তাই বিদ্যমান এটি অমূলক নয়, এটাই হল অদ্বৈতবেদান্তের চরম কথা।[৩৬]

অদ্বৈতবেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত

অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য এই — "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[৩৭] — অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, দৃশ্যমান এই জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নয় এবং জীব ব্রহ্ম হতে সম্পূর্ণ অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে কোনই ভেদ নেই। এই বক্তব্য বিষয় বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্ত বিশ্ব সংসারের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক পরম সত্য বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব বা স্বরূপ এক সত্য বস্তু, সেটি অখণ্ড শাশ্বত এবং প্রকাশ শীল ও আনন্দময়। ঐ সত্য বস্তুকে যদি যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা যায় তা হলে সেই সত্যবস্তুর অপেক্ষায় অন্য সমস্ত কিছুই অযথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। জীব জগতের সমস্ত কিছুই একটি বিশেষ নাম ও একটি বিলক্ষণ সাংগঠনিক আকার বা রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং ঐ নাম ও রূপ এই উভয়ের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু নিজস্ব একটি পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে অন্য বস্তু হতে নিজের পার্থক্য বজায় রাখে। আমরা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারি। যেমন কুণ্ডলাদি অলঙ্কার সমূহের মৌলিকত্ব বা যথার্থ স্বরূপ কেবলমাত্র সুবর্ণ হলেও গঠন বিন্যাস এবং ব্যাবহারিক কার্য সাধনের উপযোগী বিভিন্ন নামের সাহায্যে প্রত্যেকটি অলঙ্কারকে অপর অলঙ্কার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে বুঝি। কিন্তু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে এটা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অলঙ্কারসমূহ মূলতঃ এক সুবর্ণ স্বরূপমাত্র, সুবর্ণের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তাই সেখানে নেই। এই প্রণালী অবলম্বন করে জাগতিক পদার্থের মূল অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে, সত্তালক্ষণ পরমাত্মা সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান ফলত এক ও অভিন্ন।[৩৮]

ব্রহ্ম নিরতিশয় সৎস্বরূপ। নিরতিশয় চিৎস্বরূপ ও নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।[৩৯] যা কিছু সৎ বা অস্তিত্বশীল, আছে বলে যার অনুভব হয়, আমরা তাকেই 'বস্তু' নামে অভিহিত করি। যা অসৎ বা অলীক তা বস্তু নয়, তা কিছুই নয়, আকাশ কুসুম বললে কোন কিছুই বুঝায় না, সুতরাং এটা বস্তু নয়। আবার বস্তু মাত্রই

প্রকাশ স্বভাব। বস্তু আছে। এই কথা বলতে হলে বা তা অনুভব গোচর হলে বস্তুর প্রকাশ ব্যতীত এটা সম্ভব নয়। এটা একটা বস্তু এইভাবে বস্তু নির্দেশও বস্তুর জ্ঞানসাপেক্ষ। যে বস্তু কেউ কখনও জানে না সে বস্তু আছে — এটাও প্রমাণিত হয় না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তু আছে তাই প্রকাশ সম্ভব। পক্ষান্তরে প্রকাশ বা জ্ঞান বস্তুকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় না। বস্তুত যা স্ফুরণাত্মক অভিব্যক্তি তাই তো জ্ঞান। কোন বস্তুকে আশ্রয় না করে নিরবলম্বন জ্ঞান হতে পারে না। অশ্বডিম্বের জ্ঞান কখনও হয় না, কারণ অশ্বডিম্ব বস্তু নয়। অতএব দেখা যায় যে, যা সৎ তাই জ্ঞানস্বরূপ, আবার যা জ্ঞান তাই সৎ। অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় যিনি সৎ তিনিই চিৎ। বস্তুর আর একটি স্বরূপ আছে তা আনন্দ। প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন ভাবে আনন্দজনক হয়ে থাকে। যা একজনের কাছে দুঃখদায়ক তাও অপরের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। রূপ যৌবন সম্পন্ন নারী স্বামীর আনন্দদায়িনী, আবার সপত্নীর দুঃখদায়িনীও বটে। কিন্তু বস্তু নিজে যদি আনন্দস্বভাব না হতো অর্থাৎ বস্তুটির স্বরূপের মধ্যে যদি আনন্দ না থাকত — তা হলে সে অপরের আনন্দদায়ক হতে পারত না, তার কাছ হতে অপরে আনন্দ আহরণ করতে সক্ষম হোত না। নির্গন্ধ পুষ্পের কাছ হতে গন্ধ আহরণ করা যায় না, নীরস বস্তু হতে কেউ রস আস্বাদন করতে পারে না। সুতরাং বস্তু যেমন সৎ চিৎস্বরূপ তেমনই আনন্দস্বরূপও বটে। প্রত্যেক বস্তুর এই যে মৌলিক স্বরূপ এটাই অদ্বৈত বেদান্তের ভাষায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। অতএব যেখানে যা কিছু আছে তা সমস্তই ব্রহ্ম।[৪০]

অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে স্বামীজির মতসারূপ্য

স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তের যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তার অধিকাংশ স্থলেই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ এটা উপনিষদের "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয"[৪১] এই বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট রূপে সিদ্ধ হয়, কেননা পর্যালোচনা পূর্বক সৃষ্টি তার নিমিত্ত কারণ সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই সম্ভব। আবার 'বহু হয়ে প্রজাত হব' — এই বাক্যের দ্বারা তিনিই বহু হবেন। প্রজাত হবেন বলাতে তিনিই যে উপাদান কারণ এটাও বুঝা যায়। "প্রকৃতিঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"।[৪২] — এই ব্রহ্মসূত্রেও বলা হয়েছে, ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ (সৃষ্টিকর্তা) আবার তিনিই প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানও।

অদ্বৈতবেদান্ত প্রসঙ্গে স্বামীজি নিউইয়র্ক ভাষণে বলেছিলেন — ধর একটা মাত্র বস্তু আছে তা নানারূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাকে আত্মাই বলো আর বস্তুই বলো বা অন্য কিছুই বলো, জগতে একমাত্র তারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় বলতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম ও রূপ এই দুটি উপাধিবশতঃ 'বহু'রূপে প্রতীত হচ্ছে।

সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক, একটি তরঙ্গও সমুদ্র হতে পৃথক নয়। সমুদ্রের বিশেষ আকৃতিকেই আমরা তরঙ্গ নাম দিই। এই নাম ও রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হতে সাময়িক ভাবে পৃথক করে। ঐ নাম ও রূপ চলে গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই হয়ে যায়। সমুদ্রের ন্যায় এই সমগ্র জগৎও একটি সত্তা। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নামের জন্য জগতের এত বৈচিত্র্য। আর এই নাম ও রূপ মায়া-সঞ্জাত। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন 'ব্যক্তি' সৃষ্টি করে একজনকে আর একজন হতে পৃথক করে। কিন্তু এর তাত্ত্বিক অস্তিত্ব নেই। তাই বলে মায়া অলীক একথাও বলা যায় না। কারণ এটাই এই সকলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে এই মায়া অনির্বচনীয়। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায়, দেশ ও কালের নিমিত্ত সেই এক অনন্ত সত্তাতেই এই বিভিন্নরূপ জগৎ কল্পিত হচ্ছে। পরমার্থতঃ এই জগৎ মিথ্যা এক অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপ।[৪২]

মর্মকথা এই, পরমার্থ সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্যমান জগৎকে অস্বীকার করা যায় না, অদ্বৈতবেদান্তী আচার্য্য শঙ্করের এটাই সিদ্ধান্ত। বেদান্তিগণ জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার করেছেন, পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করেন না। উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা এও বুঝতে পারি যে, আমরা যা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি তা মূলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু মায়াচ্ছন্ন সংকীর্ণ দৃষ্টির প্রভাবে আমরা মূল ব্রহ্ম পদার্থকে বুঝি না। প্রত্যেকটি বস্তুকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করে একটি বিশেষ নাম ও রূপাত্মক বস্তুরূপেই তাকে অনুভব করি মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষুদ্রতার গণ্ডীই আমাদেরকে অপরের নিকট হতে পৃথক করে রেখেছে। এই ক্ষুদ্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে সুখ দুঃখের প্রভাবে আকুল হয়ে পড়ি। এবং একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রচেষ্টাই করে থাকি। বিশ্বব্যাপী অজর অমর শাশ্বত আত্মাকে সামান্য দেহের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ মনে করে নিজেকে সুখী করবার অসামান্য প্রয়াসে আমরা চতুর্দিকে ধাবিত হই। প্রকৃতপক্ষে এই সংকীর্ণতাবোধই আমাদেরকে দুর্বল করে, ব্যক্তিগত জীবন হতে সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্র জীবনে এই দুর্বলতাই অভিব্যক্ত হয়ে নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কাজেই ব্যক্তি জীবনে দুর্বলতা সমূলে উৎপাটিত করতে হলে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে, ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্ব জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি সত্তাকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে ফেলতে হবে। এই বিশ্বজনীনতার মূলমন্ত্রই অদ্বৈতবেদান্তের সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম।[৯৯]

স্বামীজি স্বীকার করেন যে, সব পথই শেষ পর্যন্ত মূল লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। সে লক্ষ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোন হতে দেখলে বিভিন্ন বলে বোধ হয় এবং ঐ দৃষ্টিগুলির আপেক্ষিক সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিতে অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের

চরম আদর্শ এবং বেদান্তই সর্ব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি হবার উপযুক্ত। অদ্বৈতবেদান্তের মত অবলম্বনেই প্রকৃত ধর্ম সমন্বয় সম্ভবপর। কারণ অদ্বৈতবেদান্ত মতে ব্যাবহারিক ও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কাকেও — দ্বৈতবাদাদি কোন মতকেও অস্বীকার করে না। ধর্মের মধ্যে যত মৌলিক কথা আছে মানবের স্বরূপ, বিশ্বের প্রকৃত তথ্য, সকলের পশ্চাদ্‌বর্তী মূল সত্য, সে সত্যের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্গে সম্বন্ধ জন্ম মৃত্যুর রহস্য ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে বেদান্তে নিরপেক্ষভাবে গভীর আলোচনা করা হয়েছে এবং এতে এমন কতকগুলি স্তর বিন্যাস সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে যা সকল অনুসন্ধিৎসুকেই পথ দেখাতে পারে। ধর্মান্ধতা এতে নেই। আছে শুধু বৈজ্ঞানিক সুষম সত্যান্বেষণ এবং সত্যের অকপট স্বীকৃতি; আর সেই সঙ্গে অছে সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করার মহান্ ঔদার্য ও সহানুভূতি। আরও একটা কথা এই সঙ্গে জানতে হবে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক ধর্মকেই বিজ্ঞানের যুক্তিজালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অন্যের বিরোধ না করে স্বমতকে উপন্যাস করতে হবে। দেখা গেছে এতে অনেক ব্যক্তিই অক্ষম। এই দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে তারা ভাবুকতা ও গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত ধর্ম বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। স্বামীজি এইরূপ অন্ধপরম্পরা মেনে নিতে অপারক। কারণ, এতে ধর্ম বাঁচে না, ধার্মিকও বাঁচে না। তিনি দেখেছেন, এরই ফলে ধর্মের নামে সর্বত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার ও অন্ধ বিশ্বাস আসন পেতেছে এবং আধ্যাত্মিকতা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। স্বামীজির মতে ধর্মানুভূতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অতীত হলেও, ধর্মলাভের পথ জগতের সাধারণ ভূমিতেই প্রসারিত, আর ধার্মিক সিদ্ধান্তগুলিও অন্যপথে লব্ধ সত্যের পরিপন্থী হতে পারে না। মনস্তত্ত্ব ও সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিক চিন্তাকে বাদ দিয়ে ধর্ম শুধু গতানুগতিকতাকে অবলম্বন করে মানব জীবনে প্রকৃত সাফল্য আনতে পারে না। বুদ্ধিমত্তাই মানবের মানবতার পরিচায়ক, সেটাকে ছাড়িয়ে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় নিলে মানুষ পশুতে পরিণত হবে। ধর্ম অনুসরণের জন্য এই যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা তা আমরা পাই পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে। আর এর যুক্তিসম্মতদার্শনিক ভিত্তি অদ্বৈতবেদান্তে।[৪৫]

অদ্বৈতবেদান্তবাদী স্বামীজি জগৎ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন — "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্"[৪৬]। স্বামীজি এই সত্যটি প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন — "সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা অভিব্যাপ্ত করতে হবে, জগতে যা কিছু অশুভ (দুঃখ) আছে তার দিকে না তাকিয়ে সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর বিরাজমান এরূপ ধারণাকে বদ্ধপরিকর করতে হবে। এইভাবে সমস্ত বস্তুর ভিতরে অসীম আনন্দময় ঈশ্বরের অনুভূতি ঘটলে সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যায়, সমস্ত সংকীর্ণতা উচ্ছিন্ন হয়। হৃদয় নির্মল ও উদার হয় তখন সে মানুষকে কেবলমাত্র রক্তমাংস অস্থি

মজ্জা বিশিষ্ট দেহধারী হিসাবেই দেখে না, বরং সচ্চিদানন্দময় ভগবানের একটি মূর্তিরূপেই অনুভব করে। বিশ্ব হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের এই আদর্শমূর্তিটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল স্বামীজির মানস-নেত্রে[৪৭]। সকলের মধ্যেই তিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন — তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৪৮]

বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের ফলে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জগৎকে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে চান নি, বরং সমগ্র জগৎই যে ব্রহ্মস্বরূপ এটাই তিনি বুঝিয়ে ছিলেন এবং বিশ্বের সকল মানবেরই কল্যাণ সাধন করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ কাজ করেছেন।

স্বামীজি পরিদৃশ্যমান এই জগৎকে যদিও আকাশ কুসুমের মত অসৎ বা অলীক বলে একেবারে উড়িয়ে দেন নি। তথাপি তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলতে চেয়েছেন যে, নাম ও রূপের সংমিশ্রণাত্মক অবস্থা দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তাকে পাবার জন্য লালায়িত হই — জীব জগতের সেই রূপটিই বস্তুর একমাত্র রূপ নয় — এটা অপারমার্থিক। জাগতিক বস্তুর এরূপ যথার্থ পরিচয় দৃঢ়ভাবে জানতে পারলে বস্তুর অর্থাৎ নাম ও রূপের সংমিশ্রণাত্মক অবস্থার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, পরম বৈরাগ্য উদিত হয়ে দেহ মনের শান্তি উপস্থিত হয়, এটাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, উক্ত পরম বৈরাগ্যের অর্থ সব কিছুকে অসৎ বলে জানা নয়, নিজেকে তিলে তিলে শুষ্ক করে আত্মহত্যা করা নয়। স্বামীজি বেদান্তের এই অর্থই পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে — "বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই সমুদয় বস্তুতে ভগবানকে দর্শন করা। তাদের যে রূপ আপাতঃ প্রতীয়মান হচ্ছে, তা না দেখে তাদের প্রকৃত স্বরূপকে জ্ঞাত হওয়া।" জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে বেদান্তের এই পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার ফলে স্বামীজি বিশ্বভুবনে সমস্ত কিছুকেই একান্তরূপে ভালবেসেছিলেন, বিশ্বজন হিতের জন্য অক্লান্ত ভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী বেদান্ত তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এইভাবে স্বামীজির সমগ্র জীবন ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহুমুখী কর্ম-পদ্ধতির মূলে অদ্বৈতবেদান্তের পরিপূর্ণ অনুভূতি বিদ্যমান, যার ফলে জগৎকে ত্যাগ করে নয়, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত যাবতীয় জগৎকে গ্রহণ করে পৃথিবীর বিচিত্র রূপ রসের মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেই তিনি অসীম বলে বলীয়ান হয়েছিলেন।[৪৯]

বক্তব্যের উপসংহার

অদ্বৈতবেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ অমৃতের স্বাদ লাভে অধিকারী হওয়ার জন্য প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য হিসাবে সমগ্র দেশবাসীকে দেহ মন সংগঠন করবার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। পেটের খিদে দূর করবার জন্য যথোপযুক্ত অন্নের সংস্থান করতে উপদেশ দিয়েছেন। উপনিষদকেও এরূপ উপদেশ করতে দেখা যায় — ''অন্নং বহু কুর্বীত'' ।[৫০] যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাবহারিক জীব জগতের মধ্যে আমরা বাস করব, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাবহারিক জগতের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং ব্যাবহারিক জগৎকে একেবারে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না ।[৫১]

বস্তুত অদ্বৈতবেদান্ত ও ব্যাবহারিক জগৎকে স্বীকার করেই সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং স্বামীজির সমগ্র জীবনব্যাপী যে অনন্য সাধারণ কর্মানুশীলতা ও জ্ঞানচর্চার সমন্বয় দেখা যায় সেটি অদ্বৈতবেদান্তের মূর্ত ছায়া। অদ্বৈতবেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক আচার্য শঙ্করের জীবনদর্শনের অনুশীলন এই বিষয়ে উৎকৃষ্টতার উদাহরণ। জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করেও আচার্য শঙ্কর সমগ্র জীবন ব্যাপী যে মহতী কর্ম সাধনা করেছেন, তার পরিচয় সুধী সমাজে নতুন করে দেওয়া অনাবশ্যক। আচার্য শঙ্করের সঙ্গে এই অংশেও কর্মবীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্বের প্রকৃষ্ট ধারক ও বাহক হয়েও স্বামীজি সমাজ ও জাতি গঠনের যে অসামান্য প্রয়াস করেছেন তা একমাত্র বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বভুবনের সঙ্গে যিনি নিজের আত্মিক সম্পর্ক মনে প্রাণে অনুভব করেন, কেবলমাত্র তিনিই বিশ্বপ্রেমিক হতে পারেন। এবং বিশ্বপ্রেমিক না হলে বিশ্বে সার্বিক কল্যাণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সামগ্রিক রূপে বিশ্বের কল্যাণসাধন করা যায় না।[৫২] সুতরাং আত্মিক সত্তার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের অন্তর্নিহিত মূল সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে না পারলে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের মূল সূত্রটি অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। এই জন্যই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করবার জন্য সুষম পথের সন্ধান দিয়েছেন। দুর্বলতা, ভীরুতা এবং কাপুরুষতাকে দূর করে এক সুস্থ সবল জাতি গঠন করবার মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন। বলা বাহুল্য, অদ্বৈত বেদান্তের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকে কর্মসাধনার জগতে বেদান্ত তত্ত্ব অনুশীলনে প্রবল চেষ্টা করতে হবে।[৫৩]

অতঃপর বলা যায়, অদ্বৈতবেদান্তের চরম লক্ষ্যকে এবং ধ্যানময় ও কর্মময় জীবনের আদর্শকে সম্মুখে রেখে ব্যাবহারিক জীবনের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারই বেদান্তের

মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দও তাই বলেছেন। নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি মহাজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের সীমারেখা তাঁর অমিতবিক্রম তেজস্বিতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। প্রতিপদে প্রতিক্ষেত্রে তিনি মহাজীবনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, সকলের জন্যই দ্বিধাহীন চিত্তে কর্মানুষ্ঠান করেছেন, নিজের জীবন দিয়ে সকলকে মহত্ত্বের প্রেরণা দিয়েছেন। এটাই ভারতীয় সাধনার পরম ও চরম লক্ষ্য, আর এটাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্মবাণী।[৫৪]

আধুনিক যুগের আলোড়নকারী পটভূমিতে স্বামীজির প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তের মহিমা আজ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। অদ্বৈতবেদান্তের জগৎ ক্রমপ্রসারিত। স্বামীজির বাস্তবমুখী বেদান্তে মানুষ, ব্রহ্ম, মূর্ত, অমূর্ত, ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও মহাদেশ ইত্যাদি সব কিছুরই আছে স্বীকৃতি, সমন্বয় ও সংহতি। এই দর্শন বিভেদ সৃষ্টির দর্শন নয়। হিংসা ও বিদ্বেষমূলক, অবনয়ন, অবদমন ও উৎপীড়নের দর্শন নয়। এটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির দর্শন নয়। মানুষের অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সমদর্শিতার দর্শন, সর্ববিধ বন্ধন মুক্তি আহ্বানের দর্শন।[৫৫]

সবশেষে বলা যায়, উপনিষদ্ প্রবর্তিত ভারতের অক্ষয় সম্পদ সদৃশ অদ্বৈতবেদান্ত জ্ঞানই ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। জীবনের সর্বস্তরে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের মূল উৎসস্বরূপ অদ্বৈতবেদান্ত তত্ত্বের প্রসারশীল বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জাতীয় সমুন্নতি ও হিতকর প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হতে পারে। ভোগপ্রবণ বিলাসচঞ্চল জাতির বহুমুখী প্রবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্বসমূহের সরল ও সবল বিশ্লেষণ এই জন্যই সকলেরই একান্ত আবশ্যক । এই পরম সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে সর্বত্র তার নিজস্ব সাবলীল ভঙ্গীতে অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশকে প্রচার করেছেন। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে অদ্বৈতবেদান্তের গূঢ় মর্মবাণী জনসাধারণের গ্রাহ্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। অতঃপর বলা যায়, যদি ঈশ্বরের কৃপায় পৃথিবীতে এই অদ্বৈতবেদান্ত আবির্ভূত না হতো, তা হলে আমাদের এই জগৎ সংসার আমাদের সমস্ত ধর্ম কর্ম, সমস্ত জ্ঞান ও ভক্তি বড়ই ক্ষুদ্র ও হীন বলে মনে হতো। অদ্বৈতবেদান্ত আমাদের অমৃতময় অন্তর্লোকের সন্ধান দিয়ে অনন্ত আশায় উদ্দীপিত করতে পারে। অতএব অদ্বৈত বেদান্তই সমগ্র মানব জাতিকে কুসংস্কার-মুক্ত করতে পারে। তাই বলা যায়, সর্বক্ষেত্রেই অদ্বৈত বেদান্তের অনবদ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১। বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ৭২৩

২। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/১
৩। ঐ ৩/১৪/১
৪। ভারতের সাধক থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৯
৫। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪/১০
৬। ব্রহ্মসূত্র, ২/১/১৪
৭। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৭৮
৮। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃঃ- ১৯৭
৯। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃঃ- ১৯৭-১৯৮
১০। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ — ৬.১.৪ - ৬,
১১। ব্রহ্মসূত্র - ২.১.১৪,
১২। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃঃ- ১৯৮,
১৩। ব্রহ্মসূত্র - ১.১.২
১৪। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - ২.১
১৫। বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ, পৃঃ- ১৭৫-১৭৬
১৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৩/১৪/১
১৭। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৬/১০/১
১৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৭/২৩/১
১৯। বিশ্বকোষ, পৃঃ- ৭২৩
২০। আচার্য শঙ্কর, পূর্বাভাষ (১)
২১। আচার্য কেশবচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ- ২০১
২২। উদ্বোধন ১০০ তম, পৃঃ- ৪৮৩
২৩। কঠোপনিষদ্ - ১.৩.১৪
২৪। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৭৮
২৫। The complete works. Vol II. P 197-198
২৬। Ibid – 199
২৭। Ibid – 199
২৮। Ibid – 200
২৯। স্বামীজির বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ। পৃঃ - ১৫৭
৩০। ঐ, পৃঃ- ১৮৭
৩১। স্বামীজির বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ- ৩৩১-৩৩৩
৩২। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৫০
৩৩। The Song of the Sannayasin. ষষ্ঠ পংক্তি
৩৪। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩/১৪/১
৩৫। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/৮/৪-৫
৩৬। বিবেকানন্দ শত দীপায়ন, পৃঃ- ২০৮
৩৭। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা।
৩৮। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ । পৃঃ ১৭৮-১৭৯
৩৯। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২.১.২

৪০। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন, পৃঃ ২০৮-২০৯
৪১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/৩
৪২। ব্রহ্মসূত্র ১/৪/২৩
৪৩। The complete works. Vol. II. P. 275–276
৪৪। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৮০
৪৫। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৩০-১৩১
৪৬। ঈশোপনিষদ্, ১/১
৪৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - ২.১ ব্রহ্মসূত্র ভূমিকা পৃঃ ২৩
৪৮। বীরবাণী গ্রন্থের 'সখার প্রতি' নামক কবিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি।
৪৯। জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ- ৩৭১
৫০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - ৩/৯/১
৫১। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৬৫
৫২। উদ্বোধন ১০০ তম, পৃঃ- ১৭৯-৮০
৫৩। উদ্বোধন ১০০ তম, পৃঃ- ১৮৩
৫৪। উদ্বোধন ৬২ তম, পৃঃ- ২৪৪
৫৫। মহিমা তব উদ্ভাসিত, পৃঃ- ২১৮

অদ্বৈতবাদ ও জগন্মিথ্যাত্ববাদ

আজকাল অনেক বিদ্বজ্জনই আচার্য শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা' কথাটিকে বুঝতে না পেরে ভগবান্ শঙ্করের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শঙ্করাচার্য্য যে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন তার প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। অদ্বৈতবাদ একটা নতুন মত নয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে এটি প্রচলিত। ব্যাস, বশিষ্ঠ, শুকদেব, অষ্টাবক্র প্রভৃতি জ্ঞানীরা অদ্বৈতমতের সমর্থক।

ব্রহ্ম হতেই জগতের উৎপত্তি

ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[১] আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, কীট, কীটানু পতঙ্গে, জীবজন্তু, স্থাবর অস্থাবর সম্পদে ও মনুষ্যাদিতে সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজমান। একটি বীজ থেকে যেমন একটি মহীরুহ উৎপন্ন হয় তেমনি ব্রহ্ম হতেই জগতের উৎপত্তি।[২] গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন — "বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্"[৩] অর্থাৎ হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের মূল চিরপুরাতন বীজ বলে অবগত হও ।

ভগবান জগতের বীজ - এরূপ ভগবদ্বাক্য থেকে বুঝতে হবে যে, তাঁর থেকে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাতেই বারবার জগতের তিরোভাব হচ্ছে। এরই নাম সৃষ্টি ও প্রলয়। সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হয় এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হতে অব্যক্ত হয়। সেই অব্যক্ত আবার ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয় আর সংহারকালে ব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং ব্রহ্মই ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত কিছুরই উপাদান।[৪] গীতায় ভগবান্ বলেছেন — "প্রভবপ্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।"[৫] অর্থাৎ তিনিই জগতের অক্ষয় বীজ, তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তাতে স্থিতি এবং তাতেই লয় । তিনিই জগতের নিধান অর্থাৎ আধার ও আশ্রয়।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যায়, যেমন একপাত্র জলে লবণ ফেললে সমস্ত জলটি লবণাক্ত হয় তেমন এক ব্রহ্ম জগৎকে সৃষ্টি করে জগতের মধ্যে অনুগত হয়েছেন "তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ"।[৬] তাই জগৎটাকে ব্রহ্মময় বলা হয় - "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[৭]। ব্রহ্ম ছাড়া বস্তুতঃ কিছু মাত্র নেই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"।[৮] আবার এই জগৎ হল মায়াময় অনিত্য অতএব মিথ্যা। ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য। "মায়াময়মিদং দ্বৈতম্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ"[৯]। যন্ত্রারূঢ় হয়ে সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়। ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রসারিত হয়ে বিভিন্ন নামধেয় পরিগ্রহ করেন। যেমন — নামব্রহ্ম, বানব্রহ্ম, মনোব্রহ্ম, সংকল্পব্রহ্ম, চিত্তব্রহ্ম, ধ্যানব্রহ্ম, বিজ্ঞানব্রহ্ম, বলব্রহ্ম, অন্নব্রহ্ম, তেজোব্রহ্ম, আকাশব্রহ্ম, স্মৃতিব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম ইত্যাদি নানা নাম ও রূপে ব্রহ্ম ব্যাকৃত হন।[১০] ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম হতেই সৃষ্ট। যেমন অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা

শক্তি এক এবং অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের মায়া অভিন্ন। এই জগৎটা ব্রহ্মের মায়া শক্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শক্তিকে কখনো শক্তিমান্ ব্যক্তি থেকে পৃথক করা যায় না। সেখানে ব্যক্তিই সত্য, শক্তি নামমাত্র। তেমনি ব্রহ্মই সত্য জগৎ নামমাত্র। অগ্নি না থাকলে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকে না। ব্রহ্মই সর্বানুগত। কাজেই সমগ্র জগৎটা ব্রহ্ম থেকে অবিচ্ছিন্ন। ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে জগতের পৃথক অস্তিত্ব ভাবনা মিথ্যা। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমি ব্রহ্মই' ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত নই, তখন তার আর দ্বৈতভাবনা থাকে না। কাজেই অদ্বৈত বৈদান্তিকগণের মত অনুযায়ী জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।[১১]

অদ্বৈতব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য

অদ্বৈত তত্ত্ব বিষয়ে একমাত্র উপনিষদ প্রমাণ। এটিকে প্রতিপাদন করার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদকে সর্ব প্রথমে ধরা যাক। এই উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম''[১২] অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্ত সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ। এস্থলে ব্রহ্মকে অনন্ত সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ বলায় অদ্বৈততত্ত্বই বলা হল। অন্ত শব্দের অর্থ সীমা। সীমা থাকলে অনন্ত হতে পারে না। জ্ঞান সম্বন্ধে ও একই কথা। বিষয় নানা না থাকলে জ্ঞানভেদ হয় না, আর বিষয় নানা হলে জ্ঞান আর অনন্ত হয় না। জ্ঞানের যেটা পরা কাষ্ঠা, সেটা অসীম হওয়ায় নিত্য আর নিত্য হওয়ায় সত্য। অদ্বৈত বস্তুর অস্তিত্বে শ্রুতিসিদ্ধ এই যুক্তিকে প্রথম প্রমাণ রূপে মহর্ষি বেদব্যাস গ্রহণ করেছেন।[১৩]

মহর্ষি বেদব্যাস অদ্বৈতব্রহ্মই জগৎ কারণ তা প্রমাণ করার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের আর একটি কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেটি হল ভৃগুবল্লীর প্রথম বাক্যটি ''যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ইতি।''[১৪] অর্থাৎ যা হতে এই সকল ভূত জন্মেছে, যার অনুগ্রহে জাত বস্তু সকল জীবিত রয়েছে ও প্রয়াত হয়ে যাতে প্রবেশ করে সেটাই জিজ্ঞাস্য আর সেটাই ব্রহ্ম। এস্থলে ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'' বাক্যে অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা বলে ''যতো বা ইমানি'' বাক্যে তাকেই জগৎ কারণ বলায় এবং 'আনন্দাদ্ধেব ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে তাকেই আনন্দস্বরূপ বলায়, জগৎ কারণ ব্রহ্মকেই অদ্বৈততত্ত্ব বলা হল। ঘটরুচকাদির প্রতি মৃত্তিকা যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমন ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তিতে প্রকৃতি কারণ, আবার মায়ার প্রতি মায়াবী যেমন স্থিতির কারণ, তেমনি মায়াময় জগতের স্থিতিতে ব্রহ্ম উপাদান কারণ আবার চতুর্বিধ ভূত গ্রামের প্রতি অবনী যেমন সংহারের কারণ, তেমনি জগতের প্রলয়কালে ব্রহ্মই সকলের আশ্রয়রূপে উপাদান কারণ। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য আর সমস্ত বিকারজাত কার্য জগৎ মিথ্যা। যেটা কার্যের প্রকৃতি কারণ সেটাই সত্য। যেমন ঘটাদি মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য। শ্রুতির সমর্থন এই ''বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।''[১৫] উক্ত শ্রুতিবাক্যে কার্য ও কারণের অনন্যত্বকে সূচনা করা হয়েছে। ''তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ''[১৬] এই বাক্যে সেটাকেই প্রতিপাদন করে ব্রহ্মসূত্রকার

বেদব্যাস ও ভাষ্যকার শঙ্কর ব্রহ্মের সত্যত্বও জগতের মিথ্যাত্বকে নিরূপণ করেছেন ।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বাক্যের তাৎপর্য

অতঃপর এখন আমরা এই অদ্বৈতবস্তু প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে জগন্মিথ্যা তত্ত্বটিকে যথাশক্তি আলোচনা করব। "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[১৭] — এই বাক্যের অন্তর্গত "ব্রহ্ম সত্য" এই সন্দর্ভের দ্বারা ব্রহ্মকে নিত্য নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়েছে । আর এর দ্বারাই "জগৎ মিথ্যা" "জীব ব্রহ্মভিন্ন নয়" — এটাকেও বোঝানো হয়েছে। "জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়" — এই অংশটি ব্রহ্ম সত্য বাক্যেরই বিবৃতি মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য, জগৎ পদের অর্থ কি ? জগৎ পদে সৎ ব্রহ্ম বা জীব এবং অসদ্ বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি ভিন্ন যাবতীয় বস্তুকে বুঝায়।[১৮] পঞ্চমহাভূত, পঞ্চভৌতিক পদার্থ, দেহ, মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অজ্ঞান বা প্রকৃতি যত কিছু সকলই জগৎ পদবাচ্য। অন্য কথায় যা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাই জগৎ। জগৎ শব্দের অর্থ গমনশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। তাই জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। আর যেটা অপরিবর্তনশীল নিত্য সদ্‌বস্তু সেটা কখনই জ্ঞানের বিষয় হয় না। জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্য। তাই সেটি সৎ নয়। আবার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হওয়ায় অসৎ ও নয়। কেননা যেটা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়, অর্থাৎ যেটা অন্তঃকরণ- বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অবিষয় সেটাই অসৎ, যেমন আকাশকুসুম প্রভৃতি। সুতরাং জগৎ সৎ নয়, অসৎও নয়, সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। এরূপ অনির্বচনীয় অর্থে আচার্য শঙ্কর ব্যাবহারিক এই জগৎকে 'মিথ্যা' বলেছেন। 'তুচ্ছসত্তাক অসৎ' অর্থে নয়।

'জগৎ মিথ্যা' এই বাক্যের অন্তর্গত মিথ্যা শব্দের অর্থ যা স্বরূপত নেই অথচ পররূপত জ্ঞানগোচর হয়, তাই মিথ্যা। অর্থাৎ যা সদসদ্ ভিন্ন বা অনির্বচনীয়, তাই মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্পত্ব নেই তবুও কখনো কখনো সেখানে সর্পত্বপ্রকারক বুদ্ধি হয়। এই বুদ্ধিকেই মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়। আর এই বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বিষয়কে মিথ্যা বলা হয়। সুতরাং জগৎ আছে বলে দেখা যায় এরূপ নয়। কিন্তু দেখা যায় বলে আছে এরূপ বোধ হয়। অতএব জগৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় ও স্বপ্নের ন্যায় ভ্রান্ত।[১৯]

আচার্য শঙ্করের মতে জগৎ যে মিথ্যা তার ব্যাখ্যা

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মাদ্বৈতবাদকে প্রতিপাদন করতে গিয়ে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন। আচার্য শঙ্কর কেন জগৎকে মিথ্যা বলেছেন আমরা তা এখানে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করতে চাই। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদের সাহায্যে জগৎ মিথ্যাত্বকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আচার্য শঙ্কর যে তিন প্রকার সত্তার কথা বলেছেন তা হলো প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক। স্বপ্ন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে বস্তুর জ্ঞান হয় তার প্রাতিভাসিক সত্তা। অনুরূপভাবে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের বেলায় সর্প সত্য প্রতিভাত হয়, তাই এই সর্পের প্রাতিভাসিক সত্তা। কিন্তু জাগ্রদ্‌বস্তুর দ্বারা যখন স্বপ্ন

বাধিত হয় তখন স্বপ্ন জ্ঞানের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হলে সর্পভ্রম আর থাকে না। শঙ্করের মতে প্রাতিভাসিক সত্তা বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান ব্যাবহারিক সত্তা বিশিষ্ট বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। নিছক অলীক বা একান্ত অসৎ বস্তু থেকে প্রাতিভাসিক বস্তুকে পৃথক করে দেখতে হবে। বন্ধ্যা নারীর পুত্রের বা শশশৃঙ্গের কোন সত্তাই নেই। কেননা এগুলি কখনোও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। এবং অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হবার প্রশ্নই ওঠে না। এরূপ রজ্জুসর্পভ্রমস্থলে সর্পের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাই শঙ্করের মতে এর জ্ঞানকালীন প্রাতিভাসিক সত্তা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু এগুলি একেবারেই অলীক নয়। কেন না জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হলেও রজ্জুসর্প জ্ঞানের বিষয় হয়। জাগ্রদবস্থায় যে সব জাগতিক বস্তুর জ্ঞান হয় তার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার্য। ব্যাবহারিক সত্য জগৎ শশশৃঙ্গের মতো মিথ্যা নয়। প্রমাণ প্রমেয় প্রমিতির উপর আমাদের লৌকিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগৎকে সত্য বলতে হয়।[২০] কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে এই ব্যাবহারিক জগতের সত্তাও বাধিত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞান ও জগৎ জ্ঞানের তিরোধান একই সময়ে হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর কোন ভেদ থাকে না, কেন না শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্যই ব্রহ্ম। এই নির্বিশেষ চৈতন্য বা ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না। জগতের পারমার্থিক সত্তা নেই। জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাই জগৎ মায়িক ।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, ন্যায়বৈশেষিক প্রমুখ দার্শনিকগণ দৃশ্যত্ব, প্রতীয়মানত্ব বা জ্ঞানবিষয়ত্বকে সত্যত্বের নিয়ামক হেতুরূপে বিবেচনা করেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর একথা মানেন না। কেননা স্বপ্ন ও রজ্জুসর্পাদিস্থলে দৃশ্যত্ব থাকলেও সত্যত্ব নেই। শঙ্কর ত্রিকালাবাধ্যত্বকেই সত্যের প্রকৃত লক্ষণ বলেছেন। সেটি একমাত্র ব্রহ্মেই আছে, তাই ব্রহ্মই সৎ। কিন্তু জগতে নেই। তাই জগৎ সৎ নয়, মিথ্যা। এই কারণে বলা যায় — জগৎ মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, অনিত্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, স্বপ্নবৎ, রজ্জুসর্পবৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যথার্থ বস্তু দর্শন হয় না বলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাকে স্বপ্ন বলেছেন — "এয়ঃ স্বপ্নাঃ"।[২১] অবস্থাত্রয়ের উর্দ্ধে বিদ্যমান তুরীয় ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ বলেছেন।[২২]

অতএব অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের মতে জগৎটা হচ্ছে স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা। জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা বস্তু বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু সৎ-এর বিনাশ হতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ জগৎ আকাশ কুসুমাদির মত অসৎ হতে পারে না। জগৎ সৎরূপেই অনুভূত হয়। শঙ্করের মতে যা সৎ তা কখনও অসৎ এবং যা অসৎ তা কখনও সৎ হতে পারে না। আর কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অসৎ হওয়া সম্ভব নয়। তাই শঙ্করের মতে পরমার্থত এই জগতের কোন অসত্তা নেই ও সত্যতা নেই। এই জগৎ স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মত অনির্বচনীয় মিথ্যা অবভাস মাত্র । ঈশ্বর মায়া শক্তির প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যা বশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে

ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই ব্রহ্ম যে একমাত্র সত্য, ব্রহ্মেরই যে যথার্থ সত্তা আছে এবং জগৎ কারণ প্রকৃতি ও জগতের যে কোন যথার্থ সত্তা নেই, এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে ।[২৩]

এইভাবে উপনিষদের মধ্যে যে অদ্বৈতবাদের বীজ নিহিত আছে তার উপর ভিত্তি করেই আচার্য শঙ্কর সুসংহত অদ্বৈত মতের প্রবর্তন করেন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অঘটমানঘটনপটীয়সী মায়ার অনির্বচনীয় সৎ ও অসৎ ভিন্ন রূপের কথা বলা হয়ে থাকে। জগৎ মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম হলেও ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। অতএব জগৎকে মায়াময় বলা হয়। মায়া বা অবিদ্যাই জীবের বন্ধন। অবিদ্যা বা মায়ারূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হয়ে তিনি হন মায়াবী। তাই বলা হয়েছে ''মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্''[২৪] ।

বক্তব্যের অভিপ্রায় এই, ব্রহ্মদর্শীর নিকট জীব ও জগৎ কিছুই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকে। ব্রহ্মই সত্য, তা ছাড়া সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্মে কোন দ্বৈতবোধ নেই, দ্বৈতবোধের যে উদয় হয় তা বিভ্রমমাত্র, এরূপ বিভ্রমদর্শী পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণপ্রবাহে পতিত হয়ে দুঃখভোগ করে। তাই ঋষির কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে — ''মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য হই নানেব পশ্যতি।[২৫] এই নানাত্ববোধ মিথ্যা। তাই এখানে শ্রুতি 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যখন সমস্ত জীবজগৎই ব্রহ্মময় হয়ে যাবে তখন কে কাকে দেখবে ? কে কাকে জানবে ? ''যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ।[২৬] এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হলে আর দ্বৈতভাব থাকবে না সমূলে বিলুপ্ত হবে। যেটা মিথ্যা সেটাই বিলুপ্ত হয়, আত্মবোধ মিথ্যা নহে সত্য ; এই জন্য তা কখনও বিলুপ্ত হয় না, জীব ও জগদ্ মিথ্যা বলেই তা বিলুপ্ত হয়।[২৭]

জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ নির্দেশ

ব্রহ্ম (ঈশ্বর) নিজেকে নানা উপাধিযুক্ত করে সংসারী সাজিয়ে সুখদুঃখ শোকমোহের অভিনয় করেন। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিচরণ করেন ; শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করেন। কিন্তু শরীরাভিমানী জীব অশরীরী পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হবেন কিরূপে ? জীবকে অশরীরী সর্বব্যাপী পরম আত্মার ছায়া বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে তাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদারণ্যক বলেন যে, জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা পরীক্ষা করলে জীব-পুরুষ যে সকল অবস্থার অতীত সর্ববিধ বন্ধনের অতীত, শরীর ধারণ করেও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী অসঙ্গ ও নির্লেপ ''অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ''[২৮] তা বুঝা যায়। এইরূপ হলে আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদি বন্ধন সত্য হতে পারে কি ? জাগরিত অবস্থায় জীব শরীর ও মনের সাহায্যে স্থূল বিষয় অনুভব করে, সুতরাং বিষয় অনুভবিতা জীবকে তখন শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে বোধ হয়।[২৯] স্বপ্নাবস্থায় জীব শরীর ও ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয়

করে শরীরের বাইরে স্বীয় জ্ঞান শক্তিরূপে বিচরণ করে এবং স্বীয় বাসনার অনুরূপ বিষয় সমূহ ভোগ করে থাকে। এটা হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, জীবাত্মার শরীরবন্ধন যথার্থ নয়। স্বপ্নাবস্থায় মন ক্রিয়াশীল থাকে, আত্মায় মনের বন্ধন-বিলুপ্ত হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় মনের বন্ধনও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বন্ধন-বিনির্মুক্ত জ্যোতির্ময় আত্মা তখন আনন্দময় রূপেই অবস্থান করেন, ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করেন। বিষয়বন্ধন-বিমুক্ত, শোকমোহের অতীত, সদাপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাতে সন্দেহ কি? সুষুপ্তিতে আনন্দ জীবের সাময়িক মাত্র, অজ্ঞানের বীজ তখনও ধ্বংস হয় না, সুতরাং পুনরায় সুষুপ্তি ভঙ্গে জীবকে স্বপ্নরাজ্যের পথ ধরে বিষয়রাজ্যে পৌঁছাতে হয় এবং সংসারী সাজিয়ে অনবরত জীবন নাটকের অভিনয় করতে হয়। জীবকে যে পরমাত্মার ছায়া বলা হয়েছে এর অর্থ এই যে, কায়া ব্যতীত ছায়ার যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সেরূপ পরমাত্মা ব্যতিরেকে জীবেরও কোন স্বাধীন সত্তা নেই। ছায়া কায়ারই প্রতিবিম্ব, জীবও ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব বিম্ব থেকে অভিন্ন সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন।[৩০]

উপনিষদে গীতা এবং বিশেষ করে বেদান্ত সূত্র ও শঙ্করভাষ্য কিভাবে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ যে কারও অনুভূত হচ্ছে না একথা বলা বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য নয়। বেদান্ত বলেন যে, এই স্থূল দৃশ্য জগৎ যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হচ্ছে তার পৃথক অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সমন্বিত যে জগৎ বোধ হয়, তা সত্য নয়, মিথ্যা — অর্থাৎ জগৎ যে রূপে পররূপতঃ আছে তা আমরা সঠিক না জেনে যা জানতে পাচ্ছি তা মিথ্যা। শ্রীভগবান বলেছেন ঃ

''নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ'' ।।[৩১]

অর্থাৎ যে পদার্থ অসৎ তার বিদ্যমানতা কোন কালেই নেই, আর যা সৎ তার অভাবও কোন কালে নেই, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপে সৎ ও অসৎ তত্ত্ব নিরূপণ করে থাকেন। এখন কথা হচ্ছে যে, দেশত, কালত ও স্বরূপতঃ যে সব বস্তু পরিচ্ছন্ন সে সমস্তই অনিত্য ও মিথ্যা। নাম বা শব্দ দ্বারা প্রথমতঃ কালের জ্ঞান হয়, আর রূপ দ্বারা দেশের ধারণা হয় বলেই কাল ও দেশের অন্তর্ভুক্ত নাম ও রূপময় বাহ্য পৃথক পৃথক রূপে নিরূপিত জগৎ মায়ার বিকাশ, সে জন্য মিথ্যা। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মা দেশ ও কালের অতীত , তা কোন উপাধির দ্বারা পৃথকভাবে নিরূপিত হতে পারে না। তাই আত্মা নিত্য, এক অদ্বিতীয় — আর তিনিই সৎ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।

আচার্য শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি

আবার অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর জগৎ মায়ার সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। এই মায়ার কথা বেদ এবং উপনিষদেও উল্লিখিত আছে ।ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ''ইন্দ্রো মায়াভিঃ

পুরুরূপ ঈয়তে।"[৩২] অর্থাৎ ইন্দ্র মায়ার দ্বারা নানবিধ রূপ ধারন করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, মায়া উপাধি অঙ্গীকার করেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ হন। সগুণ ব্রহ্মই মহেশ্বর। তিনি মায়া উপাধি উপহিত। এই মায়ার স্বরূপ কী ? এই রূপ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। তবে শঙ্করের মতে এই মায়া ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়। কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুই মিথ্যা। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার নাশ হয়। তখন জগতের আর কোনও সত্তা থাকে না, মায়ার সত্তাও থাকে না। আবার মায়া অসৎ নয়। কেন না মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সকলের জ্ঞানগোচর হয়। তাই তাকে অনির্বচনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। তবে কেউ মনে করেন যে, ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুই সত্তার স্বীকৃতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটবে না কেন ? এর সমাধানপক্ষে আচার্য্য বলেন যে, ঈশ্বর ও মায়া অভিন্ন । অগ্নির দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শক্তি মায়াকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না।[৩৩]

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের মতে সত্য ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের লক্ষণ নয়। তাই যা সৎস্বরূপ তা কখন অসৎ হতে পারে না এবং যা অসৎ স্বরূপ তা সৎ হতে পারে না। কেননা স্বরূপের কখনো হানি হয় না। আবার অসৎ থেকে বা সতের অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি হতে পারে না। কাজেই সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও এক পরম সত্যের অস্তিত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এই পরম 'সৎ' পরিপূর্ণ ভাবে সত্য, এই সৎ হল শাশ্বত ও স্বয়ম্ভূত। এই সৎ অদ্বৈত। ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সৎ। অবিদ্যা হেতু অদ্বৈত ব্রহ্মই বহু রূপে প্রতিভাত হয়, যা সৎ স্বরূপ তাই চিৎ স্বরূপ, সৎই চিৎ চিৎ-ই সৎ। "অথ সত্ত্বেব বোধঃ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তিরস্তীতি ।" সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, উভয়ের পরস্পর ভেদ নেই। ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত আনন্দ স্বরূপ সেই হেতু সুষুপ্তিতেই ব্রহ্মের এই আনন্দ স্বরূপের কথা অবগত হওয়া যায়। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম"।[৩৪] সেই আনন্দের এক অংশকে আশ্রয় করে জগৎ অবস্থান করছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের বিশেষণ নয়, ব্রহ্মের স্বরূপ। এখানেও শঙ্কা এই, শাস্ত্রকারগণ বলেন ব্রহ্ম শব্দের অগম্য "যদ্বাচানভ্যুদিতম্"[৩৫] "অশব্দমস্পর্শমরূপ-মব্যয়ম্।[৩৬] তবে তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হবেন কি করে ? তার উত্তরে বলা হয় যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি পদ অভাবের সূচক. ব্রহ্ম সৎ মানে ব্রহ্ম অসৎ বা মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম চিৎ মানে ব্রহ্ম জড় নয় এবং ব্রহ্ম আনন্দ অর্থে দুঃখ স্বরূপ নয়।[৩৭] সুতরাং বলা যেতে পারে, ব্রহ্ম শাস্ত্রে বস্তুতঃ বিধিমুখে বিহিত হন নি, নিষেধ মুখে বিবক্ষিত হয়েছেন । নেতি নেতি স আত্মা।[৩৮]

অধ্যাস বা ভ্রম প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জগৎ মিথ্যা

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর আরো বলেছেন, ব্রহ্মের অজ্ঞানবশতঃই ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস (ভ্রম) হয়। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হলেই তাকে অধ্যাস বলে। অধ্যাস হল

পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তুর অপর বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যাপ্রত্যয়। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ,. প্রতি অধ্যাসের ক্ষেত্রেই একটি অধিষ্ঠান থাকে যার সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাববশতঃ ভেদাগ্রহ (তাদাত্ম্যবুদ্ধি) হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই অধিষ্ঠানে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ হয়।[৩৯]

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য আরো বলেছেন, ভ্রমজ্ঞানে দৃষ্ট বিষয়কে সৎ বলা যায় না। আবার অসৎও বলা যায় না। সদ্‌সদ্‌ ও বলা যায় না। যেমন শুক্তি-রজতভ্রমে রজতকে অসৎ বলা চলে না। কেননা তার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, কিন্তু অসতের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। আবার 'সৎ' বলাও চলে না; কারণ পরে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজত বাধিত হয়। আবার 'সদ- সৎ, বলা যায় না। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী। কাজেই শুক্তিরজত হল অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় রজত প্রাতিভাসিক। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত শুক্তির জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই এই রজত ভ্রান্তদর্শীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। ভ্রম দূরীভূত হলে আর রজতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অদ্বৈতবাদ মতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত এবং শুক্তি যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত সেই চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যার তমোভাগ থেকেই অনির্বচনীয় রজতের উৎপত্তি। ভ্রমের উপাদান কারণ অবিদ্যা, সুতরাং রজত এবং রজতের ভ্রান্ত জ্ঞান ও 'অনির্বচনীয়'। এই রীতি অনুসারে অদ্বৈতবাদীগণের মতে এই জগৎ প্রপঞ্চও অনির্বচনীয় এবং মিথ্যা। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, শুক্তি রজতের উপাদান কারণ তুলা অবিদ্যা বা জীব চৈতন্যের উপাধি খণ্ড অবিদ্যা। আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কারণ মূল অবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্যের উপাধিখণ্ড অবিদ্যা। শুক্তি রজতের স্রষ্টা অজ্ঞ জীব; মায়াময় বিশ্ব প্রপঞ্চের স্রষ্ঠা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। রজতের অধিষ্ঠান শুক্তির জ্ঞানে যেমন রজতের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তেমনি জগতের অধিষ্ঠান পর ব্রহ্মের জ্ঞানে জগতের জ্ঞান তিরোহিত হয়।[৪০]

অতএব শঙ্করাচার্যের মতে পরমার্থদৃষ্টিতে জগৎ প্রপঞ্চ মায়াময়, আর মায়া স্বপ্নদৃষ্ট বা মনঃ কল্পিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। যদিও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বেদান্তদর্শনে ব্যাবহারিক জগতের সত্যতা, কর্ম উপাসনা প্রভৃতি সবই শঙ্করমতে স্বীকৃত, কিন্তু দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী বেদান্তদর্শনে রজ্জু সর্পাদির ন্যায় ও স্বপ্নের ন্যায় জগৎ প্রাতিভাসিক। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তির নিকট নাম রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। এই কারণে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে জগতের মিথ্যাত্ব বুদ্ধি কারও হতে পারে না। যাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয় নি, তার কাছে জাগতিক প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবহার সত্য।[৪১] তাই বলা হয়েছে—

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ।।"[৪২]

আচার্য শঙ্করের জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই সেটা হল জগৎ নাটকীয় দৃশ্যের মতই মিথ্যা। আমরা জানি, নাটকের দৃশ্য নিতান্তই মিথ্যা —

"যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি কিমপি ধ্রুবম্‌।

যথা গন্ধর্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে ।।''[৪৩]

আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্বনগর অথবা মরুস্থলে দৃষ্ট মরীচিকার বারিপ্রবাহ যেরূপ সত্য নয়, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তদ্রূপ সত্য নয় অর্থাৎ বস্তুতঃ মিথ্যা। ভাষ্যাদি গ্রন্থে ও বহু বেদান্ত গ্রন্থে গন্ধর্বনগরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নেত্রদোষ বা অন্য কোন কারণে বা মেঘের বিচিত্র সমাবেশ বশতঃ হঠাৎ আকাশে যে নগরীর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাই গন্ধর্বনগর এরূপ অর্থ করা হয়। এর অন্য অর্থও আছে। গন্ধর্ব বলতে পূর্বে সঙ্গীত ও নাটক বিদ্যাকুশল মনুষ্য জাতি বিশেষকে বুঝাত। তবে এটি কোন অলৌকিক জাতি নয়। তারা নাটক করবার জন্য সাময়িক গৃহ, দুর্গ, প্রাসাদাদি নির্মাণ করত। সেইসব নগরাদি বস্তুতঃ নাটক প্রদর্শন করবার জন্য নির্মিত হত, এগুলি যথার্থ নয়। কতটা বর্তমান কালের রঙ্গমঞ্চের চিত্রিত পটাবরণের ন্যায়। এটা নগরের ন্যায় দেখতে বটে, কিন্তু বাস্তব নয়। আকাশে দৃষ্ট নগরীর কল্পনা পরে হয়েছে। ভাষ্যাদিতে এর যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলো জগৎকে গন্ধর্বনগর বা স্বপ্নদৃষ্ট ও নাটক তুল্য বলা হয়। স্বপ্নদর্শন কালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে বাধ বা মিথ্যাত্ব বুদ্ধি থাকে না। নাটকের অভিনয় কালেও নটের এই বুদ্ধি থাকে যে সে অভিনয়ই করছে। সে জানে যে অভিনয়টা মিথ্যা এবং আপন যথার্থ পরিচয়টাও নটের মনে থাকেই। নতুবা অভিনয়ই হবে না। অতএব জগৎ মিথ্যাত্ব তত্ত্বটি স্বপ্ন ও নাটক উভয় দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ ।[৪৪]

''যথা স্বপ্নে মুহূর্তে স্যাৎ সংবৎসরশতভ্রমঃ ।
তথা মায়াবিলাসোঽয়ং জায়তে জাগ্রতি ভ্রমঃ ।।''[৪৫]

এক মুহূর্ত কালের মধ্যে স্বপ্নে যেমন শতবৎসরের ভ্রম হয়, সেই প্রকার জাগ্রদ্দৃষ্ট এই সংসার ও মায়ার বিলাসও মিথ্যা ভ্রমমাত্র।

বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সদ্ বস্তু ও তদ্ ভিন্ন আর সব কিছুই অসৎ। কিন্তু অসৎ অর্থ যার সত্তা নেই। এই অর্থে বন্ধ্যাপুত্র ও রজ্জুসর্প উভয়ই অসৎ, কারণ উভয়েরই কোন বস্তু সত্তা নেই। কিন্তু সত্তাহীন হয়েও রজ্জুসর্প দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, বন্ধ্যাপুত্র তা কখনই হয় না। রজ্জু সর্পকে বলা হয় মিথ্যা এবং বন্ধ্যাপুত্রকে বলা হয় তুচ্ছ বা অলীক। অতএব যা অসৎ অর্থাৎ বস্তুতঃ নেই অথচ প্রতীতি গোচর হয়, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদীর মতে তাই 'মিথ্যা' ।

''যদসদ্ ভাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ।''[৪৬]

যা অসৎ অর্থাৎ নেই কিন্তু ভাসমান বা প্রতীয়মান হয় তা মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি, মরীচিকার জল বা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি ।

অজ্ঞান বশতঃ এক অদ্বিতীয় সদরূপ ব্রহ্মে জগৎ প্রতীতি হচ্ছে। এই জগৎ সত্য বলে বোধ হলেও তত্ত্বজ্ঞান হলে জগতের সত্যতাবুদ্ধি বাধিত হয়ে যায় বলে জগতের ত্রিকালস্থায়ী কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই । অতএব জগৎ মিথ্যা।[৪৭]

জগতের মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে উপনিষদের কিছু উপদেশ এখানে বিবেচনা করা যায়।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে —

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ।।"[৪৮]

এই মন্ত্রে ব্রহ্ম সকলের অন্তর ও সকলের বাহ্য বলায় 'সকল' পদবাচ্য দৃশ্য পদার্থকে মিথ্যাই বলা হলো —

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।"

এস্থলে আত্মাতে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতে আত্মাকে দেখায় আত্মা ও সর্বভূতের আধারাধেয়ভাব আর থাকল না। ভিন্ন বস্তুতেই আধারাধেয়ভাব থাকে। অতএব এক আত্মাই সিদ্ধ হল আর তজ্জন্য আত্মভিন্ন সর্বভূত মিথ্যাই হল।

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।"[৪৯]

এস্থলে 'যে সমুদায় ভূত আত্মাই হয়, এইরূপ বলায় এবং জ্ঞানের ফলেই শোক মোহনাশ প্রাপ্ত হয় বলায় এক আত্মাই সত্য, আর অন্য সব অজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা এটাই বলা হয়। সর্বভূত আত্মভিন্ন সত্য বস্তু হলে তা আর আত্মা হতে পারত না। এজন্য আত্মভিন্ন বস্তু মিথ্যা।

কঠোপনিষদে —

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ।।"
"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য হই নানেব পশ্যতি।।"

এস্থলে ব্রহ্মে নানার মত দেখার নিন্দা এবং ব্রহ্মে নানা নেই বলায় ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যাই বলা হয়। যা নেই তাকে দেখলে তা মিথ্যাই হয়।

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনোর্ব্বিজানত আত্ম ভবতি গৌতম।।"[৫০]

এস্থলে জীবন্মুক্তিতে ব্রহ্মাই হয়ে যায় বলায় জীবত্বের মিথ্যাত্বই কথিত হয়। ভিন্ন বস্তুদ্বয় কখনও অভিন্ন একবস্তু হয় না। আর যদি হয় তাহলে ভিন্নতাই মিথ্যা বলতে হবে।

প্রশ্নোপনিষদে —

"স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি; ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যতে মাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোহকলোহমৃতো ভবতি।"[৫১]

এস্থলে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলায় জীবত্বকে মিথ্যাই বলা হল। জীব যদি সত্য হোত তবে তার নামরূপ নষ্ট হয়ে তা ব্রহ্ম হতে পারত না।

মুণ্ডকোপনিষদে —

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।"[৫২]

এস্থলে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলায় জীবত্বকে মিথ্যাই বলা হল। জীব যদি সত্য হোত, তবে তার নামরূপ নষ্ট হয়ে তা ব্রহ্ম হতে পারত না। অতএব এস্থলেও জগৎ মিথ্যা বলা হল।

মাণ্ডূক্যোপনিষদে —

"সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ"[৫৩]

এস্থলে জানার ফলে আত্মার দ্বারা আত্মাতে প্রবেশ করে বলায়, না জানায় প্রবেশ করা হয় না, এটাও বলা হয়। সুতরাং আত্মভিন্নতাকে মিথ্যাই বলতে হয় ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে —

"তৎ সৃষ্টবা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চা - নিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সতাঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।[৫৪]

এস্থলে ব্রহ্মই সব হলেন বলায় এবং ব্রহ্মকেই সত্য বলা হয় বলে ব্রহ্মভিন্নকে মিথ্যাই বলতে হয়, কারণ ব্রহ্ম সত্য হলে জগৎ আর স্ব-স্বরূপে নেই বলতে হয়।

ঐতরেয়োপনিষদে —

"সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।"[৫৫]

এস্থলে সমুদায় প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলায় ব্রহ্মভিন্নকে মিথ্যাই বলা হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে —

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।।[৫৬] এস্থলে মৃত্তিকাই সত্য বলায় অর্থাৎ উপাদানই সত্য বলায় অন্য সব মিথ্যা বলা হয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে —

ক) "আত্মনো বারে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ।"

এখানে আত্মাকে জানায় সব জানা যায় বলায় সকল বস্তু আত্মাতেই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলতে হয়। এইসব আত্ম ভিন্ন হলে আত্মার জ্ঞানে আর এদের জ্ঞান হোত না।

খ) "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি — যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এবাভূৎ কেন কং জিঘ্রেৎ — বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। "

গ) "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ।।[৫৭]

এ মন্ত্রটি কঠোপনিষদেও আছে। ব্রহ্মে নানা নেই বলায় নানাকে মিথ্যাই বলা হল।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে —
"অন্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ"
বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি বলায় বিশ্বকে মায়া অর্থাৎ মিথ্যাই বলা হল।
"জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ" 'জ্ঞাত্বা দেবঃ মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" "জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।"[৫৮]

এস্থলে জ্ঞানের পরই সর্বপাশ নষ্ট হয় বলায়, জগৎরূপ সর্বপাশকে মিথ্যাই বলা যায়।

মৈত্রায়ণ্যুপনিষদে —

ক) 'ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্, কদলীগর্ভ ইব অসারম্, নট ইব ক্ষণবেয়ম্, চিত্রভিত্তিরিব মিথ্যা মনোরথম্ ।।"[৫৯]

এস্থলে জগৎকে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলা হয়েছে ।

খ) "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ। অথ যন্মূর্ত্তং তদসত্যম্ যদমূর্ত্তং তৎ সত্যং তদ্ ব্রহ্ম।"

এস্থলে ব্রহ্মভিন্নকে অতিস্পষ্ট কথায় অসত্যই বলা হয়েছে। এরূপ বহু শ্রুতিতেই জগতের মিথ্যাত্ব স্পষ্ট ভাবেই ঘোষিত হয়েছে। অতএব কি অনুমান কি শ্রুতি সকল প্রমাণই জগৎ মিথ্যা প্রতিপাদন করে।

শঙ্করের সিদ্ধান্তে জগৎ সম্বন্ধে উপনিষদের দুরকম ভাবনার কথা পাওয়া যায়। একদিকে জগতের সৃষ্টির বর্ণনা দেখা যায়, আবার অন্যদিকে ভেদভিন্ন জগতের অস্তিত্বের অস্বীকৃতিও দেখা যায়। এই দুই প্রকার উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। তবে উপনিষদের মূল ভাবধারাকে বিবেচনা করলে সৃষ্টির বর্ণনাগুলিকে অযুক্ত বলতে হয়। যদি ব্রহ্ম সত্য সত্যই জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে তাঁকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলা যায় না। আর যা সৎ বা সত্য তা কখনও অপগতহতে পারে না। জগৎ সত্য হলে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তার নাশ হতে পারে না। সেটা যা মিথ্যা অর্থাৎ সৎ নয় কিন্তু সৎ রূপে প্রতিভাত হয়, তাই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হতে পারে। এর থেকেই অদ্বৈতাচার্যরা জগৎ রহস্য উদঘাটন করবার ইঙ্গিত পেয়েছেন। জগৎকে যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র হয় তবেই আমরা বুঝতে পারি যে, এটা এখন দৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত বা অপগত হতে পারে।[৬০]

উপসংহারে বলা যায় যা দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না, এখন রয়েছে, কিন্তু পরে থাকবে না, যেটা কালপরিচ্ছেদের অধীন, সেটাই মিথ্যা। এই লক্ষণানুসারে জগৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় জলেরই বিম্ব, বিম্বের জল নয়। জল আছে বলেই তরঙ্গ বা বিম্বের উৎপত্তি, আবার জলেই লয় । সাধক রামপ্রসাদ এই ভেবেই গেয়েছেন ঃ "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।" — এখন এক কথায় বলতে হবে যে, কারণ রূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ, আর

তার অধিকরণে অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে, দেশবিশেষে, পাত্রবিশেষে অনুভূত, আবির্ভূত বা প্রকাশিত ব্যাপারই অসৎ বা মিথ্যা।[৬১]

জাগ্রৎ অবস্থায় অন্ধকারে স্থাণুতে পুরুষ দেখা, ভূত দেখা, মন্দান্ধকারে রজ্জুতে সর্প দেখা, নদীসৈকতে উদ্ভাসিত সূর্যালোকে শুক্তিতে রজত দেখা, দ্বিপ্রহরে মরুভূমিতে তপ্তবালুর উপর দীর্ঘ সরোবর দেখা, সরোবরে বৃক্ষের বিপরীত ছবি দেখা প্রভৃতি জাগ্রৎ অবস্থাতেই সংঘটিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দও রাজপুতানার মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে প্রথম ভ্রমে পড়েছেন।

সামান্য বাজিকর যখন যাদুর প্রভাব দেখায় তখন আমরা মনে করি কত কি অসম্ভব বিচিত্র দৃশ্য দেখছি, প্রকৃতপক্ষে সে সবই মিথ্যা। সামান্য যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার যদি এত ক্ষমতা থাকে তা হলে ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির যে কত প্রভাব তা কে বলতে পারে ? যোগী পুরুষের না হয় যোগবিভূতি থাকতে পারে, কিন্তু যোগ তপস্যাহীন যাদুকরের ঐরূপ ক্রিয়া অতীব বিস্ময়কর।

পরিশেষে মাণ্ডূক্য কারিকায় গৌড়পাদ বলেছেন ঃ জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বিষয়ের চিত্ত থেকে পৃথক সত্তা নেই। সমস্ত অনুভূত দৃশ্য বিষয় দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছু নয়।

যোগবাশিষ্ঠেও উৎপত্তি প্রকরণে (৯৪-২৯, ৪০, ৪১) আছে; এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা বা সঙ্কল্প মাত্র, যেমন মরীচিকা সূর্যরশ্মি ভিন্ন আর কিছু নয়। সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য দ্রষ্টা ভিন্ন কিছু নয়; অনুভূতকালে সত্য, যথার্থ সত্যের পরীক্ষায় মিথ্যা, এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'জগৎ মিথ্যা' — তবে তিনি উচ্ছেদবাদী বৌদ্ধদের মত বলেন নি, জগৎ আকাশকুসুমবৎ বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ অসম্ভব বা অসৎ। তিনি জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নি।[৬২]

মাণ্ডূক্য উপনিষদ বলেন ঃ ''শান্তং শিবমদ্বৈতম্[৬৩]'' — অর্থাৎ শান্ত, শিব অদ্বৈত। ''শান্তং'' রাগদ্বেষাদিরহিত। 'শিবং' — মঙ্গলস্বরূপ। ''অদ্বৈতম্'' — ভেদ বিকল্প শূন্য। এখানেও জানানো হল যে সেই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, দ্বিতীয় কোন কিছু নেই। যদি মনে হয় আছে তা 'মিথ্যা' তা মায়া ।

দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, এই সসাগরা পর্বত, নদনদী, বনকানন সমন্বিত পৃথিবী যাকে সর্বদা দেখছি, যার উপর বাস করছি, তা একেবারেই মিথ্যা বলা অবিশ্বাস্য। কাজেই আমাদের বলতে হবে যে দেখতে পেলেই যে দৃষ্ট বস্তু সত্য হবে তার কোন মানে নেই। স্বপ্নে নানারূপ বস্তু দেখা যায়, আবার জাগ্রৎ অবস্থায় শুক্তিতে রজত দেখা যায়, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় সে সব মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চটাই মায়ার বিজৃম্ভণ। তাই তো শাস্ত্রে দেখতে পাই, ''ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ''। — অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্তই মায়া বিজৃম্ভিত। সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মাই যদি মায়া থেকে উৎপন্ন হন, তখন জগৎ যে মায়াসম্ভূত মিথ্যা তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।[৬৪] গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন ঃ—

''অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বেঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।।"[৬৫]

অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন সমাগত হলে অব্যক্ত থেকেই এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন আর প্রত্যক্ষ ব্যবহারের উপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না।

অতএব সমস্ত দিক বিচার করে বলা যায় আচার্য শঙ্করের মিথ্যাত্ববাদ ও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ সর্বতোভাবে সমীচীন ।

১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/১
২। হিন্দুধর্ম । পৃঃ ১২৬
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭/১০
৪। হিন্দুধর্ম। পৃঃ ১২১
৫। শ্রীমদ্ভগদ্গীতা , ৯/১৮
৬। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২/৬/৩
৭। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩/১৪/১
৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ /৪/১৯
৯। বিবেকচূড়ামণি ঃ শ্লোক সংখ্যা ৪০৫
১০। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ । সপ্তম অধ্যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ ।
১১। জগৎ মিথ্যার শাস্ত্র - প্রমাণ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন পত্রিকায় দ্রষ্টব্য ।
১২। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২/১/২
১৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন । পৃঃ ১১৭-১১৮
১৪। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩/১/১
১৫। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/১/৪
১৬। ব্রহ্মসূত্র ২/১/১৪
১৭। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা শঙ্করাচার্য, শ্লোক - ২১
১৮। ব্রহ্মসূত্র, পৃঃ- ৪২ (ভূমিকা)
১৯। বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড ।পৃঃ ৭৩০
২০। যোগাবাসিষ্ঠসারঃ । পৃঃ ৬৪-৬৫
২১। ঐতরেয়োপনিষৎ - ১/৩/১২
২২। নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন। পৃঃ ১৯৬
২৩। বেদান্তদর্শন। পৃঃ ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
২৪। নীতি বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন। পৃঃ ১৭৭
২৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৪/৪/১৯
২৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ — ৪/৫/১৫
২৭। বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৩
২৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। ৪/৩/১৫
২৯। বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ। পৃঃ ৯৪
৩০। বেদান্তদর্শন - অদ্বৈতবাদ। পৃঃ ৯৫

৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/১৬
৩২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৫/১৯
৩৩। The complete works. P. 88-89
৩৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩/৯/২৮
৩৫। কেনোপনিষদ্ - ১/৫
৩৬। কঠোপনিষদ্ - ১/৩/১৫
৩৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৩/৯/২৬
৩৮। ব্রহ্মসূত্র। ভূমিকা, পৃঃ ৪২-৪৩
৩৯। ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ৪৪-৪৫
৪০। উদ্বোধন ৭৮ তম, পৃঃ ১৮১-১৮২
৪১। বিবেকচূড়ামণি। পৃঃ ৩৬৬
৪২। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন ১/১/৪ ধৃত ।
৪৩। যোগবাসিষ্ঠসার দ্বিতীয় অধ্যায়। শ্লোক সংখ্যা - ৮
৪৪। যোগবাসিষ্ঠসার। পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭
৪৫। ঐ প্রথম অধ্যায় - শ্লোক সংখ্যা - ১৮
৪৬। পঞ্চদশী । ২/৭০
৪৭। যোগবাসিষ্ঠসার। পৃষ্ঠা ২৭
৪৮। ঈশোপনিষদ্ শ্লোক ৫, ৬
৪৯। ঈশোপনিষদ্ মন্ত্র সংখ্যা - ৭
৫০। কঠোপনিষদ্। ২, ১,১০ / ২,১,১১ /২,১,১৫
৫১। প্রশ্নোপনিষদ্ মন্ত্র সংখ্যা ৬৪
৫২। মুণ্ডকোপনিষদ্, (৩.২.৮)
৫৩। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ (১,১২)
৫৪। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । মন্ত্র সংখ্যা - ১,৬,৪
৫৫। ঐতরেয়োপনিষদ্। ৩,১,৪
৫৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ্। মন্ত্রসংখ্যা (৫, ১,৪)
৫৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। (২,৪,৫), (২,৪,১৪), (১,১৯)
৫৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (১,১০), (১,১১), (২,১৫), (৪,১৫)
৫৯। মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ (৪,২) (৬,৩)
৬০। ব্রহ্মসূত্র ।ভূমিকাংশ । পৃঃ ১৮ দ্রষ্টব্য
৬১। উদ্বোধন ৬০ তম বর্ষ। পৃঃ ২৬৩
৬২। জগৎ মিথ্যাত্ব শাস্ত্র প্রমাণ। উদ্বোধন পত্রিকায় দ্রষ্টব্য ।
৬৩। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (১-৭)
৬৪। উদ্বোধন ৬০ তম বর্ষ সূচী। পৃঃ ২৬০-২৬১
৬৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮/১৮

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক আলোচনা

অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলে দুটি তত্ত্ব নেই। জীবাত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। যতদিন না জীবের দেহাদি-আত্মবুদ্ধি থাকে ততদিন সে নিজেকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন মনে করে। কিন্তু 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে দেহাদ্যাত্মবুদ্ধির নাশ হয় ও আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়, এই বুদ্ধি হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বলেন, জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন। জীবাত্মা চিরকালই পরমাত্মাকে পাবার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। জীবাত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারেন না। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিশে যায় না। ভগবানের লীলা আস্বাদন করে। নিজে চিনি না হয়ে চিনির মিষ্টতা আস্বাদন করে।[১]

ভগবান্ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্ম চিন্তার শ্রেষ্ঠ সোপান। এখানে সাধক সমাধিস্থ হয়ে ভগবানের সঙ্গে লীন হয়ে যান। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় — ''অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি তাই কর।''[২]

দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী বেদান্ত মত

বেদান্তদর্শনের পূর্ণপ্রজ্ঞ নামক ভাষ্যের রচয়িতা পূজ্যপাদ মধ্বাচার্যই দ্বৈতবাদের প্রবর্তক। মধ্বাচার্যের অপর নাম আনন্দতীর্থ। তাঁর মতে বিষ্ণুপদাভিলাষী শমদমাদিসম্পন্ন জাতবৈরাগ্য ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে সেই অধিকারী ত্রিবিধ। আর এই মতে পদার্থ দ্বিবিধ স্বতন্ত্র, অস্বতন্ত্র। অতঃপর এই মতেই বলা যায় নিয়ামক পরমেশ্বর এবং নিয়ম্য ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ সত্য পদার্থ এবং পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। সেই হেতু এই মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা হয়।[৩] আর যে মতবাদে সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র নিরাকার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় না তার নাম অদ্বৈতবাদ।[৪] পাশাপাশি দ্বৈতবাদি বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু মতকেই আমরা পাই। এঁদের কারো মতে পরমাণু জগৎ কারণ, কারো মতে প্রকৃতি , আর কারো মতে ঈশ্বরই জগৎকারণ। সকলে বহু আত্মার অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করেছেন।[৫]

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ উপনিষদে বর্ণিত জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটিই প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান দার্শনিক মত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও জগৎ এবং জগৎ ও পরমাত্মার যে কোন ভেদ নেই, এটাই অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিপাদ্য। দ্বৈতের অভাবই অদ্বৈত । এই মতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য।

এই মতকে উপজীব্য করে প্রথম গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্য উপনিষদের কারিকা রচনা করেন। তাঁর মতে স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা পর চৈতন্য জগদ্রূপ মায়ার বিলাস সৃষ্টি করেছেন।

গৌড়পাদাচার্যের প্রশিষ্য শঙ্করাচার্য অদ্বৈততত্ত্বকে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রধান প্রধান উপনিষদ্ ও ব্যাস বিরচিত বেদান্তসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে মঠস্থাপন পূর্বক অদ্বৈতচর্চার পথ সুগম করে তিনি তাঁর মতটিকে এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, পূর্বাচার্যগণের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ থাকা সত্ত্বেও শঙ্করাচার্যকেই অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সমস্ত উপনিষদের উপদেশের তাৎপর্য আত্মার একত্বে। আর এটাই উপনিষদ্-বর্ণিত অদ্বৈততত্ত্ব। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রে এই মতই সুশৃঙ্খল দার্শনিক মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[৬]

দ্বৈতজগৎ সকলের সম্মুখে প্রতিভাত। এটা এক দৃষ্টিতে সৎ এবং আর এক দৃষ্টিতে মিথ্যা। এক পক্ষে জগৎ নিত্য অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে এর কার্য্যপ্রণালী যথানিয়মে চলে আসছে ও অবিচ্ছিন্নভাবে চিরকালই চলতে থাকবে। জগতের কেবল রূপান্তর ও অবস্থান্তর হচ্ছে মাত্র।

যদিও ব্যাবহারিক ভাবে জগৎ সত্য তথাপি পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ নিতান্তই অবস্তু। এর নিজস্ব সত্তা বলে কিছুই নেই। ব্রহ্মের সত্তাই এর সত্তা। যেমন রজ্জু ভ্রমস্থলে রজ্জুর সত্তাই সর্পের সত্তা। রজ্জু সত্তার অতিরিক্ত সত্তা সর্পের নেই। সুতরাং রজ্জুসর্পের ন্যায় জগতের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় জগৎ তত্ত্বতঃ মিথ্যা। অধিষ্ঠানের অজ্ঞানবশতঃ রজ্জু -সর্পের ন্যায় জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয়।

"সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসবঃ।
সতি পুষ্পইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা,
প্রতিভাসত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ ।।"[৭]

দীপ থাকে বলেই আলোক থাকে, সূর্যপ্রকাশ থাকে বলেই দিন থাকে, আর পুষ্প থাকে বলেই গন্ধ থাকে, সেরূপ সত্য স্বরূপ ও চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম আছে বলেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশমান হয়। এই পরমার্থতঃ জগৎ বস্তু নয়।[৮]

বেদই প্রধান শাস্ত্র। বেদের পরবর্তী স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি বেদমূলক হওয়ায় শাস্ত্র। কারণ স্মৃতি পুরাণাদিতে বেদেরই উপদিষ্ট মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাভাবে সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং স্মৃতি পুরাণাদি পরতঃ প্রমাণ, কিন্তু বেদ স্বতঃ প্রমাণ। আর এটাও শাস্ত্র বিধান যে, যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হবে, সেখানে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য হবে এবং স্মৃতির মত ত্যাজ্য হবে। আমরা দেখি, অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামী আচার্যগণ বেদান্ত মতের ব্যাখ্যায় শ্রুতিকেই মুখ্য উপজীব্যরূপে অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থে উপনিষদ্বাক্য অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত হয়েছে। কেবল খুব অল্প স্থলেই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে। আর দ্বৈতবাদী গ্রন্থে উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্য শ্রুতির তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে দেখা যায়। এঁরা স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণের উপর এত বেশি নির্ভর করেছিলেন যে, সে সময়ে অদ্বৈতবাদই খাঁটি বৈদিক মত বলে পরিগণিত হয়েছে।[৯]

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য

বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি এর সোজাসুজি অর্থ করেন, কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন তখন এর শব্দার্থ বিকৃত করে তা হতে এমনভাবে অর্থ বের করেন যাতে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যাহত না হয়। এরূপ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরা যেখানে যেখানে দ্বৈতপর শ্রুতি পেয়েছেন, সেগুলিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা না করে সেইভাবে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা পেয়েছেন সেই খানেই আরো বিকৃতভাবে সেই সকল শ্রুতি যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করেছেন। এইভাবে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মধ্যে যুগ যুগান্তর ধরে তর্ক চলতে পারে। কোনও দিনই হয়তো বিবাদ ভঞ্জন হবে না। তাই স্বামীজি বলেছেন যে, উপনিষদের অর্থ নির্ধারণের পক্ষে এই সকল বাধা বিঘ্ন আছে। তিনি আরো বলেছেন যে আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম যিনি একদিকে যেমন দ্বৈতবাদী ছিলেন অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, আবার একদিকে যেমন পরম ভক্ত অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।[১০] এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমার মনের অন্ধকার সব দূর হয়েছে। এবং পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান। একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। এক এক অধিকারীর জন্য এক একটি তত্ত্বকথা। অথবা একই তত্ত্বকে নানাভাবে বোঝানো। অতঃপর স্বামীজি বললেন, আমি এই সকল উপনিষদে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা-কর্ম উপাসনা ভক্তি প্রভৃতি আরব্ধ হয়েছে। শেষে অদ্বৈত ভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সে গুলি সমাপ্ত হয়েছে।[১১]

উপরি উক্ত দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা গেলেও আচার্য শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, দৃশ্যমান এই দ্বৈত জগৎ মিথ্যা (অনির্বচনীয়), তত্ত্বত অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য। স্বয়ং শ্রুতি এই উপদেশ দেন। দ্বৈত যে মিথ্যা ও এক, অদ্বৈতই সত্য সুষুপ্তিতে তা আমাদের অনুভব গোচর হয়।

> ''মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ।
> ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে ।।[১২]

গৌড়পাদ ও শঙ্করের মত

আধুনিক কালে বৈদান্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে আচার্য গৌড়পাদ এবং তাঁর প্রশিষ্য আচার্য শঙ্করকেই অদ্বৈতবাদের সর্ব প্রধান প্রচারক মনে করা হয়। তাঁরা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এখন আমাদের আলোচ্য। 'মাণ্ডূক্যোপনিষদে' ব্যাখ্যাত অদ্বৈত তুরীয় আত্মা সম্বন্ধে গৌড়পাদ বলেছেন যে, অদ্বৈত জন্মরহিত, নিদ্রারহিত ও

স্বপ্নরহিত। অনাদি মায়ায় সুপ্ত হয়ে জীব অদ্বৈত তত্ত্বকে অবগত হতে পারছে না। এই স্বপ্ন হতে প্রবুদ্ধ হলে জীব একে অবগত হয়।[১৩] গৌড়পাদের মতে তত্ত্বের অগ্রহণ বা অজ্ঞানই 'নিদ্রা'। আর তত্ত্বের অন্যথা গ্রহণ বা বিপরীত জ্ঞানই 'স্বপ্ন'[১৪]। অদ্বৈত আত্মা তত্ত্বের অভিব্যক্তিতে অজ্ঞান এবং বিপরীত জ্ঞান থাকে না। আচার্য শঙ্কর আরও বিশদভাবে বলেছেন যে বিপরীত জ্ঞান অজ্ঞান মূলক ; যেহেতু তুরীয় আত্মবোধে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নেই, সেই হেতু এতে বিপরীত জ্ঞানও নেই। তুরীয় অদ্বৈত আত্মার জন্মাদি ভাববিকার নেই বলে এটা অজ ও নিত্য। জীব যে অনাদি মায়াবশতঃ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে না জেনে জগৎ প্রপঞ্চকে সত্য মনে করে। সে নিন্দ্রাভিভূত স্বপ্নগ্রস্ত। তাই জীব আত্মার স্বরূপকে জানতে পারে না। আত্মার স্বরূপজ্ঞান উদিত হলে তদ্বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চরূপ বিপরীত জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। তখন জীব পরম অদ্বৈত অর্থে একীভূত হয়। এই বিবৃতি হতে পাছে কেউ মনে করেন যে, দ্বৈত প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রকৃতই হয়! গৌড়পাদ বলেছেন পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ বাস্তব নয়, সুতরাং এর উৎপত্তি এবং বিনাশ বাস্তব নয়। এটা মায়ামাত্র। সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে আত্মা সততই অদ্বৈত।[১৫] রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তা বিশদভাবে বলেছেন। যেমন অন্ধকারে রজ্জুর স্বরূপের জ্ঞান না হওয়াতে এটা সর্প, জলধারা প্রভৃতিরূপে কল্পিত হয়ে থাকে, সেই রূপ অজ্ঞানান্ধকার হেতু বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তিমাত্র অদ্বয় তত্ত্ব নিশ্চিত না হওয়ার কারণে আত্মা (জীব) প্রাণাদি অনন্ত বিভিন্ন ভাব সমূহরূপে বিকল্পিত হয়ে থাকে। তত্ত্বের নিশ্চিত জ্ঞান হলে তাতে কল্পিত জীবের প্রাণাদিভাব সমূহের নিবৃত্তি হয়। অদ্বৈত আত্মা যে প্রাণাদি অনন্তভাব সমূহরূপে বিকল্পিত হয়, গৌড়পাদ বলেন, তাই মায়া।[১৬] সর্পাদি রূপে প্রতীতি কালে ও রজ্জু প্রকৃত পক্ষে বস্তুতঃ সর্পাদি হয় না। কেননা, পার্শ্ববর্তী অপর ব্যক্তি যার ঐ ভ্রান্তি হয় না, অথবা হয়ে থাকলেও তখন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, সে একে রজ্জুই দেখে। কেননা 'অদ্বয়' শব্দ বস্তুর সত্ত্বসাপেক্ষ এবং 'দ্বয়'শব্দ কল্পনামাত্র। যা হোক, আত্মা অসৎ জীবপ্রাণাদি ভাব সমূহরূপে এবং অদ্বয় রূপে যথাক্রমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানী জন কর্তৃক কল্পিত হয়ে থাকে। আত্মরূপ আধার ব্যতীত পরস্পর বিরুদ্ধ ঐ ভাব সমূহ কল্পিত হতে পারে না। আত্মাই তত্তদ্রূপে দৃষ্ট হয় মাত্র। সুতরাং গৌড়পাদ বলেন, এরাও বস্তুতঃ আত্মাই।[১৭] এই মতের সমর্থনে তিনি বেদান্তবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের স্বানুভূতির উল্লেখ করেছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বেদান্তের আধারে এই বিশ্ব প্রপঞ্চকে স্বপ্ন, মায়া এবং গন্ধর্বনগরের তুল্য বলে নিরূপণ করেছেন।[১৮] জ্ঞানীগণই প্রপঞ্চকে যথার্থ বলে মনে করেন না। তাঁরা আত্মাকে নির্বিকল্প প্রপঞ্চোপশম অদ্বয় বলেই অবগত হন।[১৯] গৌড়পাদ বলেন, স্বপ্নে যেমন অদ্বয় মনই দ্বয়রূপে প্রতিভাসিত হয়, তেমন জাগ্রতেও অদ্বয় মনই দ্বয়রূপে প্রতিভাসিত হয়, তাতে কোন সংশয় নেই।[২০] সুতরাং বলা হয়েছে—

"মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।"[২১]

—চরাচর যা কিছু এই দ্বৈত দৃষ্ট হয় সেই সবই মনোবিলাস মাত্র।

"চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্বয়ম্ ।"[২২]

— গ্রাহ্যগ্রাহকভেদবান্ এই দ্বৈত প্রপঞ্চ চিত্তেরই স্ফুরণ মাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, দ্বৈত প্রপঞ্চ চিত্তের স্ফুরণ মাত্র হলেও এক দৃষ্টিতে সত্য। চিত্ত নিরুদ্ধ হলে এর উপলব্ধি হয় না বটে, পরন্তু তখনও তা চিত্তে 'বীজ' রূপে অবস্থান করে। এই শঙ্কা নিরাসার্থে গৌড়পাদ বলেন যে, চিত্ত প্রকৃত পক্ষে নির্বিষয়ই কেননা, এটা বস্তুতঃ আত্মাই। সেই হেতু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে নিত্য অসঙ্গ বলেছেন। তুরীয় আত্মায় দ্বৈতপ্রপঞ্চ বীজভাবেও থাকে না।[২৩]

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলেন, দ্বয় অসৎ। তদ্বিষয় লোকের অভিনিবেশমাত্র আছে বটে, পরন্তু আত্মায় দ্বয় বস্তুত নেই। দ্বয়াভাবের জ্ঞান হলে ঐ অভিনিবেশ নির্নিমিত্ত হয়। সুতরাং এর উৎপত্তি আর হয় না। অনিমিত্ত চিত্তের অনুৎপত্তি নির্বিশেষ অদ্বয়। যেহেতু এই যা কিছু সমস্তই চিত্তদৃশ্য মাত্র, সেই হেতু পূর্বে যে উৎপত্তি হোত তা বস্তুত অজাতেরই।[২৪]

অতঃপর দ্বৈতপ্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্তা আচার্য গৌড়পাদ স্বীকার করেন। আর তিনি এভাবেই দ্বৈতবাদ হতে অদ্বৈতবাদের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে আত্মতত্ত্ব

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করে আমরা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জানতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আত্মা রয়েছে। সমষ্টি মনের পশ্চাতে যে আত্মা তাঁকে ঈশ্বর বলে। ব্যষ্টি মনের অন্তরালে যে আত্মা তা জীবাত্মা। বিশ্ব সৃষ্টিতে সমষ্টি মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হয়েছেন আর বিশ্বাত্মা ও মনরূপে পরিণত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্যষ্টি মানব সম্বন্ধও কি এরূপ ? মানুষের শরীর, মন ও আত্মা এই তিনটি বস্তু কি ভিন্ন ভিন্ন অথবা এরা একের ভিতরেই তিন অথবা এরা এক পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র ? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজির মত অনুসারে বলতে পারি যে, স্থূল দেহ, তার পশ্চাতে ইন্দ্রিয়গণ তার পশ্চাতে মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। আত্মা শরীর হতে পৃথক, মন হতেও পৃথক । এখানে দ্বৈতবাদী বলেন আত্মা সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ভোগের সব অনুভূতিই আত্মার ধর্ম। অদ্বৈতবাদীরা বলেন আত্মা নির্গুণ।[২৫]

আরো জানতে পারি যে, মানবাত্মা অবিনশ্বর। যা বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তাই নশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগে বিসৃষ্ট সেটা কখনো কোনভাবে বিশ্লিষ্ট হয়। আর যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযাগে উৎপন্ন নয়, তা কখনও বিশিষ্ট হয় না । সুতবাং তার বিনাশ কখনও হতে পারে না, যেমন আত্মা, তাই সে অবিনাশী । তা অনন্তকাল ধরে থাকবে তার কখনও সৃষ্টি হয়না। সৃষ্টি কেবল ভূত বস্তুজন্য । শূন্য হতে সৃষ্টি কেউই কখনও দেখে না। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, এটা পূর্ব হতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নতুন নতুন রূপে একত্র মিলন সাধ্য ব্যাপার। আর যদি তাই হয়, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন

ভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নন বলে অবশ্য অনাদি কাল ধরে ছিলেন এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেন। এই শরীর পাত হলেও আত্মা থাকবেন। বেদান্তবাদীদের মতে যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায়। মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর রূপ নতুন বসন পরিধান করে চলেন ।[২৬]

আর যাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক বিদ্যাসহিত নিষ্কামকর্ম করেন তাঁরা সূর্য রশ্মি অনুসরণ করে সূর্যলোকে উপনীত হন, সেখান হতে চন্দ্রলোকে এবং চন্দ্রলোক হতে বিদ্যুৎ লোকে উপস্থিত হন; আর যেখানে তাঁদের সঙ্গে আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়, তিনি সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। এই স্থানে তাঁরা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে তাঁরা সেখানে অনন্ত কাল বাস করেন, আর অদ্বৈতবাদীদের মতে কল্পাবসানে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ করেন। এটিকে ক্রমমুক্তি বলে । যাঁরা শাস্ত্রবিহিত সকাম কার্য করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁরা এখানে সূক্ষ্ম দেবশরীর লাভ করেন। দীর্ঘকাল ধরে সুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁদের পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্ম হয়। তাঁরা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়ে এসে অবশেষে বৃষ্টি ধারার সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সঙ্গে পতিত হয়ে তাঁরা কোন শস্যকে আশ্রয় করে থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করলে তাঁর ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করেন।[২৭]

অতঃপর জীবের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বৈতবাদীরা বলেছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর সৎ (ধার্মিক) মানুষের আত্মা স্বর্গলোকে যায়। আর অসৎ (অধার্মিক) লোকের আত্মা অধোলোকে যায়। আর অদ্বৈতবাদীরা বলেন আত্মা সর্বব্যাপী। তাঁর কোন লোক থেকে কোন লোকে গমন সম্ভব নয়। আর আত্মার জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ, নরকলাভ বলে কিছু নেই। এমনকি আত্মার বস্তুতঃ বন্ধন মুক্তিও হয় না। আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। সুতরাং জ্ঞানী বা সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে আত্মা সম্পর্কে উক্ত ধারণা সব শিশুর কল্পনা, এগুলি বালসুলভ ভ্রম। এই স্বর্গনরক সবই একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়; অজ্ঞানীর পক্ষে ঐগুলি থেকে যায়।[২৮]

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে বলা যায়, যা হতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ নিয়মিত হচ্ছে, সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুই পরব্রহ্ম। ইনিই স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন সমস্তই অস্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম নানা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বহুরূপধারী জগতের পালক, কর্মফলদাতা, সকলের অন্তর্যামী, সর্বব্যাপক এবং সর্বত্র একরূপে অবস্থিত। তিনি প্রকৃত মাংস অস্থি ও মেদযুক্ত ভৌতিকরূপ বিহীন, কিন্তু বিজ্ঞান ও আনন্দাদি বিশিষ্ট ও রুক্মবর্ণ এবং সকল ইন্দ্রিয় পটুতা যুক্ত নিত্য ও শাশ্বত পৌরুষ রূপ বিশিষ্ট ইনি নিত্য শুদ্ধ, কেবল অনন্তগুণপরিপূর্ণ, সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নানা

অবতার রূপধারী এবং নির্গুণ। তিনি হিরণ্য, তিনি হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, যম, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার রূপধারী। ইনি জগতের নিমিত্ত কারণ এবং মহদাদিরূপে বিপরিণত জগতের উপাদান কারণ। প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সামর্থ্য নেই, পরমেশ্বর তাতে অনুপ্রবেশ করে ক্ষোভ উৎপাদন করেন ও তার বহু প্রকার পরিণাম সম্পাদন করেন এবং সেই পরিণামের নিয়ামক রূপে তাতে অবস্থান করত নিজে বহুরূপ ধারণ করেন। সেই হেতু পরমেশ্বর জগতের প্রকৃতি।[২৯] ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনায় অদ্বৈতবাদিগণ বলেন,

"অবশ্যম্ অব্যবহার্য্যম অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ ।"[৩০]
"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ,"[৩১]
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচ্যঃ।"[৩২]
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"[৩৩] ইত্যাদি

এই সকল বেদান্ত বাক্য থেকে সিদ্ধ হয় যে, বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ সম্ভব নয়। তথাপি লোকহিতকারিণী শ্রুতি অদ্বৈতব্রহ্মের স্বরূপ এইভাবে বর্ণনা করেছেন — "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্"।[৩৪] সেই এই ব্রহ্ম পূর্ব্ববিহীন, পরবিহীন, অনন্তর এবং অবাহ্য; "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।[৩৫] স এব অধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ - - - - স এব ইদং সর্ব্বম্"।[৩৬] "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ"[৩৭] ইত্যাদি। এই সকল বাক্য হতে অবগত হওয়া যায় যে, স্বগতাদি ভেদহীন ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, ঊর্ধ্বদেশে অধোদেশে সর্বতঃ পরিপূর্ণ রূপে অবস্থিত, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নেই । লৌকিক দৃষ্টিতে যা ইদং রূপে প্রতিভাত হয়েছে, তা বস্তুতঃ ব্রহ্মই। সুতরাং এতাদৃশ যে ব্রহ্ম, তা হতে কোন কিছুরই উৎপত্তি সম্ভব নয়; কারণ তা হলে তাঁর ভেদহীনতা ও সর্বব্যাপিতা ব্যাহত হয়ে পড়ে। উক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনিরূপে আচার্য শঙ্কর বলেছেন — "স্বতো বা পরতো বাপি না কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে,"[৩৮] 'এতত্তদুত্তমং সতং যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে।"[৩৯] তা হতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, এটাই সেই সর্ব্বোত্তম সত্য, যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই প্রকারে ব্রহ্ম হতে জগতের কোন কিছুর উৎপত্তি না হওয়ার আশঙ্কা হয়, এই মতবাদকে অজাতবাদও বলা হোক। অতঃপর অদ্বৈতবাদে একমাত্র সর্বব্যাপক ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়, তদ্ভিন্নের যা সত্তা, তা মায়া মাত্র. "জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে"[৪০] । "মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা"।[৪১] — যা বিদ্যমান নেই, নিত্য নিবৃত্ত স্বরূপ তার যে প্রতীতি, তাই মায়া'। এই প্রকার পরিস্থিতি বশতঃ একমাত্র ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত হওয়ায় এই মতবাদকে 'ব্রহ্মবাদ' বলা হয়।

অতঃপর বৃহদারণ্যক, কেন, তৈত্তিরীয়, কঠ প্রভৃতি উপনিষৎ হতে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছুই বলা চলে না। "ইনিই ব্রহ্ম" — এই রূপ অস্তি বাচক কোন উক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় না। আমরা যা দেখি তা ব্রহ্ম নন। সুতরাং আমরা যা

দেখি তা 'নেতি নেতি' রীতিতে অস্বীকার করেই ব্রহ্মকে শুধু নিষেধ মুখে নির্দেশ করা যেতে পারে।[৪২]

দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবনার তাৎপর্য্য

অদ্বৈতবেদান্তে ভেদ এবং অভেদ উভয়কে গ্রহণ করে কোন তত্ত্ব আলোচিত হয়নি। ভেদ এবং অভেদ উভয়েরই সত্যতা প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ এরা পরস্পর বিরুদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন 'নাভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যসেধামঃ ২/১/১৪ 'বেদান্তদর্শনের' সূত্রগুলি ভালোভাবে বিচার করলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, অধ্যাত্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে ধাপে ধাপে অদ্বৈত ভাবনায় নিয়ে যাবার জন্যই প্রথমে দ্বৈতভাবের উপদেশ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতি ইন্দ্রকে এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে বরুণ ভৃগুকে এইরূপেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু শিষ্যকে আচার্য ধাপে ধাপে উচ্চ হতে উচ্চতর সত্যের অনুভবের স্তরে নিয়ে যান। দ্বৈত ভাবনার মাধ্যমেই শিষ্য সত্যের চরমতম সত্য অদ্বৈত অনুভবে উপনীত হয়। শাস্ত্রে কোথাও দ্বৈতভাবনার প্রশংসা বাক্য নেই, এবং দ্বৈতভাবনায় কোন ফল হয় বলে ও বলা হয় না।[৪৩] পক্ষান্তরে দ্বৈতভাবনার নিন্দা সূচক উক্তিই শাস্ত্রে আছে — কঠ, বৃহদারণ্যক, মৈত্রিয়ীয় উপনিষদে :

> "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
> মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।।"
> "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ ।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ।।"
> "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।" (কঠ ২.১১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে — ৪.৪৯; মৈত্রিয়ীয় ব্রাহ্মণ ৪,২,৬) এগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্রে কখনও দ্বৈতভাবের প্রতিষ্ঠা করতে চান না। কিন্তু শাস্ত্রে অদ্বৈতভাবনার প্রশংসা আছে এবং অদ্বৈত জ্ঞান হতেই যে অমৃতত্ব লাভ করা যায় এই রূপ উক্তিই আছে। আবার শাস্ত্রে আমরা এরূপ উক্তিও পাই যে, আত্মা অণু হতে অণু, মহৎ হতে মহত্তর, স্থূল ও নয় সূক্ষ্ম ও নয় ইত্যাদি। কঠ (১.২.২০) এইসব শাস্ত্র বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই ব্রহ্মের দ্বৈতভাবকে অস্বীকার করে এবং অসীমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।[৪৪]

অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি দ্বৈতবাদিগণের আক্ষেপ

প্রথমতঃ জগৎ সম্বন্ধে আলোচনায় অদ্বৈতবাদীদের মত হল, অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতীতির হেতু, অজ্ঞাত নির্ব্বিশেষ বহ্মই তদ্রূপ জগৎ রূপে প্রতীতির হেতু।[৪৫] সেখানে আক্ষেপ, রজ্জুতেই যেমন বস্তুত কোন সর্প কোন কালেই থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে বস্তুত এই জগৎ কোন কালেই নেই।

অতঃপর দ্বৈতবাদীরা অদ্বৈতবাদীদের জগতের উৎপত্তির কারণ শুনে বলেন যে, একমাত্র অদ্বৈত বস্তু হতে কখন দ্বৈত বস্তুর উৎপত্তি হতে দেখা যায় না। মৃত্তিকা হতে ঘটোৎপত্তিতে মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, চক্র ও কুম্ভকার প্রয়োজন হয়। বিশুদ্ধ জল কাঁচের পাত্রে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রাখলে তাতে কীট শৈবালাদির আবির্ভাব হয় না। অন্য পদার্থ মিশ্রিত জলেই তাদৃশ বস্তুর জন্ম হতে দেখা যায়। অতএব এক অদ্বৈত নির্গুণ নিঃশক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম হতে এই জগৎ উৎপন্ন হতে পারে না।

অদ্বৈতবাদের মতে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" অর্থাৎ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হল। আর "জগৎ মিথ্যা" ও "জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়" বলা হয়। এই কথা শুনে দ্বৈতবাদী বলেন জগৎ মিথ্যা বললে এই মিথ্যা জগতের উৎপত্তি তাদৃশ অদ্বৈত বস্তু হতে কখনই সম্ভবপর হয় না, সেই অদ্বৈত বস্তু ভিন্ন মিথ্যার মূল কিছু না কিছু মানতেই হবে। অতএব "ব্রহ্ম সত্য জগৎমিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়"[৪৭] এমত সঙ্গত হয় না।

তাঁরা আরো আক্ষেপ করেন, জগৎ যখন সত্য বলে প্রত্যক্ষ হচ্ছে আর তদনুসারে ব্যবহার ও নিষ্পন্ন হচ্ছে। এবং সেই শিষ্ট ব্যবহার অনুরোধেই জগতের সত্যত্ব আপন্ন হয়। জগৎকে মিথ্যা বলা যায় না। এটাকে অনিত্য বলা যেতে পারে। তাছাড়া কোন একটা কিছু মিথ্যা বলতে গেলে তার সত্তা অন্যত্র স্বীকার করতে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প মিথ্যা বললে অরণ্যাদিতে তার (সর্পের) সত্তা স্বীকার করা হয়। সর্প বলে একটা কিছু না থাকলে আর তজ্জন্য সর্পজ্ঞান না থাকলে রজ্জুতে সর্পভ্রম কখনই হতে পারত না। অতএব ব্রহ্মে জগৎমিথ্যা বললে জগতের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তা হতে জগতের জ্ঞান হয় তৎপরে জগতের ভ্রম হয় বলতে হবে।[৪৮]

দ্বৈতবাদীরা আরো বলেছেন, বেদ বলেন, জগৎ মিথ্যা, সেই বেদকে সত্য বলতে হবে। বেদ যদি সত্য না হয় তা হলে তদ্বারা বেদ থেকে জগন্মিথ্যা কি করে বলা যায়। আমি নেই, যে ব্যক্তি বলে সে ব্যক্তি না থাকলে "সে নেই" এটা বলে কি করে ? অতএব জগৎ সত্য কিন্তু অনিত্য, মিথ্যা নয়। আর তজ্জন্য ব্রহ্ম ভিন্ন দেশ, কাল, জীবাত্মা, মন, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি নানা মূল বস্তু স্বীকার করা প্রয়োজন হয়।[৪৯] আর —

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।।"[৫০]

অর্থাৎ দুটি পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পাখি একই বৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদুফল ভক্ষণ করে। আর অন্যটি না খেয়ে কেবল দর্শন করে। এইরূপ বহুদ্বৈতবোধক অতিস্পষ্ট শ্রুতি আছে। সুতরাং এত দ্বারা দ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবাদী কর্তৃক উক্ত আক্ষেপের সমাধান

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বেদের উপদেশ অনুসারে জগৎ মিথ্যা যদি বলা হয় তা হলে বেদের সত্যতার প্রয়োজন হয় না। মিথ্যা দণ্ডদ্বারা মিথ্যা স্বপ্ন কি ভেঙ্গে যায় না ?

বেদ নিজে মিথ্যা হলেও সে সত্যতার জ্ঞাপক হতে পারে। সত্যবস্তুই সত্য উপদেশ দিতে পারে এমন কোন নিয়ম নেই।

বেদ নিজেই বলেছেন —

"অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ "[৫১]

এজন্য বেদ সত্য না হয়েও অর্থাৎ মিথ্যা হয়েও সত্যবাদী। অতএব বেদের উপদেশের সত্যতার দ্বারা তার নিজের সত্যতা এবং তজ্জন্য দ্বৈতের সত্যতা সিদ্ধ হয় না।

অদ্বৈতবাদীরা আরো বলেছেন যে, বলা হয়েছিল — যে বলে 'আমি নেই' সে নিজে না থাকলে আমি নেই বলে কি করে ? অতএব জীবভাব ও জগৎ কে মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না ইত্যাদি। কিন্তু একথাও সঙ্গত নয় । কারণ, সুযুপ্তি ও মুর্চ্ছা এবং এই জাগ্রদবস্থা দেখে আমাদের অজ্ঞান এবং আমাদের আমি ভাবকে অনিত্য বলতে পারা যায়। কারণ জাগ্রতে আমি ভাব থাকে, সুষুপ্তিতে তা থাকে না, সুষুপ্তিতে অজ্ঞান থাকে, জাগ্রতে তা থাকে না। অতএব এই জাগ্রৎ ও সুযুপ্তিকে প্রকাশিত যিনি করেন, তিনি নিশ্চয়ই নিত্যবস্তু। কিন্তু নিত্য বস্তুর নিত্যতার যদি আবার সন্দেহ হয়, তা হলে সেই সন্দেহ নিবারণের অন্য উপায় আর নেই। সেই সন্দেহ নিবারণ করে নিশ্চয় জ্ঞান উৎপাদন করে একমাত্র এই বেদ। অতএব যে আমি জগতের সত্যত্ব মিথ্যাত্ব বিচার করে, সে 'আমি' মিথ্যা হয় না। এ কথাও অসঙ্গত ।

এই আমিকে অথবা জগৎকে অসৎ বললে এই আশঙ্কা হোত। কিন্তু একে অসৎ বলা হয় না। একে মিথ্যা বলা হয় বলে এই রূপ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। যা অসৎ হয়েও প্রতীত হয়, তাই মিথ্যা। মিথ্যা ও অসৎ এক কথা নয়।[৫২]

দ্বৈতবাদীদের পুনরায় আক্ষেপ ও তার সমাধান

দ্বৈতবাদীদের মতে ঋক্ সংহিতা মধ্যে "বিশ্বং সত্যং" বলা হয়েছে। অতএব জগৎ মিথ্যা বলা অসঙ্গত । এজন্য শ্রুতিতে যে অদ্বৈতবোধক বাক্য আছে, তার তাৎপর্য দ্বৈতে।

আর তাৎপর্যানুবোধে যেমন লৌকিক স্পষ্ট বাক্যের অর্থ অন্যথা করা হয়। এই সকল অদ্বৈতবোধক শ্রুতি বাক্যেরও অর্থ তদ্রূপ অন্যথা করা আবশ্যক। "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে" এর অর্থঃ গঙ্গা তীরে ঘোষ বাস করে বুঝায় অর্থাৎ তাৎপর্যানুরোধে মুখ্যার্থের অন্যথা হয়। তদ্রূপ এই সব অদ্বৈততত্ত্ব বোধক বাক্যেরও অর্থ অন্যথা করতে হবে। অতএব দ্বৈতবাদই সমীচীন মত। অদ্বৈতবাদ সমীচীন নয়।[৫৩]

আরো কথা দ্বৈতবাদীরা মনে করেন আত্মা বা ঈশ্বর বিশ্বের শুধু নিমিত্ত কারণই, তিনি উপাদান কারণ নন কিন্তু তাঁদের এটা কথার কথা মাত্র, তত্ত্ব কথা নয়; কারণ তাঁরা নিজ অপ সিদ্ধান্তকে এইভাবে এড়াতে চান; তাঁরা বলেন বিশ্বে তিনটি বস্তুর সত্তা আছে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ এই অর্থেই বলা চলে যে, ঈশ্বর

ও সমগ্র বিশ্ব এক। কিন্তু চিরকাল ধরে প্রকৃতি ও বিভিন্ন জীব পরস্পর স্বতন্ত্রই থেকে যায়। কেবল কল্পারম্ভে তারা অভিব্যক্ত হয়। এবং কল্পান্তে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বীজাকারে থাকে।

সমাধানকল্পে অদ্বৈতবাদীরা জীব ও আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন। এবং উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশ স্বপক্ষে পেয়ে তারই উপর নিজেদের মত অতিদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলেন। 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রে ভাষ্যকার দেখিয়েছেন, সব উপনিষদেরই তাৎপর্য্য এক অদ্বিতীয় তত্ত্বে। যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে বিশ্বের সমস্ত মৃত্তিকাকে জানা যায়। তেমনি এমন কি আছে যা জানলে বিশ্বের সব কিছুই জানা যায় ? সেখানে অদ্বৈতবাদীগণের বক্তব্য হল, সমগ্র বিশ্বকে এমন একটি অনন্য সাধারণ তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া, যে তত্ত্বটি যথার্থই বিশ্বের সামগ্রিক সত্তা। তাঁরা দাবি করেন সমগ্র বিশ্বে এমন এক অসাধারণ ধর্ম (অখণ্ডসত্তা) রয়েছে, এবং এই সত্তাই নিজেকে এইসব বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করেছে। সাংখ্য যাকে প্রকৃতি বলেন, তাঁরা তার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতিই ঈশ্বর। মানুষ, জীব এবং যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর তাতে রূপায়িত হয়েছেন। মন ও মহৎ সেই এক সৎ এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে এতে অসুবিধা এই যে, এটা সর্বেশ্বরবাদ হয়ে দাঁড়ায়। যে বস্তুকে তাঁরা অপরিবর্তনীয় সৎ বলে স্বীকার করেন — যে চরম সত্যতার কোন পরিবর্তন নেই — তা এই পরিবর্তনীয় ও বিনাশশীল পদার্থে রূপায়িত হয় কেমন করে।[৫৪]

এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা আপাত পরিবর্তনবাদ বলে একটা মত আছে। দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের সবকিছুই মূল প্রকৃতির অভিব্যক্তি। একদল অদ্বৈতবাদী ও একদল দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদীর মতে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বর হতে উদ্ভূত হয়েছে। শঙ্করপন্থী খাঁটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর হতে উদ্ভূত বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। ঈশ্বর বিশ্বের উপাদান কারণ, কিন্তু সত্যই তা নন, উপাদান বলে প্রতীত হন মাত্র। এ বিষয়ে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। রজ্জুকে সর্প বলে মনে হয়েছিল মাত্র, রজ্জু কখন ও সর্পে পরিণত হয় নি। ঠিক তেমনি এই প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই সেই সৎ স্বরূপ এতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। আমরা যে সব পরিবর্তন এতে দেখি, সেগুলি আপাত প্রতীয়মান। দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই পরিবর্তন ঘটায় অথবা মনোবিজ্ঞানের উচ্চতর সামান্যীকরণ অনুসারে বলা যায় যে, নাম ও রূপের দ্বারাই এটা ঘটে। নাম ও রূপ দিয়েই আমরা একটি পদার্থকে অপরটি হতে পৃথক বলে বুঝি। নাম এবং রূপই পার্থক্যের সৃষ্টি করে; আসলে সবই এক, অভেদ।[৫৫]

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ বলে কিছু নেই এবং সৃষ্টির মূলে একটি সত্তা আছে, শুধু আর্য বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য, জগৎ বলে কিছু নেই। রজ্জু সর্পে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয় মাত্র, এটা সত্য পরিবর্তন নয়; যখন ভুল ভেঙে যায় তখন সর্প শূন্যে লীন হয়; মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সে সৃষ্ট জগৎই দেখে,

ঈশ্বরকে দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তখন তার কাছে জগৎ একেবারেই লোপ পায়, এই ভ্রমকে 'অবিদ্যা' বা 'মায়া' বলা যায়। এটাই এই সৃষ্টির কারণ, এটারই প্রভাবে চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলে আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্ব হীন কিছু নয়। সৎ ও নয়, অসৎ ও নয় — এটাই মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে একথাও বলা চলে না, আবার নেই একথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 'সৎ' বলা যেতে পারে; সেদিক দিয়ে দেখলে মায়া অসৎ একথাও বলা যায় না; কারণ তা যদি অসৎ হোত, তবে এটা কখনও জগৎ সৃষ্টি করতে পারত না। কাজেই এটা এমন একটা কিছু যা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্তদর্শনে একে অনির্বচনীয় অর্থাৎ স্বরূপতঃ প্রকাশের অযোগ্য বলা হয়েছে।[৫৬]

মায়াই এই বিশ্বের আসল কারণ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বব যে মায়াকে উপাদান রূপে গ্রহণ করেন, মায়া তাতে নাম ও রূপ দেয়; তখন উপাদানই এই সব কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীর কাছে জীবাত্মভাব মায়ার সৃষ্টি। যদি সর্বব্যাপী একটি মাত্র সত্তা থাকে তবে আমি একটি সত্তা, তুমি একটি সত্তা; সে একটি সত্তা — ইত্যাদি কিরূপে সম্ভব ? আমরা সকলেই এক; দ্বৈতজ্ঞানই অনর্থের মূল; বিশ্ব হতে আমি পৃথক — এই বোধ যখনই হতে শুরু করে, তখনই প্রথমে আসে ভয়, (দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি)[৫৭] এবং তারপর আসে দুঃখ, যেখানে একে অপরের কথা শোনে, একে অপরকে দেখে, তা অল্প।[৫৮] "যেখানে একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা শোনে না — যেটা ভূমা, তাই ব্রহ্ম। সেই ভূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নেই 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"[৫৯] কাজেই অদ্বৈতবাদীদের মতে, এই পৃথকীকরণ, এই সৃষ্টি যেন সাময়িকভাবে বস্তুর যথার্থ স্বরূপের আবরণের ফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে না নিম্নতম কীট এবং উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিদ্যমান।[৬০]

উপসংহারে বলা যায় — অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের মত এই যে, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু, গ্রহ নক্ষত্রাদি যা কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখছি, এ সমস্তই অবিদ্যাবৃত ব্রহ্মবস্তু। সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই পূর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, এবং এই বহু হয়েছেন। তাই বলা যায় যে, চৈতন্যস্বরূপ দেবতা আমাদের অন্তঃকরণে সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, যাঁর সত্তাকে আশ্রয় করে আমরা জীবিত আছি, তিনি ব্রহ্ম। "সেই ব্রহ্মই আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ এবং সেই ব্রহ্মই আমাদের সকলের প্রকৃত আমিত্ব"[৬১] সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখা আবার আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা — এটাই অদ্বৈতবাদের মূলকথা। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈতবাদও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আছে। দ্বৈতবাদকে বাদ দিয়ে অদ্বৈতবাদ সম্ভাবিত হতে পারে না। তেমন অদ্বৈতবাদকে বাদ দিয়েও দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুতঃ এই দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবটি যে পর্যন্ত সাধক উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন, ততদিন তিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন

না।[৬২] ভগবান্ শিব বলেছেন —

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে ।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।।"[৬৩]

অর্থাৎ কেউ কেউ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেউ দ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু তাঁরা উভয়েই সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পর্ণ অদ্বৈত এই উভয়ই বর্জিত তাঁরা ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাতনন। সুতরাং যখন জীব সর্বভূতে এক আত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করেন এবং এক আত্মায় সর্ব ভূতের অস্তিত্বকে অনুভব করেন তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বলে বুঝতে পারেন। আপনাকে এইরূপে ব্রহ্ম বলে নিশ্চয় করতে সক্ষম হওয়ার ফলেই সমস্ত বন্ধন তিরোহিত হয়। এরই নাম মুক্তি।[৬৪]

১। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড । পৃঃ ৩১০-৩১১
২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ। ১ম খণ্ড । পৃঃ ১৪৩ (রামকৃষ্ণের নিজস্ব উক্তি)
৩। বেদান্তদর্শন, ভূমিকা পৃঃ - ২৭
৪। ঐ, ভমিকা পৃঃ ৩৭
৫। বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা - ৭৪৫
৬। ভারতকোষ, পৃঃ- ৪৫
৭। যো. বা. স্থিতিপ্রকরণ ।
৮। মুক্তি এবং তাহার সাধন । পৃঃ ১৮
৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন। পৃঃ- ১৮৬
১০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন, পৃঃ- ১৮৭
১১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন, পৃঃ- ১৮৮
১২। বিবেক চূড়ামণি, পৃঃ- ২৭২, শ্লোক সংখ্যা - ৪০৫
১৩। মার্কণ্ডেয় উপনিষদ্। ১/১৬
১৪। ঐতরেয় উপনিষদ্ ১/৩/১২
১৫। ঐ ২/১/৫-৬ (গৌড়পাদ)
১৬। ঐতরেয় উপনিষদ্ ২/১৯
১৭। ঐ ২/৩৩
১৮। মার্কণ্ডেয় উপনিষদ্ ২/৩১
১৯। ঐতরেয় উপনিষদ্ ২/৩৪-৫
২০। ঐতরেয় উপনিষদ্ ৩/৩০; ৪/৬২
২১। মার্কণ্ডেয় উপনিষদ্ ৩/৩১, ১
২২। মার্কণ্ডেয় উপনিষদ্ ৪/৭২, ১
২৩। ঐতরেয় উপনিষদ্ ৪/৭২. ২ যাজ্ঞবল্কের বচন,
২৪। ঐ ৪/৭৭
২৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সংকলন । পৃঃ- ১০৮
২৬। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সংকলন, পৃঃ- ১০৯
২৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড। পৃঃ- ৩৫

২৮। The complete works. Vol. 2. P. 78
২৯। বেদান্তদর্শন, প্রথম খণ্ড, ভূমিকাংশ পৃঃ- ৩৭
৩০। উপনিষদ - মার্কণ্ডেয় - ৭
৩১। কেনোপনিষদ্ - ১/১/৩
৩২। মুণ্ডকোপনিষদ্ - ৩/১/৮
৩৩। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ - ২/৪/৩৬
৩৪। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ - ২/৫/১৯
৩৫। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৩/১৪/১
৩৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ - ৭/২৪/১
৩৭। মুণ্ডকোপনিষদ্ - ২/১/১১
৩৮। মার্কণ্ডেয় ৪/২২
৩৯। ঐতরেয়োপনিষদ্ - ৪/৭১
৪০। মার্কণ্ডেয় ৪/৫৮
৪১। ঐতরেয় উপনিষদ্ ভাষ্য।
৪২। ব্রহ্মসূত্র, পৃঃ ৩০ (ভাষ্য)
৪৩। ব্রহ্মসূত্র, পৃঃ- ৩০ (ভাষ্য)
৪৪। কঠোপনিষদ্ ২/১/৪, ২/১/১০, ২/১/১১
৪৫। ব্রহ্মসূত্র, পৃঃ- ৩১
৪৬। মার্কণ্ডেয় উপনিষদ্। ২/১৭
৪৭। ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী মালা শঙ্করাচার্য শ্লোক সংখ্যা - ২১
৪৮। বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ৭৪৫
৪৯। বিশ্বকোষ, পৃঃ- ৭৪৬
৫০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ - শ্লোক সংখ্যা ৬০
৫১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৪.৩.২২)
৫২। বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড - ৭৫৮
৫৩। বিশ্বকোষ - ৭৪৬
৫৪। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষ, পৃঃ- ১১
৫৫। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষ ১৩৬৯ পৃঃ- ১২
৫৬। উদ্বোধন ৬০ তম। ১৩৬৫ পৃঃ- ৩১৫
৫৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ — ৩/২
৫৮। উদ্বোধন ৭৮ তম ১৩৮২ পৃঃ- ৫৯
৫৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭,২৩/১
৬০। উদ্বোধন ৭৮ তম, পৃঃ- ৬০
৬১। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ — ২/৬
৬২। মুক্তি ও তাহার সাধন । পৃঃ- ২২
৬৩। কুলার্বণ তন্ত্র ৫/১/১১০
৬৪। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২/৬

অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ

শত শত বৎসরের প্রচেষ্টায় বুদ্ধিজীবী মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় আবিষ্কৃত হয়েছে ঈশ্বরবিষয়ক বা পরমাত্মাপ্রাপ্তিবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে আচার্য্যপ্রবর ভগবান্ শঙ্করের প্রচারিত অতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদ্বৈততত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। এবং সেই দাবি নিঃসন্দেহে সুধীসমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যদিও বহু বৈদান্তিক আচার্য মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় নির্ণয় প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বহু সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন, তথাপি অপরাপর মত সকল ক্রমে ক্রমে আপন আপন সত্তা হারিয়ে অদ্বৈত বেদান্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়েছে। যে অদ্বৈততত্ত্ব সত্য যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত, ত্রেতা যুগে বশিষ্ঠদেব, শক্তি ও পরাশরকর্তৃক বিধৃত এবং দাপর যুগে ব্যাসদেব ও শুকদেবকর্তৃক লালিত হয়েছিল, সেই অদ্বৈততত্ত্ব গৌড়পাদাচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ পাদাচার্য্যের নিকট হতে কলিযুগে ভগবান্ শঙ্করাচার্যকর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে, বর্ধিত বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাবোধমুখী অদ্বৈতবাদ অধুনা সমগ্র বিশ্বে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এবং অপরাপর সম্প্রদায়গুলি এই অদ্বৈতবাদের অনুকরণে স্ব স্ব মতবাদ তৈরি করার প্রয়াস নিচ্ছে।[১]

অদ্বৈতবাদই সকল ধর্মমতের ভিত্তি স্বামীজির মত

বর্তমান সময়ে যে ধর্মভাব দিন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, তার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ কালের নানা গতিতে উদ্ভূত হয়েছে তারা সকলেই সেই এক অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতি ও অনুসন্ধানেই সচেষ্ট। জাগতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই এই একটি ভাবই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মতবাদ- সমূহ ক্রমেই উদার হতে উদারতর হয়ে সেই শাশ্বত অদ্বৈততত্ত্বের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেগুলি বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অপূর্ব ঐক্যবাহী অদ্বৈতবাদের প্রতিরূপ, আর মানব আজ পর্যন্ত যত প্রকার একত্ববাদের দর্শন আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই সর্বোত্তম।[২]

স্বামীজি বলেছেন, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডের ইতিহাস আমি অবগত আছি, সেইসব দেশে বর্তমান সময়ে এইরূপ নানাবিধ মতবাদের সংঘর্ষ চলছে। আর ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদ এখন ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে, কেবল অদ্বৈতবাদই সর্বক্ষেত্রে বলবান্। আমেরিকাতেও বহু মতবাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য সংঘর্ষ হচ্ছে। এদের সবগুলিই অল্প বিস্তর অদ্বৈতভাবেরই অন্য ভাবে অভিব্যক্তি। আর যে ভাবপরম্পরা যত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে সেইগুলি অদ্বৈতবাদের তত বেশি অনুরূপ বলে প্রতীত হচ্ছে। স্বামীজি আরো বলেছেন, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, অন্য সব মতবাদগুলিকে গ্রাস করে ভবিষ্যতে

একটি মতবাদ মাথা তুলে দাঁড়াবে আর সেটি হচ্ছে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈতবাদই যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের একমাত্র অবলম্বন বলে বিবেচিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আবার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই জয়লাভ করবে, যারা জীবনে সর্বজনীন ভাবনার চরম উৎকর্ষ দেখাতে পারবে।[৩]

স্বামীজির দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ

অদ্বৈতবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি; প্রথমতঃ বিশ্ব অবিমিশ্রভাবে এক। তাতে একটি মাত্র সত্তা থাকেন এবং তিনি হলেন ব্রহ্ম বা আত্মা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু ও নানা বস্তু সমন্বিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয় তা ভ্রান্ত, সে জগৎ ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাকে বহুরূপে দেখি। তৃতীয়তঃ এই ব্রহ্ম চিৎ শক্তি বিশিষ্ট। বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তায় এগুলি ব্যাখ্যা হয়েছে।[৪]

স্বামীজি 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতায় বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ খ্যাপন করে। কবিতার অংশটি হল এই ঃ

একমাত্রমুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়;
তাহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া।[৫]

এই উক্তিটির মধ্যে অদ্বৈতবাদের তিনটি মূলতত্ত্বই পাওয়া যায়। বিশ্বে আছেন একটি মাত্র সত্তা, তিনি হলেন আত্মা। তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তাঁর নাম নেই, রূপ নেই, তিনি অখণ্ড সর্বব্যাপী বহু ও নানা রূপে জ্ঞাতারূপী যাকে দেখি তা তাঁরই ঔপাধিক রূপ । তা মায়ার রচনা, তা স্বপ্নের মত অলীক। এই কথাগুলি স্বামীজি সংক্ষেপে অন্যত্র এই ভাবে বলেছেনঃ "অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁর কখন পরিণাম হয় না, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হচ্ছে মাত্র। এটির উপরে নাম রূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন চিত্র অঙ্কিত করেছেন।[৬]

অতঃপর বলা যায়, অদ্বৈতবাদের অবিমিশ্র একত্বকে আশ্রয় করে সর্বজনে প্রীতি ও সর্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগের একটি আদর্শ গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদে যিনি দীক্ষিত তাঁর স্বার্থবোধ নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁকে বিশ্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।[৭]

স্বামীজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অদ্বৈতবাদ একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। সুতরাং এই সত্য বা তত্ত্ব সকলেরই জানা প্রয়োজন। আর তার দ্বারাই কেবলমাত্র জগতের বা সমাজের পাপ, দুর্বলতা, কুসংস্কার ভয় দূর হয়ে কিছু উন্নত হওয়া সম্ভব। তাই স্বামীজি তারস্বরে ঘোষণা করেছেন "আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হবে। বরং এটা বিশ্বাস

করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অদ্বৈতবাদই দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করবার একমাত্র ঔষুধ।[৮]

অদ্বৈতবাদের আর একটা বিশেষত্ব এই, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অন্য ধর্ম বা অন্য মতকে কখনো ভেঙে চুরে ফেলার চেষ্টা করে না, অন্য মতকে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের উৎকর্ষ বিধান করে। এই ভাব প্রচার করা মহা সাহসের কার্য

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।।[৯]

জ্ঞানীরা অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি ভেদ জন্মাতে দিবেন না, বিদ্বান ব্যক্তি নিজে যোগযুক্ত থেকে তাদেরকে সকল প্রকার কর্মে যুক্ত করাবেন। অদ্বৈতবাদ এটাই বলে যে, কারও বুদ্ধি বিচলিত করো না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হতে উচ্চতর পথে যেতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদীরা আরো বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। আর স্বামীজি ভগবানের তিনটি স্বরূপের কথা বলেন — অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; এই তিনটিই এক তত্ত্বেরই বাচক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখনও থাকতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকতে পারে না।[১০] স্বামীজি আরো বলেছেন, স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদী (মীমাংসক) উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করে থাকেন, জীবাত্মাগণ সেই স্বর্গে চিরকাল দেবতাদের সঙ্গে বাস করেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এই স্বর্গ কখনো আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। অপরিসীম দেহশূন্য ভাবই আমাদের চরম লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ কখনো সসীম হতে পারে না, অদ্বৈতবাদের মতে এটা প্রাপ্য নয়, এটা নিত্যপ্রাপ্ত স্বাভাবিক। আমরা আমাদের এই সত্তাকে ভুলে যাই ও এটিকে অস্বীকার করি, এটি তো আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এটিকে বাদ দিলে পূর্ণতা হয় না। কিন্তু পূর্ণতাই আমাদের একমাত্র কাম্য। আর এর জন্যই প্রয়োজন অদ্বৈত তত্ত্বভাবনা।[১১]

অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উৎকর্ষ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, অদ্বৈতবাদ যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর অন্য মতবাদ সেরূপ কিছু করতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদেরকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে আর অন্য মতবাদ সেরূপ কিছুই করতে পারে না।[১২]

স্বামীজি আরো একটি অতি সারগর্ভ মনোজ্ঞ কথা বলেছেন। সেটি হল, অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত যুক্তি ও অভিযোগ তার সার কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ কোন প্রকার ইন্দ্রিয় ভোগ বা আস্বাদনকে স্থান দেয় না।

বস্তুতঃ যাঁরাই কোনও ভাবে দ্বৈত বা জগৎ প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন, তাঁরাই জগতের প্রতি পূর্ণ আস্থাহেতু ভোগবাদকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন। অন্ততঃ পরমতত্ত্বের আস্বাদনের জন্য ঈশ্বরের বিগ্রহ ও রূপাদি কল্পনা করে একপ্রকার সূক্ষ্ম ভোগকেই সমর্থন করেন।[১৩]

অদ্বৈতবাদ সকল ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি

অদ্বৈতবাদই সকল নীতি ধর্মের মূল — এ সত্যটি বিবেকানন্দ দেশ বিদেশে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। সকলের মধ্যে এক আত্মার অস্তিত্ব কল্পনাই সকল নীতি ধর্মের মৌলিক কথা। অহিংসা, প্রেম, সেবা, সহানুভূতি প্রভৃতি যে ধর্মের মূল ভিত্তি — এই ভাবনার বীজ বা স্পষ্ট ইঙ্গিত উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতায় থাকলেও সেটিকে এত দৃঢ় ভাবে বিবেকানন্দের পূর্বে আর কেউ ঘোষণা করেননি।

বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ এই অদ্বৈতবাদ হতেই আমরা যেরূপ নীতির মূলভিত্তি পাই; আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি, আর অন্য কোন মত হতে আমরা এরূপ কোন নীতিতত্ত্ব পাই না।[১১] এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, সকল ধর্মেই অবশ্য নীতি ধর্মের শাস্ত্রীয় আদেশ আছে, কিন্তু তা সর্বজনীন নয়। কেননা, অপর ধর্মাবলম্বীরা সে আদেশকে সেভাবে মানেন নি। আবার পাশ্চাত্য নীতি দর্শনে নীতি ধর্মের ভিত্তি ও লক্ষণ নিরূপণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ববাদিসম্মত কোন ভিত্তি বা লক্ষণ নির্ণীত হয় নি। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব নীতিধর্মের সর্বজনীন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ। অপরকে আঘাত বা হিংসা করবে না, কারণ সে তোমা হতে অভিন্ন। অপরের ক্ষতি করলে তা দ্বারা তুমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিবেকানন্দ অন্যত্রও বলেছেন ঃ যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য জাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতি বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করছে। অনাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও অনন্ত আত্ম তত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হতে পারে ? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি সে সকলে এক — ভারতীয় দর্শনের এটাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম একত্ব বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। বেদান্তের অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। অন্যান্য মতবাদ নীতিশিক্ষা দিতে পারে কিন্তু নীতি শিক্ষার কারণকে নির্দেশ করতে পারে না। সেটি এই অদ্বৈতবাদই পারে। এ সম্পর্কে স্বামীজির মতটি পূর্বেই আমরা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। এখানেও অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ খ্যাপিত হয়েছে ।[১২] সুতরাং অদ্বৈতবাদই নীতি শাস্ত্রের মূল ভিত্তি এই ঘোষণাটি বিবেকানন্দের একটি বেদান্তভিত্তিক মৌলিক চিন্তা বলা যেতে পারে।

সকল বিভেদ প্রতিরোধে অদ্বৈতবাদ

অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য স্বামীজি একেশ্বরবাদের কথা ও জাতি শ্রেষ্ঠত্ববাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বামীজির মতে ভারতবর্ষের মহান আদর্শ হচ্ছে 'ব্রাহ্মণত্ব' লাভ। ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াসের মধ্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের বীজ লুকিয়ে আছে। অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেছে এবং এর অধিকারীও হয়েছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য লাভই সকলের একমাত্র কাম্য সেকথা স্বামীজির দৃষ্টিতে সত্য থেকে সত্যতর হয়ে উঠেছে । ব্রাহ্মণত্ব ভাবনা একমাত্র ভারতবর্ষেই ঘটেছে। ব্রাহ্মণত্ব লাভের পূর্বে অবশ্য ক্ষাত্র আদর্শের ভিতর দিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ধর্মপ্রবণ ক্ষাত্র দৃষ্টি থাকলেই

তবে মহান 'ব্রাহ্মণত্ব' রূপ আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব, অন্যথা ক্ষাত্র শক্তি মনুষ্য মাত্রকে বিপথগামী ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে। স্বামীজির মতে স্বৈররাজতন্ত্র বা একেশ্বরবাদের পুনর্বিকাশ ভারতবর্ষে আর সম্ভবপর নয়। এই একেশ্বরবাদের সর্বাপেক্ষা ক্রটি হল নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে সকল জাতি এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তারা অল্প কালের জন্য উন্নতি লাভ করে অতি দ্রুত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ স্বৈর একেশ্বরবাদের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই স্বৈরতন্ত্রের অবসান আর্য শাস্ত্র বেদেরই কাম্য "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"[১৬]— বিভিন্ন রুচির মনুষ্য সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই বহু নামে উপাসনা করেন। এই উদার ঘোষণার ফলে সকল ধর্মমত অনুসরণকারিগণ ক্রমশঃ শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত তত্ত্বানুভূতি রূপ লক্ষ্যে উপস্থিত হবার সুযোগ লাভ করলেন। সর্ব প্রকার বিরোধের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান একমাত্র অদ্বৈতবাদেই সম্ভব হল। অদ্বৈতবাদ কোন ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি নয়, এটা সকল মানবেরই চরম আদর্শ। আর এই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করলে যাবতীয় পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ ঘটে থাকে।[১৭]

অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষের কথা মহাপুরাণগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছে। মহাপুরাণের মতে বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদই বেদের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান। শিব, পদ্ম, কূর্ম, অগ্নি, বিষ্ণু, ভাগবত, দেবী ভাগবত, গরুড়, স্কন্দ, নারদ এবং লিঙ্গ — এই সকল মহাপুরাণে অদ্বৈতবাদই নানাভাবে প্রকটিত হয়েছে। জগন্মিথ্যাত্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক সিদ্ধান্তগুলি উক্ত পুরাণগুলিতে নানা স্থানে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রেম ও ভক্তির সমন্বয় অদ্বৈতত্ত্বে

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভগবদগীতা প্রভৃতি বেদান্তের শ্রুতি ও স্মৃতি প্রস্থানের চরম সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করেছেন। তিনি মনে করতেন প্রেম - ভক্তিই অদ্বৈতত্ত্ব উপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে যে, "যাঁরা সেই ঈশ্বরে পরাভক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁদের নিকটেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়।[১৮] ভগবদ্গীতাতেও কথিত হয়েছেঃ "ভক্তির দ্বারা আমি তত্ত্বতঃ যা এবং যতখানি তা (সাধক) জানতে পারে, এই রূপে তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।[১৯] কৈবল্যোপনিষদে উপাসনাকে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপায় বলা হয়েছেঃ "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি"[২০] — অর্থাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগের দ্বারা তাঁকে জ্ঞাত হও। ভক্তিবাদ অবৈদিক বা বহিরাগত — এরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "ভক্তির কথা অতি প্রাচীন উপনিষদ্ সমূহেও রয়েছে; ঐ উপনিষদগুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যেও ভক্তির বীজ রয়েছে। ভক্তি ও প্রেমের চরম পরিণতি যে অভেদানুভব বা একত্বানুভূতি, বিবেকানন্দ তা দৃঢ়ভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রেম সত্য, কারণ এটি মিলনকারক, কিন্তু ঘৃণ্য কারণ এটি বহুত্বের ভাব আনে — পৃথক করে। প্রেমে মিলায় প্রেম একত্বসম্পাদক।[২১] এই সকল

আলোচনা নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করে।

অদ্বৈতবাদের সমালোচকরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, যখন অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং সকল প্রকার ভেদ অসত্য বা মিথ্যা, তখন সৎ ও অসৎ এবং পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদও মিথ্যা হবে। এরূপ হলে অদ্বৈত মতকে সমাজের অহিতকারী বলতে হবে। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক দৃষ্টি ভেদকে অপলাপ করে এরূপ আপত্তি করা হয়েছে। সেখানে সমাধাতার বক্তব্য এই, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদও মিথ্যা হবে। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ, তথা অন্যান্য ভেদ যথার্থ। বদ্ধ পুরুষের পক্ষে যে কর্ম ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব উপলব্ধির সহায়ক তা সৎ, যেমন সত্য, নিষ্ঠা, দয়া, দান, সংযম ইত্যাদি কর্ম। পক্ষান্তরে যে সব কর্ম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এর বিঘাতক বা বিঘ্নকারী তা অসৎ। যেমন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি। সত্য, নিষ্ঠা, দয়া, দান, সংযম প্রকৃতি সৎ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বের উপলব্ধি হয় ও দেহাত্মবুদ্ধি অপগত হয় এবং তার অপগমে স্বার্থপরতা হিংসা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিও দূরীভূত হয়। রাগ ও দ্বেষ হতেই অসৎ বা পাপ কর্মের উৎপত্তি হয়। এইভাবে এখানে উক্ত বিরুদ্ধ ভাবনা নিরস্ত হয়।

অদ্বৈতবাদের সম্ভাব্য আপাত দোষ সত্ত্বেও শাঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তকে ঔপনিষদ্ উপদেশের সর্বাধিক সঙ্গত ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করতে হবে। 'উইলিয়াম জেমস্' অদ্বৈতবাদকে সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ বলে সমাদর করেছেন । কিন্তু এটা অবশ্য সকল ব্যক্তির অনুমোদিত নয়। যে সব ব্যক্তির নিকট সংসারই সারবস্তু এবং ঐহিক সুখ ভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তাঁরা অদ্বৈতবাদকে সমাদর করতে পারবেন না। কিন্তু যে কতিপয় সুকৃতিসম্পন্ন ধীমান্ ও বৈরাগ্যবান্ পুরুষ জগতের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করে নিত্য অজর ও অমর আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানার্জনে দৃঢ়সংকল্প, তাঁদের নিকট অদ্বৈতবাদের অতুলনীয় মহিমা সুপ্রকাশিত।[২২]

বিজ্ঞান ও ধর্মে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য

স্বামীজি অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়, এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন এর সার্থকতা উপলব্ধ হয় । কারণ এই বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। যথা রসায়নশাস্ত্র এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যা হতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যাও এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করতে পারে, অন্যান্য শক্তি যার রূপান্তর মাত্র। ধর্ম বিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করছে যখন বৈচিত্র্যের মধ্যে এক পরমসত্তার অনুভূতি হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।[২৩]

তবে স্বামীজি যা বলতে চেয়েছেন তা হল জড়বিজ্ঞানের যা চরম লক্ষ্য এবং

ধর্ম বিজ্ঞানও চরম লক্ষ্য, অদ্বৈতবেদান্তেরও চরম লক্ষ্য তাই। বিভেদের মধ্যে একত্বকে সর্বত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদে পৌঁছাতে হলে সোপানারোহণন্যায়ে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়েই যেতে হবে। এক পদার্থই সত্য, অন্য দৃষ্টিতে চিৎ ও অচিৎ দুই-ই সত্য, আর এক দৃষ্টিতে চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট একই সত্য এবং সর্বশেষে শুধু চিৎ বা চৈতন্যই সত্য। এই চৈতন্য সর্বানুগত নিরতিশয়। এটি আনন্দেরই সৎ স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সুষুপ্তিতে সৎ-চিৎ আভাস পাওয়া যায়, সাধক নির্বিকল্প সমাধিতে এই অখণ্ড আন্তর জ্যোতিকে উপলব্ধি করেন।[২৪]

অন্যমতের অবিরোধী অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ

বেদান্তের দৃষ্টিতে স্বামীজি আরো বলেছেন, "মানুষ ভ্রম হতে সত্যে গমন করে না। পুরন্তু সত্য হতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হয়। অতএব এই দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সবই সত্য। স্বামীজি এগুলির কোনটিকেই অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন অদ্বৈতবাদে উচ্চতর সত্য লাভ করা যায়। আর অন্যান্য মতবাদ গুলি উচ্চতর সত্যে না থেকে নিম্নতর সত্যে বর্তমান আছে।[২৫]

তবে আমরা অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষের কথা স্বামীজির কয়েকটি ভাষণ হতেও জানতে পারি। স্বামীজি একটি ভাষণে বিদেশী খ্রীষ্টানগণের কাছে যুক্তির অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে বলেছেন যে, যুক্তিই একমাত্র সার্বভৌম মীমাংসক। অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত মতবাদ। তাই যুক্তির গুরুত্ব প্রদান করে দৃঢ় করতে না পারলে তাদেরকে অদ্বৈতবাদ বুঝানো ও গ্রহণ করানো যাবে না।[২৬]

স্বামীজির অপর একটা ভাষণেও আমরা অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের কথা জানতে পারি, তবে আগের ভাষণে যেমন আমরা ধর্মের কথা জানতে পারলাম, সেরূপ এখন আমরা জানতে পারি স্বামীজির মতে বিজ্ঞান ও দর্শনের অবিরোধের কথা।

স্বামীজি মনে করেন, দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব মহৎ ভাব আছে। আমাদের উপাস্য প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদ অতি অপূর্ব, অনেক সময় এগুলি প্রাণ শীতল করে দেয়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিং-এর নেশার মতো অস্বাভাবিক। এটা দুর্বলতা আনয়ন করে, দ্বৈতভাবনায় অভয় পদপ্রাপ্তি সম্ভব নয়।[২৭] কেন না বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মুমুক্ষু জনের হিত কামনায় উপদেশ করেছেন — "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।"[২৮] সুতরাং উপাসনায় দ্বৈতবুদ্ধি (উপাস্য উপাসক ভাব) থাকে, অদ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। কিন্তু একত্ব বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত দুঃখ নাশ হয় না। এ বিষয়ে হিতকারিণী শ্রুতির উপদেশ —

"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"[২৯]

অতএব একত্ব দর্শনে মুমুক্ষুর সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নাশ হয়। এই কারণে শাস্ত্রকাররা উপাসনাকে দুঃখ নাশের হেতু বলেননি। আর উপাস্য দেবতাকে প্রকৃত ব্রহ্ম বলেন নি। কেনোপনিষদে শ্রুতির উপদেশ এই —

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"[৩০]

স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণে শ্রৌত অদ্বৈতবাদকে উৎকৃষ্ট মনে করে তাঁর অনুপম বাণী রচনায় বিশেষ ভাবে এর গুণগান করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয় যে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাসনার স্থান না থাকলেও ব্যাবহারিক কালে উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধ্যান, ধারণা অত্যন্ত উপযোগী। আর চিত্তশুদ্ধি না হলে চিত্তে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাতরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি ও মোক্ষের অভিব্যক্তি আকাশে মুষ্টি হননের ন্যায় নিষ্ফল প্রতিভাত হয়। চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তত্ত্ব দর্শন হয় না।[৩১] তা স্বয়ং উপনিষদ্ উল্লেখ করেছেন—

"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা।"[৩২]

কাম-ক্রোধাদি-বিবর্জিত শুদ্ধ অন্তঃকরণেই ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন। অতএব শুদ্ধ অন্তঃকরণই তত্ত্বদর্শনের সাধন। একথা গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন —

"সংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্ ।।"[৩৩]

অতএব মোক্ষের অভিব্যক্তিতে তত্ত্বোপলব্ধি অনন্য সাধন এবং তত্ত্বের উপলব্ধিতে চিত্তের শুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। আর এই চিত্তশুদ্ধির জন্য উপাসনা ও ভক্তির প্রয়োজন। উপাসনা ও ভক্তির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়। বিষয় চঞ্চলস্বভাব চিত্তকে চঞ্চলতর করে তোলে। আর চঞ্চল চিত্তে ব্রহ্ম প্রতিফলিত হতে পারে না। এই কারণে চিত্তকে আগে বিষয়- মুক্ত করতে হবে। তবেই চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবপর হবে। নিষ্কাম কর্ম ও ধ্যান ধারণার মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও বিষয়বিমুক্ত হয় এবং নির্বিকল্প সমাধিতে সাধকের অখণ্ড ব্রহ্মাকার বুদ্ধি হয়। সুতরাং উপাসনার চরম স্তরে দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না। উপাস্য ও উপাসক এক হয়ে যায়। এরূপ ভক্তি যদিও ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈতবুদ্ধিসাপেক্ষ তথাপি ভক্তির পরাকাষ্ঠায় ভক্ত সর্বজীবে ভগবদ্‌ভাব অনুভব করেন। তাই উপাসনা ও ভক্তি উভয়েই অন্তে একান্তভাবে অদ্বৈতবাদকেই উপস্থাপন করে। সুতরাং অদ্বৈতভাবনা ছাড়া কোন ভাবনাই সফল হতে পারে না। এই ভাবে অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষ প্রকটিত হয়। ধুরন্ধর বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী তাঁর প্রস্থান- ভেদ গ্রন্থে দ্বৈতাদি সমস্ত মতবাদই যে অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত তা সুষ্ঠু প্রতিপাদন করেছেন। অধিকারীভেদে নাস্তিক্য বুদ্ধিনাশের জন্য নানা মতের প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু নাস্তিক্য বুদ্ধির নাশ হলে সকলেরই লক্ষ্য হয় মোক্ষ । আর সেই মোক্ষ নিত্য নিরতিশয় ভূমানন্দ স্বরূপ। শাস্ত্রে তাকে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়েছে।[৩৪] ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট হয়েছে —

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"[৩৫]

এই দৃষ্টিতে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'[৩৬] ইত্যাদি অদ্বৈতবাদে পর্যবসান হওয়ায় অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষে সকল মতবাদের মধ্যে বস্তুত কোন বিরোধ নেই। এখানেই অদ্বৈতবাদের চরম উৎকর্ষ। আচার্য শঙ্করের মতে উপাসনা ব্যাবহারিক হওয়ায় ও মুক্তি পারমার্থিক হওয়ায় উভয়ের বিরোধ অসম্ভব। কেননা বিরোধ সর্বত্র একই বিষয়ে হয়। আর মুক্তি যেহেতু অতি দুরূহ সেহেতু সোপানারোহণ ন্যায়ে অবস্থা ও অধিকার ভেদে

নানা দেবতার ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হয়েছে। কঠিন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে নানা সাধনার মধ্য দিয়ে মুমূক্ষুকে অগ্রসর হতে হবে। এ কারণে শাস্ত্রে কর্মযোগ, যম ও নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তিযোগ, অভ্যাসযোগ প্রভৃতি সাধনার উপদেশ। নানা যোগের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হলে তবেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা জন্মে। বিশেষ করে বিষয়বৈরাগ্য না হলে ও ঈশ্বরানুগ্রহ না হলে মুক্তি লাভের আশা দুরাশামাত্র হবে।[৩৭] এ কারণে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে —

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।"[৩৮]

ঈশোপনিষদে আম্নাত হয়েছে —

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"[৩৯]

শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে —

"ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম্ অদ্বৈতবাসনা।"

সুতরাং সমস্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অদ্বৈতবাদকে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ বলতে পারি। অদ্বৈতবাদ পক্ষে সমস্ত মতবাদের বিরোধ অপনীত হয়। তাই অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। আর অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসম্মত হওয়ায় ও শ্রুতির পরম তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে সিদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈতবাদই গ্রহণীয়। আর অন্যান্য মতবাদগুলি অদ্বৈতবাদের পরিপোষক হওয়ায় প্রথম স্তরে সেগুলিরও প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।[৪০]

অদ্বৈতবাদের ভাবগত ও ভাষাগত উৎকর্ষ

অবশ্য এখন প্রশ্ন হতে পারে, অদ্বৈতবাদেরই এরূপ স্তরে স্তরে বিস্তার হয়েছে, অন্য মতবাদের এরূপ বিস্তার হচ্ছে না কেন ? অদ্বৈতবাদের এরূপ বিশেষত্বের হেতু কি?

উত্তরকল্পে বক্তব্য এই যে, যে সময়ে যে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতা তার চরমসীমায় উঠেছে: সেই সময়ে সেই ন্যায়ের সূক্ষ্মতার সাহায্যে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ ন্যায়ানুমোদিত পথে অদ্বৈতবাদ বিকশিত হয়েছে। অপর কোন মতবাদই এরূপ ন্যায়ানুমোদিত পথে রচিত হয় নি। তাই অদ্বৈতবাদের এত সমাদর হয়েছে। মানবমনের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, কোন কালেই শ্রুতিসমন্বিত এই অদ্বৈতবাদ উপেক্ষিত হতে পারে না। অদ্বৈতবাদের এটাই বিশেষত্বের হেতু। ইতিপূর্বে ন্যায়াচার্য মহামতি উদয়নাচার্যের সময় ন্যায়ের যে সূক্ষ্মতা, তাতে ভাবগত সূক্ষ্মতাই অধিক হয়ে গেছে। ভাষা ও ভাব উভয়গত সূক্ষ্মতার চরম সীমা মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় হতে রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশের সময়ের মধ্যেই হয়ে গেছে। আর শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ সেই সময়ের অব্যবহিত পরেই রচিত। অদ্বৈতবাদে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতার চরম অবস্থা পূর্ণমাত্রায় স্থান লাভ করেছে। সেই সূক্ষ্মতার শ্রুতিসাপেক্ষ ন্যায়ানুমোদিত পথে বিচার শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে যে ভাবে প্রকটিত হয়েছে, এমন আর কোনও মতবাদে নেই। এই কারণে অদ্বৈতবাদ অন্যান্য মতবাদ হতে শ্রেষ্ঠ স্থান

অধিকার করেছে। আর পরবর্তী কোন মতবাদ একে অতিক্রম করতে পারে নি । এটাই অদ্বৈতবাদের বিশেষত্বের হেতু।[৪১]

সবশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়োজনবোধে ধ্যান-ধারণা, ভক্তি ও জ্ঞান সব কিছুকেই অনুশীলন করতে বলেছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের ভাবাদর্শের সঙ্গে স্বামীজির ভাবাদর্শের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

এইভাবে সবদিক থেকে বিচার করে আমরা অদ্বৈতবাদের সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন করতে পারি। আর এটিই আমাদের গবেষণাগ্রন্থের মূল বিষয়সংক্রান্ত আলোচনা ।

১। স্তোত্রমালা, পৃঃ ২৮
২। উদ্বোধন ৭৫ তম বর্ষ। পৃঃ ১৩৮
৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৮২
৪। বিবেকানন্দের স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৪৮-১৪৯
৫। The song at the Sannayasin 1895. July ৬ নং পঙ্‌ক্তি।
৬। বাণী ও রচনা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৩৯
৭। বিবেকানন্দের স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ- ১৫৫
৮। বেদান্ত মুক্তির বাণী, পৃঃ- ২৪
৯। বেদান্ত মুক্তির বাণী হতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৩
১০। বাণী ও রচনা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৮২
১১। বাণী ও রচনা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ২৮১
১২। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সংকলন, পৃঃ- ২১৪
১৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড । পৃঃ ২৩৫-২৩৬
১৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ২০৩
১৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সংকলন, পৃঃ ২১৫-২১৬
১৬। ঋক্‌বেদ ১/১৬৪/৪৬
১৭। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন, ২১-২২
১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬/২৩
১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮/৫৫
২০। কৈবল্যোপনিষদ্ ১/২
২১। বাণী ও রচনা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩
২২। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃঃ ১৯৫
২৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬
২৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন, ১৭৯
২৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন, পৃঃ ১৩১ (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৯৯)
২৬। বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা। পৃঃ ১৫৬
২৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৬৩
২৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ - ১/৪/২
২৯। ঈশোপনিষদ্ - ৭

৩০। কেনোপষিদ্ ১/৫
৩১। ধ্যান শান্তি আনন্দ। ৫৬ - ৫৭
৩২। কঠোপনিষদ্. ১/৩/১২
৩৩। গীতা ভাষ্য।
৩৪। শ্রীমদ্ভদবদগীতার ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।
৩৫। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/১
৩৬। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭/২৩/১
৩৭। ভাবতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন , ১৯৩
৩৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৩
৩৯। ঈশোপনিষদ্. মন্ত্র সংখ্যা - ১
৪০। স্বামীজির বাণী ও রচনা সঙ্কলন। পৃঃ- ১৭১
৪১। অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। মিথ্যাত্ব প্রথমলক্ষনং নাম। প্রথমোভাগঃ। পৃঃ ৮৪

সমাজ বিজ্ঞানের সাথে অদ্বৈতবাদ

সমাজ, সমাজবিজ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞানের সাথে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্যকে দেখানোর আগে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে 'সমাজ' কাকে বলে ? 'সমাজবিজ্ঞান' কাকে বলে ? আর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি ? সমাজ হল মানুষের একত্রীভবন, একই ভাবে মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নাম সমাজ, যেমন একটি দেশের মানুষ সমবেত ভাবে সমভাব পোষণ করে গড়ে তোলে জাতীয় সমাজ। তেমনি বিশ্বের সমগ্র মানবের জন্য যদি কোন পথ নির্দেশক থাকে যাকে নিয়ে একই সঙ্গে একইভাবে থাকা যায় তাকে বলে বিশ্বসমাজ।[১] সর্বজনীন আবেদন অদ্বৈততত্ত্ব এমন একটি পথ নির্দেশ করে যা বিশ্বের সকল জনকে প্রকৃত জ্ঞানালোকের পথ দেখিয়ে একতাসূত্রে বদ্ধ করে। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীব সেবার তত্ত্ব প্রবর্তিত করে প্রতিটি জীবই যে এক একটি শিব সেই সার্বিক ধারণার সৃষ্টি করেছেন। জীবের সেবা করলেই শিবের সেবা করা হয়।[২] কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান। "To serve a man means to serve God."[২] মানুষের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। এভাবে বনের বেদান্ত যা ছিল ঋষি উপলব্ধ — স্বামীজির নিরলস প্রচেষ্টায় তা মানব কল্যাণের স্তরে নেমে এসে বিশ্বের সমস্ত সমাজকে নবালোকে উদ্ভাসিত করেছে। কাজেই দার্শনিক অদ্বৈত চিন্তা চূড়ান্ত ভাবে সামাজিক একতায় পরিণত করতে পারে।[৩]

সমাজ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সামাজিক কাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা। প্রতিটি সামাজিক কাজের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে কোন না কোন সামাজিক নীতি । আবার প্রতিটি সামাজিক নীতির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে কোন না কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সামাজিক কাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক জীবের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে যে বিজ্ঞান তাকেই বলা হয় সমাজবিজ্ঞান।[৪] আর যে সামাজিক নীতির মধ্যে কেন্দ্রীয় সত্যরূপে সকল ধর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, এবং আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে যার কোন বিরোধ নেই সেটাই হল অদ্বৈতবাদ। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের নানা নীতিসূত্র গুলির সঙ্গে সুপ্রাচীন অদ্বৈতবাদী বেদান্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমাজবিজ্ঞানের সাথে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য নিয়েই আমাদের এখন কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত ভাষণগুলি থেকে আমরা যে সারতত্ত্ব উপলব্ধি করি সেটি এই, সত্যাশ্রিত এই সনাতন এই বৈদিক ধর্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে সুদৃঢ় ঐক্য বিদ্যমান তাকে আবিষ্কার করা। আর সেই ভাষণগুলি ছিল এমন একটি ধর্ম সম্পর্কিত যা আকাশের মতো অসীম, অনন্ত যার ব্যাপ্তি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণকর জ্ঞানই যার একান্ত

লক্ষ্য। এছাড়া এগুলি ছিল সকল প্রকার অসহিষ্ণুতা, মতান্ধতা ও গোঁড়ামির মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনি স্বরূপ। কেননা এগুলিতে ঘোষণা করেছিল বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃ সহাবস্থান, শান্তি এবং মানব সেবার কথা, ঘোষণা করেছিল মানবমুক্তির কথা, সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির কথা প্রকৃতির দাসত্ব থেকে, অপর মানুষের দাসত্ব থেকে, প্রথা প্রতিষ্ঠান সমূহের দাসত্ব থেকে, অজ্ঞতা ও অন্যনির্ভরতার দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা।[৫]

সে জন্য দেখা যায় যে, ঐ ভাষণ গুলির একটা চিরন্তন সামাজিক তাৎপর্যও ছিল যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধকে উন্মেষিত করা। এগুলির মধ্যে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা হয়েছে যেটি মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে পুরিপূর্ণ, যেখানে সকলের সমান সুযোগ ও সমান অধিকার যেখানে কোন বিশেষ সুবিধার স্থান নেই।

আবার, আমরা যখন স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করি তখনও আমরা দেখি কি অপূর্ব বিচিত্র ধর্মের সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর এই বিশ্বজনীন অদ্বৈতবাদের মধ্যে। তাঁর এই কথাগুলিতে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অদ্বৈতভাবনায় মূর্তি পূজা ও আনুষঙ্গিক নানা পৌরাণিক অনুষ্ঠান পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ আরো কত কি এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।

কেবল তাই নয়, বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দর্শন বহুশাখায় বিভক্ত হয়েছে। যথা — তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিজ্ঞান, পুরুষার্থ বিজ্ঞান, সেই রূপ সমাজবিজ্ঞানকেও ঐ দর্শনের একটি শাখারূপে গণ্য করা হয় এবং নীতি বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করা হয়। লক্ষণীয় এই যে, অদ্বৈতবাদী স্বামীজির উদার দৃষ্টিতে এসকল দর্শন বিদ্যারও প্রামাণ্য ও মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।[৬]

বেদ হিন্দুদের কাছে ভগবানের মুখনিঃসৃত মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। পণ্ডিত রঘুনন্দন বেদের উক্তি উদ্ধৃত করে এই সতীদাহ প্রথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে গেছেন। তাই এই যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন তোলে নি। পুরোহিতরাও এভাবেই বৈদিক অনুশাসনকে হিন্দু সমাজের চিরস্থায়ী বিধিরূপে প্রচার করেছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা এই মনোবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন মুমূর্ষু সভ্যতার ব্যর্থ প্রতিক্রিয়া রূপে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজেই এক এক যুগে এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিক্রিয়া দেখা যায়। অধিকাংশ প্রাচীন দেশই এই অনগ্রসরতার পঙ্কে নিমজ্জিত। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করের ও স্বামী বিবেকানন্দের বিচারশীল সর্বতোভদ্র দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পুনরায় কুসংস্কারহীন হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়েছে । ভারতীয় সমাজব্যবস্থা তাই আবার হয়ে উঠেছে গতিশীল সক্রিয় ও কুসংস্কারমুক্ত।[৭]

আরো কথা, অদ্বৈতবাদের উদার দৃষ্টিতে সিদ্ধপুরুষের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে অপূর্ব বিকাশ ঘটে। স্থির সিদ্ধির জন্য সাধনার অবিরাম অগ্রগতি

একমাত্র অদ্বৈতচিন্তার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ক্রিয়া করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে সক্রিয় অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম, নীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হতে পারে। আর অন্য কোন মতবাদের মধ্যে এরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি এবং সত্যের ন্যায় ও নীতির প্রতি অবিচল অনুরক্তি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মধ্যে নিহিত সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন কার্যধারার সামঞ্জস্য আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে এর বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।[৮]

বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, দ্বৈতবাদের উপর আধুনিক সমাজবিজ্ঞান যে আঘাত হেনেছে, দ্বৈতবাদের কাছে এই আক্রমণের কোন উত্তর নেই। দ্বৈতবাদীর মতে সমাজবিজ্ঞান সত্যই নিরর্থক । এজন্যই প্রধানতঃ ফুয়ারবার্ক, মাক্‌র্স খ্রীষ্টধর্মের অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ করে জড়বাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞান সম্মত।[৯]

স্বামীজির সমাজভিত্তিক সাহিত্যবোধ

শ্রেষ্ঠ সমাজ দার্শনিক হওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন শক্তি-প্রতিভা শক্তি তা যে অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের ছিল, সে বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই প্রতিভার সঙ্গে প্রয়োজন ইতিহাসবোধ। বিবেকানন্দের প্রিয় বিষয় ইতিহাস। বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে তাঁর গভীর প্রবেশ চমকিত করেছে তাঁর পরিচিত সকলকে। মনস্বিনী নিবেদিতা মনে করতেন, ইতিহাস স্বামীজির নিজস্ব দুর্গ। বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের তিনি নিবিষ্ট পাঠক। এক্ষেত্রে তিনি অন্ধভাবে বিদেশীয় ইতিহাসকে অনুসরণ করেননি। স্বামীজি ইতিহাসকে আধুনিক অর্থে নিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু কেবল ইতিহাস পাঠই যথেষ্ট নয় — ঐ ঐতিহাসিক তথ্যকে নিরপেক্ষভাবে বিচারের ক্ষমতা ও থাকা চাই। মনীষাসম্পন্ন বহু ঐতিহাসিক দেখা যায়, বিশেষ স্বার্থ বা গোষ্ঠীর মানসিকতা পক্ষ অবলম্বন করে একদেশদর্শী ইতিহাস রচনা করেছেন, এবং তাঁদের অনেক সিদ্ধান্তই অনুচিত আদর্শের দিকে মানুষকে চালিত করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি স্বামীজি খাঁটি সন্ন্যাসী ছিলেন বলে তদনুযায়ী কোনো স্বার্থগোষ্ঠীর স্বপক্ষতা করার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। তাই তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা একদেশধর্মী ইতিহাসভিত্তিক নয়, তা ঐক্যমুখী সমাজভিত্তিক।[১০]

বিবেকানন্দের দার্শনিক সমাজবাদে আমরা দেখি ক্রমবিকাশবাদ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তবে ডারউইন প্রণীত ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু মতভেদ ছিল। প্রথমতঃ যেহেতু ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী শূন্য হতে কিছু সৃষ্টি হয় না, বীজ হতে গাছ, গাছ হতে বীজ, অব্যক্ত হতে ব্যক্ত ও ব্যক্ত হতে অব্যক্ত এইরূপে বিবর্তন চলে, সেই হেতু ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসংকোচ অবশ্য থাকতে হবে।

পতঞ্জলিসম্মত প্রকৃতির নানারূপ বিষম পরিণামের ফলে জাতি হতে আর এক

জাতির উৎপত্তি সাধিত হয়। স্বামীজির এ সম্পর্কে মত হল সকল মানবই পূর্ব হতেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, নানা প্রতিকূলতার জন্য ঐ শক্তির বিকাশ হয় না। প্রতিবন্ধকগুলি কোনভাবে অপসারিত হলেই তার সেই অনন্ত শক্তি মহাবেগে বহিঃপ্রকাশিত হবে। ইতর প্রাণীর মধ্যেও মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রয়েছে; যখন উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই সে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। ঠিক সেইভাবে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর সদা বর্ত্তমান তার একটু কৃপাবারি বর্ষিত হলেই তা অভিব্যক্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পূর্বানুকৃতি (Alanism) স্বীকার করেন, অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ বা আদিম স্তরের লক্ষণ দেখা যায়, বিবেকানন্দ এই পূর্বানুকৃতির প্রামাণ্য হৃদয়ঙ্গম করে ক্রমসংকোচনবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। দর্শনশাস্ত্রের যুক্তি অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য অনস্বীকার্য্য। সুতরাং বিবেকানন্দের সমাজ বিজ্ঞানের ধারণাসকল অদ্বৈতবাদভিত্তিক।[১১]

স্বামীজি বিজ্ঞান ও যুক্তির বশবর্ত্তী হয়ে পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে বলতেন যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও অনুসন্ধানে লব্ধ সূত্রাদি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যেরূপ অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রয়েছে, সেরূপ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ তার সমাধান স্বামীজি এইভাবে করেছেন যে, এগুলি একই চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। তাঁর ভাষায়ঃ "মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী — সে এমন মীমাংসা করতে চায়, যাতে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ যাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করতে পারি যাকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে না পারলেও কেবল অকাট্য যুক্তি- বলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি-সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি-বলে সিদ্ধান্ত করতে পারি, তা হলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হল বলা যেতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হতে মীমাংসার সম্ভাবনা নেই, কারণ এটা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র।[১২]

অতঃপর এই মতবাদ (অদ্বৈতবাদ) মানুষে যেরূপ চরম অসাম্প্রদায়িক সাম্য প্রচার করে, এরূপ আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কোন মতবাদে নেই। আর সমত্ব দর্শনও আর নেই। এই মহান দর্শন ঘোষণা করেন উপনিষৎ, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[১৩] — জগতে সকলই ব্রহ্ম। অজ্ঞান দূর হলে এই অদ্বৈতজ্ঞান ফুটে উঠে এবং তখন সাধক সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা সমদর্শন করেন। বেদান্ত মতে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ। স্বামীজি সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের এই চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমাজদর্শনকে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মে পরিণত করতে সকলকে আহ্বান করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্ত সূচিত সাম্যবাদকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের

যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। কেবল অর্থনীতি বিভাগের নয়, মানব জীবনের সকল বিভাগে প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যদি সাংসারিক ধনসম্পদের আকাঙক্ষা থাকে, তবে বেদান্তকে কার্যে পরিণত কর, টাকা তোমার নিকট আসবে, যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদ সেইদিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করলে তুমি ঈশ্বর হয়ে যাবে পরমানন্দ স্বরূপ নির্বাণ লাভ করবে।[১৪]

স্বামীজি অধ্যাত্মবাদের উপরে তাঁর সাম্যবাদকে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই অধ্যাত্মবাদ অবশ্যই প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। সর্বমানবের জন্য যদি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বিশেষ কোনো ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। তিনি তাঁর সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে এমন অধ্যাত্মমতকে গ্রহণ করেছেন, যার আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে বিরোধ নেই, সেই মত হল অদ্বৈতবাদ। স্বামীজি অদ্বৈতবাদকে ভারতের অরণ্য হতে উদ্ধার করে কালোপযোগী সংস্কারের পরে উপস্থাপিত করেছেন লোকালয়ে লোকগণের সামাজিক কল্যাণের জন্য, সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য।[১৫]

স্বামীজি অদ্বৈতবাদকে ধর্মবিজ্ঞানের চরমরূপ মনে করেছেন। অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে তাই নয়, বরং ঐ সব সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। আর সে জন্যই তা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের অন্তর স্পর্শ করেছে।[১৬] উচ্চতম সামান্যীকরণ এবং বিবর্তন বাদের কথা বেদান্তে আছে বলে বেদান্তধর্ম বৈজ্ঞানিক জগতের দাবি মেটাতে পারে। আর এই কারণে "অদ্বৈতবাদ ভবিষ্যতের ধর্ম হবে। আর যদি আমরা তাকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি তা হলে নিশ্চয় বলা যাবে, তা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হবে।[১৭]

মানুষের মধ্যে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা

স্বামীজি সকল মানুষের জন্য সম সুযোগ ও সম-অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন; তিনি ধর্ম ক্ষেত্রে আচার, আনুষ্ঠানিকতা, বুজরুকি বর্জন করতে বলেছেন, অস্পৃশ্যতা পাপের বিরুদ্ধের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, জনগণের কল্যাণের জন্য অদ্বৈতবাদ প্রচারই কেবল নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িতও করেছেন। এই অংশে প্রফুল্লচন্দ্র স্বামীজির রচনার অজস্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কারণ এইসব বিষয়ে স্মরণাতীত কালের মধ্যে বিবেকানন্দের ভাষায় আর কেউ কথা বলতে পারেন নি। প্রফুল্লচন্দ্রের মন্তব্যের সামান্য অংশই মাত্র এখানে উপস্থিত করছি।

"বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত, তথা কথিত পৌত্তলিক মৃতকল্প হিন্দু ধর্মের ভিতর স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি সঞ্জীবনী মন্ত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চাইছিলেন। সাম্যমন্ত্র প্রচার করে উক্ত সমাজকে উদারতা এবং একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

করাই ছিল অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। ভগবান্ 'সর্বভূতান্তরাত্মা' অদ্বৈত তত্ত্বের এই উচ্চতর জ্ঞানের কথা পূজাপার্বণাদি আচার নিষ্ঠ হিন্দু সমাজে কার্যে পরিণত হল না। স্বামী বিবেকানন্দ ভালোভাবে জানতেন যে, ব্যাবহারিক অদ্বৈতবাদ হিন্দুদের মধ্যে কোন কালেও বিকাশ লাভ করবে না। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এই অদ্বৈতবাদকে হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন কার্যে পরিণত করতে আমরণ অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করেই হিন্দুরা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতি ও প্রেমের চক্ষে দেখতে পেল। স্বামীজি আরও জানতেন যে, যদি লোয়ার ক্লাসদের education দিতে পারা যায়, তাহলে ভারতের পরাধীন অভ্যুদয় মুক্তির উপায় হতে পারে, তাই আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ঐ যে পশুবৎহাড়ি, ডোম তাদের উন্নতির জন্য স্বামীজি সেবা ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন, ইতর অস্পৃশ্য অজ্ঞ, মুচি, মুদ্দফরাস এই অধঃ পতিত দরিদ্র পদদলিত জাতিদের মঙ্গল কামনায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজবিজ্ঞানের সাথে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি এই অদ্বৈতবাদকে দুর্বোধ্য মনে করেন, তা হলে এই বিষয়টির ভাল ভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই কর্মজীবনে অদ্বৈতবাদ, বিবেকানন্দ নিজেই বিভিন্ন ভাষণে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। গিরিগুহা ও অরণ্যস্থিত বেদকে লোক সমাজে টেনে এনেছেন। আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষও তা যথার্থ ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদ দ্বারাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব এটা বিবেকানন্দ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই দেশে বিদেশে অদ্বৈতবাদের প্রচার, আত্মচিন্তা প্রচারই তিনি সর্বাধিক করেছেন, যদিও সকলের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তিনি অপরিহার্য সোপান রূপে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিকে স্থান দিয়েছেন, তথাপি অদ্বৈতবাদই যে সমাজবিজ্ঞানের উন্নতিতে চরম সত্য এবং সেই সত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে তবেই মানবের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর একটুও সংশয় ছিল না। স্বামীজি আরো বলেছেন, অন্যান্য মতবাদের যথেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাদের দ্বারা মানব সমাজের যতটুকু ভাল হবার হয়ে গেছে বেশি কিছু ভাল হয় না। তবে এখানে উপনিষদের চরম সত্য অদ্বৈতভাবনাকে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।[১৯]

স্বামীজির চিন্তায়, যে অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরকে প্রচার করেন, সেই ঈশ্বর জগতের প্রাণ।''[২০] ''সকল ধর্মেই এই একতত্ত্ব পাওয়া যায় যা তোমার নয়, তা তুমি কখনো পেতে পারো না। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কারো কাছে ঋণী নও। তুমি তোমার নিজের জন্মগত অধিকারই চাইবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য এই ভাবটি তাঁর নিজের একটি গ্রন্থের নামে বড় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থটির নাম — ''স্বারাজ্যসিদ্ধি''। অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যা হারিয়েছিল, তার পুনঃপ্রাপ্তি। যে রাজ্য আমাদের হারিয়েছি তাকে

আবার ফিরে পেতে হবে ।[২১] "প্রাচীন ধর্ম বলত ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক, নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক।"[২২] "জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি ? না, তুমি আমি ও সেইরূপ অনুভব করে থাকি, তার দ্বারাই বুঝতে পারি, সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মা তাঁদের দিব্য আত্মার প্রমাণ। এমন কি তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের প্রমাণ। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোনো ঈশ্বর নেই, কখনও হবেন না।"[২৩] "মহান আত্মা কি সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, আমাদের সামনে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রয়েছে এর প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে তাঁরই সত্তা। বাহু প্রসারিত করে সমুদয় জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করো।"[২৪] অদ্বৈততত্ত্বই নৈতিক দুর্বলতা দূর করার একমাত্র ঔষুধ। যে কোনো ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করেছে, যে কেউ করবে — সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজ্য, ঝাড়ুদার, ধনী, দরিদ্র সকলকেই এই শিক্ষা দাও না কেন আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নেই। আমি দেবতার দেবতা — আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নেই।"[২৫] আপনারা এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক রাজার অন্তরে। "আমাদের একমাত্র আবশ্যক শক্তি। শক্তি পার্থিব দুর্ভাগ্যের একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্র যখন ধনীর দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ঔষুধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন শক্তিই মূর্খের একমাত্র ঔষুধ। পাপী যখন অন্য পাপীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন শক্তিই ঔষুধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ শক্তি দান করে এমন আর অন্য মতবাদ করতে পারে না।[২৬]

সবশেষে বলা যায়, পৃথিবীর সহস্র সহস্র মতবাদ পুষ্ট সমাজের বুকে অদ্বৈতবাদ বয়ে এনেছে অমৃতের ধারা। স্বর্গীয় পারমাত্মিক অদ্বৈততত্ত্ব সঞ্জাত অমৃত সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত কত কল্যাণই না সাধন করছে। প্রতিটি সামাজিক স্তরে অন্যান্য মতবাদগুলিকে সহ্য করে আপন ক্রোড়ে স্থান করে দিয়ে নব নব রূপে সমাজের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছে। জীবে প্রেমকরা বা ভালবাসা মানুষের ধর্ম। এবং মানুষকে ভালবাসলেই পরমাত্মাকে ভালবাসা হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি ঐশ্বরিক ভাবনার মাধ্যমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু স্বামীজি অদ্বৈততত্ত্ব ভাবনার মধ্য দিয়ে সমাজের নব দিগন্ত উন্মোচন করলেন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এক সমাজের সাথে অপর সমাজের আলিঙ্গন ভ্রাতৃত্ব বোধ এই সবই হল পরমাত্মাকে সেবা করার অঙ্গ। এটাই হল স্বামীজির অদ্বৈতবাদের ব্যাবহারিক সামাজিক রূপ ।

১। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতি । জয়দেব সরখেল, দ্রষ্টব্য।
২। স্বামী বিবেকানন্দ। প্রমথনাথ বসু। প্রথম ভাগ। পৃঃ ১০৪
৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন । পৃঃ ২১৭
৪। সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক হরিদাস আচার্য । দ্রষ্টব্য

৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন। পৃঃ- ২
৬। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন। পৃঃ ২-৩
৭। স্বামী বিবেকানন্দ। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮। শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সংকলন। পৃঃ ১৮১
৯। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষসূচী। পৃঃ ২৭০
১০। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৪৪২
১১। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষসূচী। পৃঃ ২৭১-২৭২
১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৩৭
১৩। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩/১৪/১
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৫ম খণ্ড। পৃঃ ১০৫
১৫। বিবেকানন্দ সমকালীন ভারতবর্ষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৪৭২
১৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৭৬
১৭। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৪৭২-৪৭৩
১৮। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। সপ্তম খণ্ড। পৃঃ ৩৭৪ - ৩৭৫
১৯। যুগদিশারী বিবেকানন্দ। তৃতীয় সংস্করণ। পৃঃ ১৪০
২০। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৭৯
২১। ঐ। পৃঃ ১৬০
২২। ঐ। পৃঃ ১৮১
২৩। ঐ। পৃঃ ১৭৬
২৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৯৩
২৫। ঐ। পৃঃ ১৬৪
২৬। ঐ। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৭৪ - ১৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

অদ্বৈতবাদ বর্তমান কালে উপযোগী কিনা ?

জড়বাদের প্রতিরোধে অদ্বৈতবাদ

অদ্বৈতবাদ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্রসম্মত। আচার্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। গৌড়পাদ গোবিন্দাচার্যের গুরু। গোবিন্দাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরু। গৌড়পাদ যে অদ্বৈতবাদের সূচনা করেছিলেন, শঙ্করাচার্য সেই অদ্বৈতবাদকে পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট করে তুলেছেন।[১] শঙ্করাচার্য বলেছেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নেই। তত্ত্বের অজ্ঞানবশতঃ জগৎকে সত্য বলে মনে হয়। বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য।[২] শঙ্করসমর্থিত এই ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই হল ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্ম চিন্তার শ্রেষ্ঠ অবদান। এখানে সাধক সমাধিস্থ হয়ে ভগবানের সঙ্গে লীন হয়ে যান। স্বামীজির প্রচেষ্টা ছিল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা। তাই তিনি "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" — এই মহান ধর্ম প্রচার করেছেন। প্রতিটি জীবই এক একটি শিব বা ভগবান্। এই উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বর জ্ঞানে জীবের সেবাতে কোন মানুষ আত্ম নিয়োগ করলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এ ধরনের অদ্বৈত অর্থভাবনা বর্তমান কালে অত্যন্ত উপযোগী। এই জ্ঞানের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। আসলে এটি বেদান্ত বা উপনিষদেরই শিক্ষা।[৩]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে —

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ"।[৪]

অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং বিশ্বে স্ত্রী পুরুষ, কুমার কুমারী, বৃদ্ধ কিম্বা শিশু রূপে বিরাজ করছেন। জীবসেবা নিষ্কামভাবে করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এটাই হল স্বামীজির চিন্তালোকে বেদান্তের উপস্থাপনা। আমরা একথা পূর্বে বিশদভাবে বলেছি। আমরা এটাও বিশেষভাবে বিচার করেছি যে, অনেক বিদ্বজ্জনেরা মনে করেন, শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সাধারণজনের অধ্যয়নের জন্য নয়। গৃহত্যাগী মুমুক্ষু সন্ন্যাসী জনেরই এটি অধ্যেয় বিষয়। সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছ থেকে শ্রবণমননাদির মাধ্যমে অদ্বৈততত্ত্বকে অধিগত করতেন। সেই জন্যই বেদান্তের আর এক নাম হয়েছিল 'আরণ্যক'। কালক্রমে বুদ্ধদেব এসে আপামর সাধারণের মধ্যে অবৈদিক

বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন। সমগ্র জাতি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বলশালী হয়ে উঠল। এইভাবে বহুদিন অতিবাহিত হলে এবং বেদের ভাবধারা লুপ্তপ্রায় হলে নাস্তিকেরা যখন সমগ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করল তখন জ্ঞানিগণ বিশেষ করে আচার্য শঙ্কর উপলব্ধি করলেন, ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ভারতকে এই জড়বাদের হাত হতে রক্ষা করা একান্তই অসম্ভব। শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্করের প্রবল প্রচেষ্টায় বৈদিক ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণের ভাব সমূলে উচ্ছিন্ন হল। এইভাবে আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদই যেমন সমাজকে ভয়ঙ্কর বিপৎসাগর থেকে রক্ষা করেছিল, তেমনই আজও স্বামীজি প্রচারিত সেই অদ্বৈতবাদই নানা বিচ্ছিন্নতা-প্রপীড়িত এই সমাজকে দুর্বিষহ পরিণতি থেকে যে রক্ষা করতে পারবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৫]

স্বামীজি এক বক্তৃতায় বলেছেন ইউরোপে আজকাল জড়বাদ প্রচলিত। আধুনিক অবিশ্বাসীদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেও তারা মানবে না, তারা মুক্তি চায়। ভোগ-সর্বস্ব ভাবনার বিলয় না হলে ত্যাগসর্বস্ব মুক্তিভাবনা উদিত হতে পারে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদী স্বামীজির বিশ্বভ্রাতৃত্বভাবনা ও বিশ্ববন্ধুত্বভাবনাই বিশ্ববাসীর মানস সংকীর্ণতাকে দূর করতে সমর্থ। লক্ষণীয় এই যে, যখনই ধর্ম লুপ্ত হবার উপক্রম হয় তখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আর তখনই (ধর্মসংকটকালে) মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে। আর এই জন্যই আমেরিকায় স্বামীজির প্রচারিত বিশ্বজনীন এই অদ্বৈতবাদ ম্লেচ্ছ মানসপটে প্রবেশ করে দৃঢ়মূল হয়েছে। আর এর থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, অদ্বৈতবাদ আধুনিক কালেরও উপযোগী।[৬]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ শে মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে স্বামীজি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখানেও আমরা অদ্বৈতবাদের মহতী উপযোগিতার কথা জানতে পেরেছি। স্বামীজি সেই বক্তৃতায় বলেছেন যে, আজ কাল ভারতে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গুলির সবই বেদান্তবিধৃত অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমার মনে হয় ক্রমোন্নতির ধারায় অগ্রসর হয়ে দ্বৈতবাদে যেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাদে সেগুলির পরিসমাপ্তি হয়েছে।[৭] স্বামীজির বেদান্ত ভাবনার এটি একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর অদ্বৈতচিন্তার এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। স্বামীজি তাঁর 'হিন্দুধর্ম' নামক ভাষণে বলেছেন, হিন্দুর সকল উপাসনাই বেদান্তে অন্তর্ভুক্ত — বেদান্তের এক একটি স্তর তার মধ্যে অদ্বৈতবাদ হল সর্বোচ্চ স্তর। আর এই অদ্বৈত ভাবনায় উন্নীত হবার জন্য আমরা বেদান্তে যে উপাসনার কথা জানতে পারি তাতেও আধুনিক কালে অদ্বৈতবাদের উপযোগিতার কথা অবগত হতে পারি। তবে স্বামীজির ভাষায় — "প্রত্যেকটি সাধনাই হল ক্রমোন্নতির অবস্থা। এবং অদ্বৈত সাধনা সর্বোচ্চ স্তর পার হয়ে চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত তিন ভাবই মানতেন। প্রসঙ্গত তিনি মহাজ্ঞানী হনুমানের কথা বলতেন। শ্রীহনুমানের যখন দেহ বুদ্ধি বলবৎ থাকত তখন শ্রীহনুমান অনুভব করতেন, তিনি দাস আর শ্রীরামচন্দ্র প্রভু। অর্থাৎ এখানে দ্বৈতভাব বুঝাত। যখন তাঁর বোধ হত যে, তিনি মনবুদ্ধি-আত্মযুক্ত জীবাত্মা তখন তিনি দেখতেন, শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ আর তিনি তাঁর অংশ, এতে বিশিষ্টাদ্বৈতভাব বুঝাত। আর যখন তিনি ভাবতেন, তিনি নামরূপ- রহিত শুদ্ধ আত্মা তখন দেখতেন তিনিও যা শ্রীরামচন্দ্রও তা, কোন ভেদ নেই। এতে অদ্বৈতভাব বুঝাত। শ্রীঠাকুর বলতেন, তিনটি ভাবই মনের উন্নতির অবস্থা অনুযায়ী উপনীত হয়। তবে এদের মধ্যে অদ্বৈতভাবই ধর্মোন্নতির শীর্ষবিন্দু। তিনি নিজ জীবনে এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন।[৯]

সকল মত ও ধর্মের সমন্বয়ে অদ্বৈতবাদ

এই অদ্বৈতবাদ যে আধুনিক কালে উপযোগী তা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদেরকে প্রত্যক্ষত বুঝিয়ে দিয়েছেন । স্বামীজি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কেবল সহজ ভাষায় বুঝিয়ে ক্ষান্ত হন নি, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আর দ্বৈতবাদের সমন্বয় করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। নিরাকার হলেও আকৃতি একটা থাকবে। যেমন জল আর বরফ। স্বামীজিও বলতেন, একের তিন অভিব্যক্তি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত। দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা থেকে অদ্বৈতভাবে পৌঁছানো যায়। অবশ্য অদ্বৈতভাবই ধর্মপথের চরম লক্ষ্য।[১০] 'তত্ত্বমসি,[১১] 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'[১২] । অতএব বলা যায়, স্বামীজির অদ্বৈতবাদ সমস্ত ধর্ম পথের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি। অর্থাৎ আধুনিক কালে সমস্ত ধর্মীয় পথের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য । অর্থাৎ আধুনিক কালে সমস্ত ধর্মীয় মতবাদের পরম উপযোগী ভগবান্ শঙ্কর সম্মত ও স্বামীজি প্রচারিত ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ।

আবার স্বামীজির শিক্ষণীয় তত্ত্বরাজির মধ্যে আমরা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করি যে, গত তিনটি শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য জগৎ যে সব সমস্যায় আবর্তিত হচ্ছিল তা হল, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমস্যা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সঙঘাতের সমস্যা । অতএব সব কিছুরই সমাধান পাই অদ্বৈতবাদে। তাই স্বামীজি সত্যই বুঝেছিলেন যে, বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈতবাদ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি কেউ একই সঙ্গে যুক্তি বিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হতে চায়, তবে তার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।

স্বামীজি আরো বলেছেন, ইউরোপের মুক্তি এখন ধর্মীয় যুক্তি সাপেক্ষ ও অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভরশীল আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই বা ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। আর এজন্যই ইউরোপে ও আমেরিকায় অদ্বৈতবাদের প্রবেশ দৃঢ়মূল হয়েছে ।[১৩]

মুমূর্ষু জনকে বাঁচাতে অদ্বৈতচিন্তা

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচারিত ধ্রুববাদ (Positivism) বা উপযোগবাদ (utilitasianism) মানুষের কল্যাণ সাধনে স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সে কল্যাণ নিতান্তই জীবধর্মী সাধারণ মানুষেরই আহার নিদ্রাদি বিষয়ক। সেখানে রাষ্ট্র যন্ত্র বা সমাজশক্তি হস্তগত করে বহুজনের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু সে কল্যাণ সাধনার মূল কারণটি কি তা অস্পষ্ট। নরকে নরোত্তমে পরিণত করা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নরোত্তম নারায়ণ বা ঈশ্বর মূলে স্বীকৃত না হলে মানব জীবনের মৌলিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। মানুষকে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসনগত অধিকার দিলেও তার প্রকৃত একান্ত কল্যাণ করা যায় না, আর অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। তার মধ্যে প্রয়োজন অন্তর্লীন বৃহৎ সত্তার উদ্বোধন ও ক্ষুদ্রতম অণুকে বৃহত্তমের সমপর্যায়ে উপলব্ধি। প্রকৃতির দিক থেকে দুই-ই এক, সকলেই একই জাতীয়, সকলে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সমৃদ্ধ। এই অদ্বৈতবাদকে স্বামীজি সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। মুমূর্ষু ভারতের বাঁচবার একমাত্র উপায় স্বামীজির এই অদ্বৈতবাদ যা বর্তমান কালে বিশেষ উপযোগী। স্বামীজি বর্তমান ভারতবাসীর কানে সেই মহামন্ত্র দিয়েছেন।[১৪]

স্বামীজি অদ্বৈত তত্ত্ব ও আদর্শকে সকলের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন, এই তত্ত্ব কেবল বিশিষ্ট অধিকারীর জন্য। স্বামীজি এই তত্ত্বকে সকলের জন্য বলেছেন। শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈততত্ত্বকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উচ্চ শিখরে চিরতুহিনাবৃত না রেখে তাঁর হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপে একে গলিয়ে এর সঞ্জীবনী ধারা সমাজ দেহে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শতশত শতাব্দী ধরে লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হয়েছে; তাদেরকে শেখানো হয়েছে — তারা সকলেই তত্ত্বলাভের অধিকারী নয়। সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা হয়েছে — তোমরা মানুষ হও। তাদেরকে আত্মতত্ত্ব শুনতে দেওয়া হয়নি। স্বামীজির উপদেশ, তারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক — তারা জানুক যে, তাদের মধ্যেও অতি নিম্নতম ব্যক্তির মধ্যেও আত্মা রয়েছেন — যাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাঁকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, যিনি অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী। এই তত্ত্ব সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হলে কি হবে ? স্বামীজি বলেছেন যে, 'মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হবে। বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হবে। এবং এই উপনিষদ্ প্রবেদিত আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা সমগ্র মানব জাতিকে ভালো বাসতে পারব। অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করেই নৈতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা পাব। যে একত্ব একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব, তার ব্যাবহারিক প্রকাশ কেবলমাত্র

প্রেমে।[১৫] উপনিষদ্ এই কথাই বলেছেন —

"যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে ।[১৬]

এই কথাই স্বামীজিও বলেছেন —

"I can not hate, I can not shun
Myself from me, I can but love."[১৭]

সুতরাং এই তত্ত্বকে জীবনে বরণ করে নিয়ে আমরা শৌর্যে, বীর্যে ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হব। সুতরাং এই আত্মতত্ত্বই সকলকে প্রতিনিয়ত শুনালে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আধুনিক সমাজে সমস্ত সমস্যার নিরশনার্থে অদ্বৈতবাদভাবনাই একান্ত উপযোগী।

প্রকৃত সাম্যবোধে অদ্বৈতবাদ

বেদান্ত বলেন "সমতা সর্বভূতেষু তন্মুক্তস্য লক্ষণম্" — সর্বভূতে সমতা বা সমদর্শনই মুক্তির লক্ষণ। এই মতবাদ মানুষে মানুষে যেরূপ চরম সাম্যভাবনা প্রচার করে, এরূপ আর কোন মতবাদ করে না। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অদ্বৈতদর্শন তুল্য যুক্তি বিচার সহ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত অসাম্প্রদায়িক সমত্ব দর্শন আর নেই । জগতে সকলই ব্রহ্ম। অদ্বৈতবেদান্তের মতে তত্ত্বজ্ঞান হলে সাধক সর্বভূতে সমত্বদর্শন করেন। মানব জীবনের সমুন্নতির এটাই পরা কাষ্ঠা। প্রেক্ষাবান্ মনীষীগণের এটাই কাম্য।[১৮]

নৈতিক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ

স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক সাম্যবাদকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে মানুষের কেবল অর্থনৈতিক জীবনেই নয়, পরন্তু তার সার্বিক জীবনেই প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমার মুক্তি লাভে ইচ্ছে থাকে তা হলে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ কর, তুমি ঈশ্বর হয়ে পরমানন্দ স্বরূপ নির্বাণ লাভ করবে ।[১৯]

অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বকে লাভ করতে গেলে দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধব্যক্তিত্বকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। যখন আমি প্রাণ স্বরূপ হয়ে যাব তখন মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পাব; আর যখন আনন্দস্বরূপ হয়ে যাব তখনই দুঃখ হতে নিষ্কৃতি পাব। যখন জ্ঞান স্বরূপ হয়ে যাব তখনই সমস্ত জাড্যমান্দ্য হতে নিবৃত্তি পাব। এটাই অদ্বৈতবেদান্তের যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানের প্রমাণে জেনেছি, অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু সমস্ত জড়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে যে শক্তি (Energy) আর জড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিরাজমান যে অসীম চেতনাশক্তি (unlimited conciousness) তার কোন পরিবর্তন নেই। সবকিছুকেই ভাঙা যায়, কিন্তু তাকে ভাঙা যায় না। সেটি অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিকগণও

তাকে অমান্য করেন না। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে অদ্বৈতচিন্তা প্রাসঙ্গিকই হবে, অপ্রাসঙ্গিক নয়।[২০]

গীতার উক্তি থেকেও স্বামীজি অদ্বৈতবাদের আধুনিক কালের উপযোগিতার কথা বলেছেন। গীতায় উক্ত হয়েছে — "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"[২১] — এই ধর্মের অল্পমাত্র আমাদেরকে মহৎ ভয় হতে পরিত্রাণ করে। তাই স্বামীজি বলেছেন যে, তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও বা আর যা কিছু হও — তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নেই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, এর অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও মহৎ কল্যাণ হয়ে থাকে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসে থাকবে না —উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পাচ্ছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকবে না। এখন অদ্বৈবাদকে কার্যে পরিণত করবার সময় আসছে — একে এখন স্বর্গ হতে মর্তে নিয়ে আসতে হবে, এটাই এখন বিধির বিধান। তিনি আরো বলেছেন যে, তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চ স্তর হতে ক্রমশ নিম্নে অবতরণ করে পৃথিবীর সকল জীবনে প্রবেশ করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, এটা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হোক, আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত হোক, আমাদের শিরায় প্রবেশ করে প্রতি শোণিতবিন্দুর সঙ্গে এটা প্রবাহিত হোক। এভাবে অদ্বৈতবাদ সকলকে সঞ্জীবিত করুক নতুন পথে পরিচালিত করুক ।[২২]

স্বামীজি বলেছেন, '.... অনেক সময় বলা হয় যে, ধর্মগুলি মরে যাচ্ছে, আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি মরে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সেগুলি কেবল মাত্র জন্মাতে শুরু করেছে।' ধর্ম যতদিন মুষ্টিমেয় নির্বাচিত কয়েক জনের হাতে বা একদল পুরোহিতের হাতে ছিল, ততদিন তা মন্দিরে, গির্জায়, পুঁথিতে, মতবাদে, অনুষ্ঠানে, প্রথায় ও পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। আর তারই ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মানসিক ঘটনাগুলির পর্যালোচনার ফলে যে সকল বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার প্রকাশ ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে দুঃখের বিষয়, এইরূপ পর্যালোচনাকে কেবল 'ধর্ম' নামেই অভিহিত করা হয় এবং যে ধর্মের উন্নত শির .... স্বর্গের গুপ্ত রহস্যকে ভেদ করছে সেই তথাকথিত বস্তুবাদী বিজ্ঞানের প্রকাশগুলির মধ্যে একটি সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলা অবিলম্বে প্রয়োজন। আর এই অদ্বৈতবাদের দ্বারা সেই সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলা সম্ভব হয়েছে।[২৩]

স্বামীজি ধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে, একটি যুক্তিবাদী ধর্মের উপর ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করে। এবং সেরূপ ধর্মও আছে। তা ভারতের অদ্বৈতবাদ এক পরম ও নিরাকার ভগবানের ধারণা। এটাই "একমাত্র ধর্ম, যা বুদ্ধিবাদী মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।"[২৪]

অতএব দেখা যায় অদ্বৈতবাদ ভারতকে বস্তুবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে । দুর্নীতিপরায়ণ শ্রেণীশাসন ও নিম্নস্তরের কুসংস্কারের আকারে বস্তুবাদ যখন ভারতকে গ্রাস করেছিল, তখন অদ্বৈতবাদী শঙ্কর বেদান্তের মধ্য হতে এক যুক্তি ও তত্ত্ববাদী

দর্শনকে বের করে বিনশ্বর বস্তুর মধ্যে এক শাশ্বত চেতনার আধিপত্য সঞ্চার করেছিলেন। আমরা আজ শঙ্করের বিচারশীল বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বামীজির প্রেম ও করুণার আশ্চর্য অসীম হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে পেতে চাই। আর এই মিলনের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হবে। এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন ঘটবে। আর এটা এমন একটা পথ হবে যা আধুনিক বিজ্ঞানের নিকটও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় এই পথেরই অন্বেষণ করে। যখন কোনো বিজ্ঞানের শিক্ষক বলেন যে, সকল বস্তু একই শক্তির প্রকাশ মাত্র তখন কি সেই উপনিষদে বর্ণিত ভগবানের কথাই মনে পড়ে না! এক অগ্নিই যেমন বিশ্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, একই আত্মাও তেমনি প্রত্যেক শরীরের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে এবং তা আরও বহুগুণে। অদ্বৈতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু সংযোগের ফলে অদ্বৈত বিজ্ঞানের কাছে কিছুমাত্র আত্মসমর্পণ করবে না, এবং বিজ্ঞান তার বাণী বদল করুক এই রূপ দাবিও করবে না। অদ্বৈত ও বিজ্ঞান উভয়ে যে একই মূল নীতিগুলিকে মেনে চলে, সেটিকেই আমাদের বুঝতে হবে।[২৫]

উসংহারে বলা যায়, শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদ হলো শ্বাশত সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ চূড়া যা বিশ্বে কেউ কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। আসলে ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় মহাপুরুষেরা ত্যাগ, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা, অনাসক্তি ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অদ্বৈত তত্ত্ব ভাবনার চরমতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা জাতি ধর্মের জন্য এতখানি ত্যাগ স্বীকার করেন নি। প্রাচীন কালে এই চূড়ান্ত পথখানি অরণ্যে পালন করা হোত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সেই বনের বেদান্তকে মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত করেছিলেন, এর ফলেই মানুষের আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসচেতনতা ও আত্মদর্শন সম্ভব। বর্তমান সমাজে এরূপ আত্মিক শক্তির একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়া মানব ধর্মের জয়গান এখানে সর্বাধিক গীত হয়েছে। মানুষ যে ভগবানের আত্মরূপ — তা মানুষের তেজস্বিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার মানব সমাজে একতার বুদ্ধিকে নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে পূর্ণতা আসে । সুতরাং জীবনের পূর্ণতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন অদ্বৈতভাবেই সম্ভব। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' এর বাস্তব প্রয়োগ অদ্বৈতবাদেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই আধুনিক সমাজে অদ্বৈতবাদের চেয়ে শ্রেয়তর অবদান অন্যান্য আর কোথাও নেই।[২৬]

অনস্বীকার্য্য যে, বর্তমানযুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে আমাদের অধিকার- গত হয়েছে অপরিসীম ভোগসম্ভার। অতএব আমরা এক বিষম বিষয় — ইন্দ্রিয়ানুগতার কবলিত হয়ে পড়েছি। বর্ত্তমান সমাজে আমরা অবিরাম পান, ভোজন, বিলাসভোগ — এছাড়া জীবনের আর কোনও লক্ষ্য আছে বলে ভাবতে পারি না। আমাদের সমাজ জীবনের মূল্যবোধে এখন এই একটি জিনিসই স্থান পেয়েছে তার নাম হচ্ছে সম্ভোগ। তার ফলে আজ সমাজে সর্বত্র এক নিদারুণ অসাম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। এই

সুবিপুল ভোগোপকরণ সৃষ্টির কার্যে আজ যাদের প্রাধান্য, সেই ধনিক বা বৈশ্য শ্রেণী আজ সমাজের কর্ণধার। আমাদের রুচি, পচ্ছন্দ ও শিল্পকলা বোধ এদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ তার সব মননশীলতা হারিয়ে ধনতন্ত্রের একটি পুতুলে পরিণত হয়েছে এবং তারই ফলে ধনবৈষম্য আজ অভ্রভেদী হয়ে মানুষের সমাজ জীবনকে অবরুদ্ধ করছে। কেবল ধনবৈষম্যই নয়, ক্ষমতাবৈষম্য, বিদ্যাবৈষম্য ও অধ্যাত্মচিন্তা-বৈষম্য জনিত নানা সমস্যায় নিদারুণ নিপীড়িত মানুষের সমাজ জীবনের এই সকল ভাবী সমস্যাগুলির কথা বহুকাল পূর্বে ভেবে স্বামীজি বিবেকানন্দ এর উপযুক্ত সমাধান সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে সমগ্র বিশ্বে অদ্বৈতবাদের অমৃতবাণীর প্রচার করেছেন। লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত সর্বসাধারণের সাময়িক মর্যাদা অর্জনের জন্য তাঁর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল যে, তোমরা উচ্চ বর্ণেরা তোমরা ভূতকাল, তোমরা শূন্যে বিলীন হও বেরুক নতুন ভারত ভুনাওয়ালা, ভুট্টাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। এ কার্য সম্ভব হবে কি করে ? বিবেকানন্দ বলেছেন, অদ্বৈতবাদের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। স্বামীজির অদ্বৈতচিন্তায় —

"all power is in everyone, all
knowledge is in every man", — সব মানুষের মধ্যে একই দেবত্বশক্তি সুপ্ত আছে। তাহলে কি করণীয় আমাদের ? আমাদের উচ্চ শিক্ষার দ্বারা সকলের মধ্যে একই বোধ জাগ্রত করতে হবে। শূদ্রসমাজকে ব্রাহ্মণ সমাজে পরিণত করতে হবে। এক কথায় দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ মানবজাতির শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।[২৭]

১। বেদান্ত দর্শন - অদ্বৈতবাদ। প্রথম খণ্ড। অষ্টম অধ্যায়, পৃঃ ১২৫
২। আচার্য শঙ্কর। পৃঃ ১৮৯
৩। 'জীব-শিব-বাদ। রমনী কুমার দাসগুপ্ত। শতবার্ষিকীর পত্রিকা দ্রষ্টব্য।
৪। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪/৩।
৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃঃ- ৭৭
৬। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ- ৪৬৮
৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪১ - ৩৪২
৮। স্বামীজির বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০
৯। বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ। পৃঃ - ৩৩
১০। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ। পৃঃ-৩৩
১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্। পৃঃ ৬/৮৭
১২। ছান্দোগ্যোপনিষদ্। পৃঃ ৬/২/১
১৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ- ৭৮
১৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ২২৭
১৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন। পৃঃ ১৮০-১৮১
১৬। ঈশোপনিষদ্ ১/৬

১৭। ৬৫ তম উদ্বোধন সংখ্যা হতে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৯০
১৮। যুগদিশারী বিবেকানন্দ । পৃঃ ৫০
১৯। 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' স্বামীজির বাণী ও রচনা সংকলন। পৃঃ ১৮১
২০। স্বামীজির বাণী ও রচনা। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ১৮
২১। শ্রীমদ্ভগদ্‌গীতা ২/৪০
২২। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন । পৃঃ ২১৭
২৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা।
২৪। 'অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ', বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৩৯
২৫। 'অদ্বৈত ও তাঁহার প্রকাশ', বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৪১
২৬। কঃ পন্থাঃ । পৃঃ ১০২
২৭। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ । পৃঃ ২১৬ - ২১৭

অদ্বৈতবাদ ও পাশ্চাত্যের 'ডুয়ালিজম্' (Dualism)

সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভূ মানুষের ইন্দ্রিয়গণকে বর্হির্মুখী করে সৃষ্টি করেছেন। বিষয়গুলিও মানুষের ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করে। সেইজন্য জীব কেবল বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। খুব অল্প লোকই আছেন যাঁরা ধীর ও স্থির, ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় থেকে টেনে মুক্তি লাভের ইচ্ছায় অন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।[১]

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েস্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যত্নেন বাজিনাম্ ।।"[২]

অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) নিয়ে পাঞ্চভৌতিক বাহ্য জগৎ তৈরি হয়েছে। ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে বন্ধন করাই বিষয়ের স্বভাব। "বিষিণ্বন্তি বধ্নান্তি ইন্দ্রিয়াণি আত্মানমেবেতি বিষয়াঃ।" শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়কে, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়কে, রস জিহ্বাকে, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করে। তাই শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়কে 'গ্রহ' ও বিষয়কে 'অতিগ্রহ' বলা হয়েছে।[৩] যিনি বিদ্বান তিনি ইন্দ্রিয়গণের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করতে সক্ষম হন। কিন্তু চার্বাকগণ তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের ইন্দ্রিয়ভোগের নিম্নগামী পথ দিয়ে নরকেই ঠেলে দিয়েছেন। অপর দিকে সাংখ্য, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বৈদান্তিকরা এর প্রবল বিরোধিতা করেছেন। বৈদান্তিক-ধুরন্ধর শঙ্করাচার্য অল্প বয়সেই ঐ সব দুর্দম অরিকুলকে তর্কযুদ্ধে পর্যুদস্ত করেছিলেন এবং উপনিষৎ-উপদিষ্ট ত্যাগমার্গকে প্রসারিত ও বিকশিত করেছিলেন। তিনি গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করে প্রচার করেছিলেন, আর সেই ষোড়শবর্ষীয় আচার্যের কথা এখন শুধু ভারতবর্ষেই নয় পাশ্চাত্য দেশেও ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সে কথা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (Maxmular) স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন।[৪]

পাশ্চাত্যের 'ডুয়ালিজম্' এবং প্রাচ্যের দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য

"কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি
কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্ ।
আত্মনা পূরিতং সর্বং
মহাকল্পাম্বুনা যথা ।।"[৫]

মহাপ্রলয়ে জলোচ্ছ্বাস যেমন সারা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয় — তেমনি ভাবে আত্মার দ্বারা সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ এবং আবরিত হয়ে রয়েছে। আত্মায় সব কিছু রয়েছে অন্তর্ভাবিত। তাহলে "কি আর আমার করার আছে ? কোথায় বা আমি যাব ? কোন্ বস্তুই বা করব গ্রহণ ? আর কি বা করব বর্জন ?" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[৬] — অর্থাৎ এই আত্মাই স্বয়ং ব্রহ্ম। আবার অন্য ভাষায় — "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[৭] — ব্রহ্ম বস্তু ছাড়া আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই। এটি অদ্বৈতবাদের মতবাদ। এখানে দ্বৈত বলে কিছু নেই — নেই দুটি জিনিসের অস্তিত্ব। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম —

সব কিছু ব্রহ্মে অবস্থিত । ব্রহ্মই সকলের মধ্যে আবার অন্যান্য সকলই ব্রহ্মে। কিন্তু এই বোধ বিকশিত হতে পারে না, অজ্ঞানের আবরণ থাকার জন্য। যখনই শাস্ত্রজ্ঞানে অজ্ঞানের নাশ হয়, তখনই "একম্ এবমাদ্বিতীয়ম্"[৮] — এই জ্ঞানের হয় উন্মেষ। কাজেই দ্বিতীয় কোন বস্তুর বিদ্যমানতা সেখানে অবান্তর। আবার 'সোহম্' অর্থাৎ তিনিই আমি এই ভাবনা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে একীভূত করে এবং এই একীভূত রূপই হল পরম সত্য বস্তু। এছাড়া যা কিছু তা অসত্য এবং ভ্রান্ত। ব্রহ্মই সত্য এবং বাকি সব অসত্য। এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য। গুরু গোবিন্দপাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের এই প্রজ্ঞা তদানীন্তন ভারতবর্ষকে অদ্বৈতবাদের পীঠস্থানে রূপান্তরিত করেছে ।[৯]

এখন পাশ্চাত্যের Dualism সংক্রান্ত আলোচনায় আসা যাক — "Dualism মানে "The Theory of Dual (Human Divine) Personality in Christ." পাশ্চাত্য মত অনুযায়ী পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের মধ্যেই মানব সত্তা এবং স্বর্গীয় সত্তা ছিল বিদ্যমান। মানবীয় দৈবসত্তা (Dualism) ভগবান্ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যেই বর্তমান ছিল বলে যদি কোন দিব্য চেতনাসম্পন্ন মানুষ যীশুখ্রীষ্টকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন বা প্রাপ্ত হন তাহলে তিনিও Dualism বা মানবীয় দৈবসত্তায় উন্নীত হয়ে যীশুখ্রীষ্টতুল্য হতে পারেন।

ভারতীয় অদ্বৈত দর্শন অনুযায়ী জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই, দুই নয় । পাশ্চাত্য মতে মানবসত্তা (Human) ও ঐশ্বরিকসত্তা (Divine) মিশে ভগবান্ যীশুর সত্তা প্রাপ্তি হয়। এবং এই অপূর্ব সত্তা বিশিষ্ট Christ প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। তাই প্রতিটি মানুষের মধ্যেই মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের Dualism বলতে Human personality of Christ অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের যে মানবীয় সত্তা — তা হল প্রাচ্যের মতে জীবভাব। আর Divine personality of Christ অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের যে স্বর্গীয় ভাব — তা প্রাচ্য মতে ঐশ্বর ভাব। কাজেই প্রতিটি খ্রীষ্টানের মধ্যে যে মানবীয় ও স্বর্গীয় ভাবের বিশ্বাস তার সঙ্গে আমাদের সনাতন শ্বাশত ধারার অদ্ভুত সামঞ্জস্য । কাজেই পাশ্চাত্যের Dualism হল যীশু প্রবর্ত্তিত একটি দ্বৈতমতবাদ। যীশুখ্রীষ্ট অনুভব করেছিলেন যে, তিনি পরম পিতার পুত্র। আমরাও প্রাচ্য দ্বৈতদৃষ্টিতে অনুভব করি যে, ভগবান্ প্রভু, আমরা তাঁর দাস। আবার এও অনুভব করি যে, ভগবান্ আমাদের পিতা আমরা তাঁর সন্তান। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ।[১০] যেমন সাধক রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মা বলে জানতেন। তা হলে রামপ্রসাদের মতে মানুষ হল ভগবানের পুত্র। একজন খ্রীষ্টানও Dualism এর দৃষ্টিতে অনুভব করে যে, সেও পরম পিতার পুত্র। কাজেই প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের দ্বৈতমত আর পাশ্চাত্যের Dualism হল একটি মুদ্রার দুটি দিক ।[১১]

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে যীশুর মতাদর্শের সামঞ্জস্য আছে কিনা ?

আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, সাধনার চরমাবস্থা অদ্বৈতানুভূতি যীশু লাভ

করেছিলেন, তাই তিনি বলেছেন ঃ "Know ye that the Kingdom of God is within you", 'I and my Father in heaven are one', "Be ye therefore perfect, even as your Father, which is heaven, is Perfect "— অর্থাৎ জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা অভিন্ন। তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ 'সত্য শিব ও সুন্দর' তুমিও সেইরূপ 'সত্য শিব ও সুন্দর' হও। যীশু বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিসহায়ে অনুভব করেছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে ইহুদী হোক, বা অন্য জাতি হোক, ধনী দরিদ্র, সাধু-অসাধু সকলেই তাঁরই ন্যায় সেই অবিনাশী আত্মস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য আহ্বান করেছেন।[১১]

অদ্বৈতবেদান্ত বলেন, 'সাধক দ্বৈতভূমি হতে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করে পরব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন।' যীশুও জ্ঞানের মণিকোঠায় আরোহণ করে বলেছিলেন ঃ — 'I and my father are one' – 'আমি ও আমার পিতা এক'। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' আমাদের এই শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে যীশুর অনুভবসিদ্ধ বাক্য সম্পূর্ণ মিলে যায়। বলা বাহুল্য, এই অদ্বৈতবাণীই পরিশেষে শত্রু কর্তৃক তাঁর জীবননাশের প্রধান কারণ রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। যীশু জানতে পেরেছিলেন, বিপদের ঘন মেঘরাশি তাঁকে চতুর্দিক হতে আবৃত করেছে। স্বার্থপর যাজককুল যীশু কর্তৃক তাদের সমস্ত পসার প্রতিপত্তি বিনষ্ট ও ধর্মবিশ্বাস আক্রান্ত দেখে প্রথমে তাঁকে নানারূপে অপমানিত ও নির্যাতিত করতে লাগলেন।[১২] কিন্তু যীশু তাঁর উদ্দেশ্য হতে অণুমাত্র বিচলিত হলেন না। শেষে যাজককুল স্থির সিদ্ধান্ত করলেন, এই পাপিষ্ঠকে একেবারে ধ্বংস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নেই। যীশুও মৃত্যু অতি সন্নিকটে বুঝে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে প্রচার কার্যে ব্যাপৃত হলেন, তাঁর একজন প্রিয়তম সন্তানকে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুগণের সঙ্গে ঘোর ষড়যন্ত্রে সংযুক্ত জেনেও তাঁকে ক্ষমা করলেন. তাঁর জনৈক শিষ্য একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "Lord how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times."

ঈশ্বরতনয় উত্তর করলেন —

"I say not unto thee until seven times, but until seventy times seven" এই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে যীশু জগৎকে দেখালেন — তিনি যা উপদেশ করেন তা স্বয়ং অনুষ্ঠান করতে পশ্চাৎপদ নন।

অতঃপর যীশুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ — তিনি পাপীকে ক্ষমা, পাপীদের সঙ্গে সুব্যবহার ও নিজেকে ঈশ্বর পুত্র বলে প্রচার করেন। বিচারক যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি কি বলেন আপনি 'messiah' অর্থাৎ ঈশ্বরপুত্র?" কঠোর প্রাণদণ্ড ধ্রুব জেনেও যীশু নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন 'I am' — হ্যাঁ আমি ঈশ্বরতনয়।' এই

ঘটনা আমাদিগকে সমজাতীয় অন্য একটা ঘটনার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে — শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন কাশীপুর উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত। দেহাবসানের আর দুদিন মাত্র বিলম্ব আছে। নিকটে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ শোকার্ত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবছেন — "এখন যদি তিনি বলতে পারেন — 'তিনি ঈশ্বর' তবে বিশ্বাস করব। শ্রীভগবান্ পুত্রের সন্দেহ দূর করবার নিমিত্ত অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন ঃ "হ্যাঁ, বৎস যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ"।[১৪]

পাশ্চাত্যের Dualism কখনো অদ্বৈতবাদের সমতুল হতে পারে না।

যীশুখ্রীষ্টের অন্তরে যে ঐশ্বরিক ভাবনা ছিল, তাকে আমরা উপনিষদের অমৃতত্ব ভাবনার সঙ্গে তুলনা করতে পারি — "ত্যগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ"। কিন্তু সনাতন শ্বাশত ধারার যে অদ্বৈতভূমি যেখানে একজন মানুষ বলতে পারে "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম — এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যের Dualism-এ নেই। কাজেই ভারতবর্ষীয় মুনি ঋষিদের অনুভব ও উপলব্ধিগম্য অদ্বৈততত্ত্ব শুধু ভারতবর্ষেই নয় — সমগ্র পৃথিবীর এক অনবদ্য অবদান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'যত মত তত পথ' এর কথা বলেছেন। কিন্তু এও বলেছেন যে — "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি তাই কর।"[১৫] স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় ভাষণ দেওয়ার কালে 'যত মত তত পথের কথা, ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সুমহান বৈদান্তিক অদ্বৈতজ্ঞান ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন বিদেশের বুকেও। তাই স্বামীজিরই গুরু ভাই স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজির উত্তর সূরী হয়ে পাশ্চাত্যের বুকে বৈদান্তিক প্রজ্ঞা তুলে ধরেছেন। আজ আর অদ্বৈততত্ত্ব শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত। দিকে দিকে ঘোষিত হচ্ছে অদ্বৈতবাদের জয়গান।[১৬] স্বামীজি তাঁর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছেন যে, বেদান্তের মধ্যেই দ্বৈতভাব, বিশিষ্টাদ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব নিহিত আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দ্বৈতভাবে বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে প্রতিটি জীবই হল পরমাত্মার অংশ। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব হল সর্বোচ্চ ভূমি যেখানে জীব অনুভব করে যে সে জীব নয় — তার পরিচয় সে পরমাত্মা। আত্মার এই স্বরূপজ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। তাই স্বামীজি নিজে আত্মজ্ঞানী হয়ে বহুরূপে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষই ভগবান্। মানুষের সেবা করা যা, ভগবানের সেবা করাও তাই। প্রতিটি জীবই আত্মা ও ব্রহ্ম স্বরূপ। প্রতিটি জীবই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধ।[১৭]

স্বামীজি বেদান্তের তিনটি মতবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, জগতের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে ও সকল মতেরই সমন্বয়স্থান হিসাবে। এপ্রিলের ২৪ তারিখে তিনি শ্রীযুক্ত ই.টি. স্টার্ডিকে লিখলেন "প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য — সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই যে মানব জাতিকে ভূতপূজা এবং ঐ জাতীয় কুসংস্কার

থেকে মুক্ত করতে পারে এবং কেবল সেটাই যে মানবকে তার স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমান করে তুলতে সমর্থ সে বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।[১৮]

পাশ্চাত্য দর্শনে স্বামীজির সম্মত অদ্বৈতবাদের প্রভাব

১৮৯৫ এর মে মাসের ৬ তারিখে স্বামীজি আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন, এখন তোমাদের কাছে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি স্তর আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিস্তর। এদের প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে। এই হলো ধর্মের সারকথা । ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, মত ও বিশ্বাসের প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম। এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ — ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম, আর সেমিটিক জাতিদের ভিতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম, অদ্বৈতবাদ আর যোগানুভূতির ভিতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন ভারতে ধর্ম বলতে বোঝায় সনাতন বৈদিক ধর্ম - বিশেষত বেদান্তের মতাদর্শ । বলা বাহুল্য, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন পারস্পরিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।[১৯]

তবে একথা সুস্পষ্ট যে, উপযুক্তভাবে বেদান্তের প্রয়োগসমূহের মধ্যে স্বামীজির প্রচারিত বেদান্তের সঙ্গে তাঁর নিজের দেয় বাণীকে একীভূত করার কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে লেখেন— আমি বলতে চাই যে, এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাৎ গোটা কতক অদ্বৈতবাদের মত জোগাড় করে তাকে বাইবেলে ঢুকিয়েছে ।[২০] যদিও যা তিনি বলেছেন এখানে তার চেয়ে বেশি কিছু এর দ্বারা বোঝান যায় না, কিন্তু এ চিঠিটির অধিকাংশ হলো অদ্বৈত বেদান্তের বজ্রনিনাদী সমর্থন। এবং এর দ্বারা তিনি অদ্বৈতকে ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীর মূল কথা হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। এ সময়ে তিনি তাঁর মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর লিখেছেন, যার মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর দেওয়া বাণীকে তিনি বেদান্তের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং তিনি এবিষয়েও সচেতন যে, বিশুদ্ধ আকারে ভারতের ধর্ম পাশ্চাত্যের পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়।[২১]

আরো বলা যায়, স্বামীজির মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরটি পাঠ করলে আমরা সকলেই দেখতে পাব যে, স্বামীজির সমস্ত বক্তৃতাগুলি ছিল ভারতবর্ষকে ঘিরে । তথাপি এটাও স্বীকার করতে হবে যে, সেই সময়ে তিনি তীব্রভাবে পাশ্চাত্যের প্রয়োজন সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই পাশ্চাত্যের কথা স্বামীজি তাঁর বাণী ও রচনাতে লেখেছেন। আজ পাশ্চাত্য তাঁর নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে এবং উন্নত

পাশ্চাত্যধর্মবিদ্‌দের লক্ষ্যও আজ মানুষের আসল স্বরূপ 'আত্মা' — এটা কি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক নয় ! যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনার দরুন পাশ্চাত্য ধর্মের প্রাচীর দুর্গ প্রাকার ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল জনসাধারণের অধিকাংশ গির্জার সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে এবং একটি অস্থিরতাব স্রোতে ভেসে চলেছে, সেখানে যে সমস্ত ধর্মমত আলোর উৎস মূল বেদ হতে জীবন লাভ করেছে — যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম কেবলমাত্র সেগুলিই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। অস্থিরতার স্রোতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসমান পাশ্চাত্য নাস্তিক মতের বা অজ্ঞেয়বাদের সমর্থকগণ গীতা কিংবা ধর্মপথের মধ্যেই একমাত্র সেই স্থানটি খুঁজে পায় যেখানে তাদের আত্মা বেঁধে রাখতে পারে।[২২]

তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, স্বামীজি অদ্বৈতবাদের যে সব বিষয়ের কথা বলেছেন সে গুলি কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের কথা নয়, প্রত্যেক ভারতীয় বা পাশ্চাত্য দেশীয় প্রত্যেক ধর্মমতের মিলন ক্ষেত্র এটি ।একমাত্র বেদই হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা সত্য ও পূর্ণপ্রজ্ঞ ঈশ্বরের কথা সর্বোৎকৃষ্টরূপে বলে, শ্রুতি যেখানে অনুগামীকে ধীরে ধীরে হাত ধরে একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে নিয়ে চলে, পূর্ণকে পাবার জন্য যে সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে চলা প্রয়োজন, তারা তাকে সে সকলের মধ্য দিয়েই নিয়ে চলে। সেখানে অন্য ধর্মগুলি যেন এই সকল বিভিন্ন স্তরের একটি বা অন্যটির প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের মধ্যে কোন অগ্রগতি নেই এবং সে যেন একটি শিথিলীভূত অবস্থা, সেজন্য জগতের অন্যান্য সব ধর্মই নামহীন, সীমাহীন, কালহীন বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সুস্পষ্ট যে, এখান থেকে পাশ্চাত্যের জন্য অদ্বৈতবাদকেই তার বাণী বলে ধরে নিতে পারি।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতীয় অদ্বৈতদর্শন এবং পাশ্চাত্যের Dualism-এর তত্ত্ব এক ও সমান না হলেও কিছুটা সাদৃশ্যের আভাস মিলতে পারে। এটি গবেষকের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা। পাশ্চাত্যের Dualism কখনো প্রাচ্যের সু-উচ্চ অদ্বৈতবাদকে তুলে ধরতে পারে না। কোথাও কিছুটা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকলেও বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্যের Dualism ভারতীয় প্রাচ্য দ্বৈতবাদের সাথে বেশ কিছুটা সাদৃশ্যযুক্ত ।

১। বিবেকচূড়ামণি । শ্লোক - ২৩
২। মনুসংহিতা ২/৮৮
৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য ।
৪। বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ। প্রথম খণ্ড । পৃঃ - ১৩৭
৫। ভারত সাধক। শঙ্করনাথ হতে উদ্ধৃত ।
৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩/৪/৫
৭। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩/১৪/১
৮। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/১

৯। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড । দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ - ৩৭২
১০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ২/৫
১১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস । দ্বিতীয় খণ্ড। পৃঃ - ২৬২
১২। শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন। পৃঃ ১৩২
১৩। শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন । পৃঃ ৪৫৩
১৪। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কাছে কথা বলেন (বাইবেল গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংগ্রহ) ।
১৫। রামকৃষ্ণের নিজস্ব বাণী।
১৬। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৩২২
১৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন । পৃঃ ১২০
১৮। স্বামীজির বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড। পত্র সংখ্যা - ১৭৬
১৯। স্বামীজির লেখা পত্র সংখ্যা - ১৭৭
২০। ঐ পত্র সংখ্যা - ১১৬
২১। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ । পৃঃ- ৪১৮
২২। স্বামীজির মাদ্রাজ অভিনন্দন সম্বন্ধে বক্তৃতার অংশ বিশেষ ।

বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বেদান্তের সংমিশ্রণে।

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জীবনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন জীবন মানে পূজা, নিজেকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা। এই জীবনের কোন ঘটনাই তাঁর নিকট ক্ষুদ্র বা নগণ্য নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আপাত দৃষ্টিতে যেটা বাহ্য ধর্ম তা নিয়েও চিন্তা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, যিনি সংসারকে অনিত্য অসার বলে ত্যাগ করেছেন, তাঁর চিন্তা জগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান, ইংরেজ ও ভারতীয় এই সব লৌকিক প্রসঙ্গ আনাগোণা করে কেন ? নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কিনা, তা দেখবার কি প্রয়োজন তাঁর ? কেন তিনি শূদ্র-শক্তির জাগরণে কামনা করেছেন ? সব দেশই তো তাঁর দেশ, তা হলে ভারতের প্রতি বিশেষ দরদ কেন তাঁর ? বেদান্তের কথা অনুসারে যা মিথ্যা সেই জগৎ নিয়ে সময় নষ্ট করা কেন? কেন তিনি একথা বলেছেন যে, যতক্ষণ একটা মাত্র কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তাঁর মুক্তি নেই । এ সবের কারণ জীবনকে তিনি অস্বীকার করেননি। অদ্বৈতবেদান্তবাদীর মতো তিনি ব্যাবহারিক সভ্যতা মেনেছেন। বুঝেছেন, এই জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনেব ঊর্ধ্বে যেতে হবে, মৃত্যুকে জয় করতে হবে। অমৃতত্ব লাভ করতে হবে। আর আমরা তাই দেখতে পাই, অত্যন্ত বাস্তববাদীর মতো স্বামীজি দারিদ্র্য দূর করতে চান, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ভিতর দিয়ে জীবনের মান উন্নত করতে চান প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাস্তব বুদ্ধির সংমিশ্রণের মাধ্যমে।[১]

প্রাচ্য দর্শন ও বিবেকানন্দ

এখন আমরা দেখব, আমাদের প্রাচ্য দর্শন কি বলছে ? প্রাচ্য দর্শন অর্থাৎ যট্ দর্শন (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত) কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে আর কখনও বা আত্মার অস্তিত্বে অবিচল। গৌতমের ন্যায়বিদ্যা যেখানেই যুক্তি ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে গুরুত্ব দেয়। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে দিয়ে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানকেই দুঃখ হতে মুক্তি লাভের উপায়রূপে স্বীকার করেছে। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শন চিত্তনিরোধের কথা ঘোষণা করেছে আর বলেছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি — এই অঙ্গগুলি

বিবেকজ্ঞানের উৎস। মীমাংসা দর্শনে দেখি, বেদের কর্মকাণ্ডের বিচারপূর্বক প্রতিষ্ঠা আর বেদান্তদর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চতম পর্যায়ে স্থিতিশীল বিচার যা সমগ্রদর্শনগুলির উপসংহার টেনে দিয়েছে। আবার নাস্তিক দর্শন জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন বা চার্বাকদর্শন — এগুলিও ভারতীয় দর্শন হিসাবে গ্রহণীয়।[২]

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য প্রজ্ঞায় প্রতিভাত মৌলিক অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন সমস্ত ভারতীয় দর্শনগুলিকে এক বিশেষত্ব দান করেছে। স্বামীজি কোথাও ন্যায়, কোথাও যোগ, কোথাও মীমাংসা, কোথাও বেদান্ত, কোথাও বা বুদ্ধ ও জৈন — এমনকি চার্বাক দর্শনকেও বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। মানুষের চিন্তা করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও ঈশ্বরকে দূরে ঠেলেছেন — মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি কোথাও বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' তরুণ ভারতবাসীর পৌরুষ জাগরণের জন্য তিনি গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার বুদ্ধের অহিংসা, সততা, শূন্যদর্শন স্বামীজির চোখে এক আদর্শের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। তাই সমগ্র ভারতীয় দর্শনগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বামীজির কী অসাধারণ মৌলিকত্ব। একদিকে ষট্ দর্শনের মূল উপজীব্য তাঁর দর্শনে যেমন বিশেষ স্থান পেয়েছে — অন্যদিকে তাঁর বিবেক, যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ও বাস্তবতাবোধ — এইসব গুলি সমস্ত দর্শনের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে এক অভূতপূর্ব মৌলিকত্ব সৃষ্টি করেছে।[৩]

পাশ্চাত্যদর্শন ও বিবেকানন্দ

আবার পাশ্চাত্য দর্শনগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি রেনাদেকার্তা ঈশ্বরের অসীম, অনন্ত, স্বনির্ভর ও সর্বব্যাপী ধারণাকে স্পষ্ট ভাষায় গুরুত্ব দিয়েছেন। স্পিনোজা দেকার্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেছেন যে, মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করলেও মানুষ নিয়মের অধীনে। এই সত্যটা জানতে পারলেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব।[৪] 'জনলক্' - এর মতে, আত্মার অস্তিত্ব নেই বললে, সেটা হবে একান্তই অযৌক্তিক।[৫] 'জর্জ বার্কলের' মতে, আমরা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না — কিন্তু আত্মায় যে কার্য উৎপন্ন হয় সেগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।[৬] 'ডেভিড হিউম' এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন যে, ঈশ্বরের সত্তার মত আর কোন সত্যই এত সুনিশ্চিত নয়। আমাদের সব আশার মূলে রয়েছেন ঈশ্বর — নৈতিকতার সুনিশ্চিত ভিত্তি হল ঈশ্বর।[৭] 'টমাস হব্‌স্' ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে ঈশ্বর অসীম নন। ঈশ্বর সম্পর্কে এই জাতীয় উক্তির অর্থ ঈশ্বরকে দুর্বোধ্য বলা। 'গটফ্রিড উইলেম লাইবনিজ' এই মত পোষণ করেছেন যে, ঈশ্বর হলেন সব কিছুর অন্তিম ভিত্তি স্বরূপ (ultimate ground at all things)[৮]। তবে পাশ্চাত্য দর্শন দেহবাদ বা জড়বাদকে স্বীকার করে তাকেই বেশি গুরুত্ব

দিয়ে আত্মসংযমকেই মূলকেন্দ্র থেকে বাইরে রেখেছেন। এই সমস্ত পাশ্চাত্যদর্শন অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যদর্শন ও পাশ্চাত্যদর্শন — সব কিছুর সোপান অতিক্রম করে অথচ সবকিছুকে স্বীকার করে (প্রয়োজনে কিছু অস্বীকার করে) রামকৃষ্ণ জীবন দর্শন থেকে রসদ সংগ্রহ করে এক নিজস্ব চিন্তায় অনন্য দর্শন সৃষ্টি করেছেন, যেটা তাঁর অভিনব মৌলিকতা দাবি করতে পারে ।

বিবেকানন্দের দর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাগরণ

স্বামীজি পাশ্চাত্য ভ্রমণে ১৮৯৫ - ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার গভীর সমস্যার যথার্থ সমাধান তুলে ধরেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনের সংমিশ্রণের মাধ্যমে। আর এটি করতে গিয়েই তিনি তাঁর বাণী-বীজ বপন করে দিয়েছেন মানুষের জীবনে, পাশ্চাত্য জগতের সামগ্রিক চেতনায়; সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। এভাবেই পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমশ একটা পরিবর্তন এসেছিল। বর্তমান যুগে প্রাচ্য ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে আগ্রহ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে স্বামীজিরই ঐ ভাবনার মৌলিকত্ব।[৯]

স্বামীজি বুঝেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ পৃথক। তাঁর মতে প্রাচ্যে মাতৃত্বের আদর্শকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে । পাশ্চাত্যে নারীর জায়ারূপ অধিক সমাদৃত। আমেরিকার নারীগণের মধ্যে কর্মশক্তির বিপুল প্রকাশ স্বামীজিকে মুগ্ধ করেছিল। এই উভয় আদর্শের সংমিশ্রণে নারী জাতির যথার্থ আদর্শ প্রকটিত হয়েছিল। প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি ও পাশ্চাত্যের কর্মশক্তি উভয়ের অনবদ্য মিলন অন্যত্র এরকমটি কোথাও দেখা যায় না। আর এরূপ এক আদর্শ সমন্বয়ের সন্ধান স্বামীজি পেয়েছিলেন সারদাদেবীর সংস্পর্শে এসে।

স্বামীজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি এত শক্তিশালী যে, পাশ্চাত্যের সংঘাতে কোনও দিন তা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে না। আর পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীরাও আজ এই আশা পোষণ করছেন।

তাই আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই অসাধারণ বিদুষী তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী ও প্রচণ্ড কর্মপরায়ণা ভগিনী নিবেদিতা ও সারদামায়ের মধ্যে। স্বামীজি এই নিবেদিতাকে উপস্থাপিত করেছিলেন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পদপ্রান্তে, আধুনিক শিক্ষায় যিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যা, লজ্জা ও অবগুণ্ঠনে আবৃতা এবং সর্বতোভাবে তদানীন্তন প্রাচ্য প্রথায় সংরক্ষণশীলা। নিজ স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র

ক্ষুণ্ণ না করে উদার অকপট চিত্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতাকে, সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রীশিক্ষারূপ কার্যে। নিবেদিতাও দ্বিধাহীন চিত্তে অধ্যাত্ম শক্তির কাছে নম্র শ্রদ্ধায় নত হয়েছিলেন। অপূর্ব মিলন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের।[১০]

স্বামীজি ভারতীয় জনগণের শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ দিকগুলির আত্মীয়তা বন্ধন ঘটিয়েছেন। স্বামীজি শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো — ''মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ'' "Education is the manifestion of the perfection already in man." জাতির নানা জ্বলন্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ ''তোমরা এখন যে শিক্ষা পাচ্ছ, তার কতকগুলি গুণ আছে বটে, আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে; আর দোষগুলি এত বেশি যে, গুণভাগ নগণ্য হয়ে যায়। ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না — ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিক মানসিকতাপূর্ণ। এমন শিক্ষায় অথবা অন্য যে কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভেঙে চুরে যায়। মৃত্যু অপেক্ষাও তা ভয়ানক।[১১]

ধর্ম ও সমাজে যে বাদ ও বিরুদ্ধ বাদের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বামীজি শুধু তারই এই সমন্বয় সাধন করেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার ফলে যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি হয় তার ফলে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের সভ্যতা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁর সমন্বয় পদ্ধতিতে এই সমস্যারও সমাধান করেন। পাশ্চাত্য সমাজশিক্ষা ও সভ্যতার যে অনেকগুলি গুণ আছে এবং তা গ্রহণ না করলে আমাদের উন্নতি লাভ করা অসম্ভব, একথা তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন ঃ ''সিংহের চর্ম পরলেই যেমন সিংহ হওয়া যায় না, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে ভারতবাসী তেমনি সাহেব হয়ে উঠতে পারে না। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং এটার পরিবর্তে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধি পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করতে হবে।'' — আর এভাবেই স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী এ যুগে সর্ব শ্রেষ্ঠ সমাদর লাভ করার যোগ্য।[১২]

বিবেকানন্দের মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ

বিবেকানন্দ প্রচলিত কোন গোষ্ঠীভুক্ত সমাজতন্ত্রবাদী নন, কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁর এই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। তাঁর মৌলিকত্বের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথমতঃ এর দার্শনিক ভিত্তি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে, এবং তাঁর সাম্যের ধারণা আধ্যাত্মিকতা নির্ভর। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বৈজ্ঞানিকত্ব তিনি প্রতিপাদন

করেছেন, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সূত্র দেখিয়েছেন তাঁর 'জ্ঞানযোগ' ও 'Science of religion' (ধর্ম বিজ্ঞান) গ্রন্থে। তার সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান সংযুক্ত করে তিনি এক অভিনব সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের দিয়েছেন, যাকে আমরা 'Historical Scientific Spirituality' (ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ) নামে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু এই 'Scientific Spirituality' (বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ) এর সঙ্গে 'Scientific materialism' (বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদ) -এর সম্পর্ক আছে। তিনি উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন।[১৩] খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয় একথা। কিন্তু এ অতীব সত্য কথা। তিনি 'The Mission of Vedanta' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন "It seems clear that the conclusions of modern materialistic Science can be acceptable, harmoniously with their (Indian) religion only to the Vedantins or Hindus as they are called. It seems clear that modern materialism can hold its own and at the same time approach Spirituality by taking up the conclusion of Vedanta. It seems to you, and to all who come to know, that the conclusions of modern science are the very conclusions of Vedanta reached ages ago; only in modern science they are written in the language at matter."[১৪] আধুনিক বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, বেদান্ত বহুযুগ পূর্বেই সেখানে পৌঁছেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি জড়কে অবলম্বন করে। তাঁর মতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদ প্রতিপাদন করেছে জড়বস্তুর শক্তির (energy) একত্ব, আর বেদান্ত করেছে আত্মার একত্ব। 'একত্ব' উভয়েরই প্রতিপাদিত বস্তু। সেইজন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও বেদান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য সূত্র রয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান অফুরন্ত শক্তিকে মেনেছে। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে বস্তুত অসীম শক্তির আধার সত্যবস্তু 'আত্মা'কে প্রতিপাদন করেছে। অবশ্য এই 'আত্মিক ঐক্যে' পৌঁছতে আধুনিক বিজ্ঞানের হয়তো খুব বেশি দেরি হবে না। দর্শন ও বিজ্ঞান বর্তমান যুগে এক চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ স্বম্পূর্ণ সতন্ত্র মৌলিক ভাবনা। তাকে আমরা 'Historical Scientific Spirituality' (ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ) আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু এই Scientific Spirituality (বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ) ধর্ম, দর্শন ও 'Scientific materialism' (বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্র)-এর সমন্বয় প্রসূত। তিনি ইতিহাসের 'Spiritualistic interpretation' (অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) দিয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি পেয়েছেন শ্রেণী সংগ্রামবাদ এবং আসন্ন শূদ্রসংস্কৃতি বিশিষ্ট শূদ্রশাসনবাদ। কিন্তু সেখানেই ইতিহাসের গতিচক্র থেমে যাবে না। তাঁর মতে আদিম সমাজ ছিল সাম্য

সমাজ, কিন্তু তা মূলত ব্রাহ্মণদের উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন সাম্য-সমাজ। অধঃপতনের ফলে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়েছে। পুনর্বার চক্র ঘুরে যাবে, শ্রেণীবিশিষ্ট শূদ্রাদি সমাজ শ্রেণীবিহীন ব্রাহ্মণ সমাজে উন্নীত হবে। তাঁর 'Proletkut'-এ শূদ্র ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটবে। সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্ম তপশ্চর্যা, সত্য, শিব ও কল্যাণের ওপর। সেইজন্য এখানেও বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেমন মৌলিকত্ব আমরা দেখছি তাঁর 'Proletarian classless Society (দরিদ্রতম শ্রেণী সংগ্রাম) ও 'Proletkut' (একনায়কতন্ত্র)এর ধারণায় তিনি লেনিন প্রভৃতির পুরোগামী ছিলেন।

তাঁর কর্মপন্থার অভিনবত্ব আমাদের বিশেষ লক্ষণীয়। কর্মানুশীলনে শিক্ষা ও বেদান্তোক্ত উদার বিশ্বজনীন ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কাজ বৈপ্লবিক সংগঠন পদ্ধতিতে করতে হবে। যুবশক্তিকে তিনি এমন করে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, সেটা বিদ্যুৎবেগে সমুদ্র তরঙ্গের মতো প্লাবিত করে ফেলবে দেশকে এবং সে তরঙ্গ পৌঁছবে চাষার লাঙলের পাশে, শ্রমিকের কারখানাতে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশে । এবং যে কর্মপন্থায় ধর্ম ও আদর্শকে নির্ভর করে জনসাধারণকে চালিত করা স্থান পায়নি, তিনি সে ধরণের কার্যসূচির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। জাগ্রত জনগণের বিবেকের বিচার শুভফলপ্রদ — এ বিশ্বনিয়ম তিনি জানতেন; এবং এও জানতেন, 'Liberty of thought and action' (চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা) কে প্রথম স্থান দিতে হবে মানবীয় অধিকার পদ্ধতিতে ।[১৫]

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দের অভিনব সমাজতন্ত্রবাদের যে কয়েকটি যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা, তা সম্পূর্ণ মৌলিক। এ তত্ত্বগুলি হল ঃ জীবের দেবত্ববাদ, জীবনের অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক পরিণতিবাদ, বিশেষ সুবিধাবাদ, ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, উত্থান-পতনের নিয়মে সমাজ বিবর্তনবাদ, শ্রেণী সংগ্রামবাদ, ইতিহাসের চক্রাকার গতিপথবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ।[১৬]

সব শেষে বলা যায়, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতি শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝে থাকে। আর এটাও বলা যায় নদী-শৈল-সাগরসমন্বিতা নানা শক্তি ও ভাবমণ্ডিতা বাহ্য প্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু তা অপেক্ষাও মহত্তর মানবের অন্তঃ প্রকৃতি সূর্য-চন্দ্র-তারকা, পৃথিবী তথা সমগ্র জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জগতের গবেষণায় প্রাধান্য লাভ করেছে, প্রাচ্য জাতি তেমনি এই অন্তর্জগতের গবেষণার শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে। অতএব এটাই সঙ্গত যে, যখন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রাচ্য হতেই হয়ে থাকে। আবার যখন প্রাচ্য জাতি যন্ত্র নির্মাণ শিক্ষা করতে ইচ্ছা করে, তখন তাঁকে যে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসে এটা শিখতে হবে, এটাও সঙ্গত। পাশ্চাত্য জাতির যখন

আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ড রহস্য শিখবার প্রয়োজন হবে, তখন তাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

স্বামীজি বেদান্তাদি বাণীর সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐকতান বিভিন্নতার মধ্যে একতার সুর পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমস্ত মত ও পথকে স্বীকার করেও একের অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতাকে তিনি চুরমার করে দিয়েছেন। এটাই স্বামীজির মহত্ত্ব ।

তাই বলি আসলে স্বামীজি ছিলেন একজন ঋষি - সত্যদ্রষ্টা ঋষি । আধুনিক কালে তাঁর মত ও পথই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখতে পারে। পাশ্চাত্যের জড়বাদ, দেহবাদ ভস্মীভূত হয়ে গেছে প্রাচ্য দর্শনের বৈদান্তিক ত্যাগ দর্শনের অমল আলোতে। স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটিয়েও প্রাচ্যের ত্যাগনির্ভর বৈজ্ঞানিক দর্শনকে সুমেরুতুল্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

১। The Life of Swami Vivekananda Vol - II
২। বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ। প্রথমখণ্ড, পৃঃ- ১৭
৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা সংকলন। পৃঃ ১৭৯
৪। পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃঃ - ৯২
৫। ঐ, পৃঃ - ১৫১
৬। ঐ, পৃঃ - ১৯৪
৭। ঐ, পৃঃ- ২৮৭
৮। ঐ, পৃঃ- ২২৫
৯। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ। প্রথম খণ্ড। পৃঃ- ৪২৪-৪২৫ ।
১০। বিবেকানন্দ - স্মারকগ্রন্থ । পৃঃ- ১০৩ - ১০৪ ।
১১। বিবেকানন্দ - শত-দীপায়ন। পৃঃ - ৮৯
১২। যুগদিশারী বিবেকানন্দ (স্বামীজি শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে) পৃঃ- ১৭১
১৩। উদ্বোধন ৬৫ তম। (সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ) পৃঃ- ২০৩
১৪। Dr. A. N. Bose – Science and Philosophy at the crass road
১৫। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষসূচী (সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবোকানন্দ)
১৬। ঐ - ২০৬

চতুর্থ অধ্যায়

নবচেতনার উন্মেষে বিবেকানন্দের আত্মদর্শন

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে যে ধর্মাচার্যেরা অবতীর্ণ হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যের স্ব স্ব উপলব্ধির কথা মানুষের কল্যাণে প্রচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি।

স্বামী বিবেকানন্দ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবই আত্মস্বরূপ, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ কিন্তু আত্মা মায়ার আবরণে আবৃত। যখনই এই মায়ার আবরণ ও অজ্ঞানের শক্তি অপসৃত হয় তখনই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে আত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। আ-ব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম। ভারতবর্ষের বেদান্তমার্গের এই পরিপূর্ণ জ্ঞান যে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে আলোড়িত করতে পারে তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।[১]

বিবেকানন্দ উপনিষদের বা বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন ও সমাজ গঠন করতে সমর্থ হয়। উপনিষদের মূল সত্য বা তত্ত্ব আত্মা যা একমাত্র উপলব্ধিগম্য। মানুষের আত্মা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা মহান বস্তু তা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য উপনিষদ্ এবং ভগবদ্ গীতার ন্যায় বিবেকানন্দও পুনঃ পুনঃ আত্মার মহিমা অনুভব করে বহু ভাষণ প্রদান করেছেন।[২]

আত্মার স্বরূপ সমীক্ষায় স্বামীজির দৃষ্টি

বেদান্তে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মা বলা হয়েছে । এই ব্রহ্ম বা আত্মার কোন ভেদ নেই। স্বামীজি এই আত্মার বাস্তবিক একত্ব নিত্যত্ব ও চেতনস্বভাবকে নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন ।

হিন্দু দর্শনের চূড়ান্ত বিচার হল, অনন্ত কখন দুটি হতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মাই থাকতে পারে। আর এই যে অনেক বলে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা, এটা সত্য নয়; এটি ঔপাধিক - কাল্পনিক । অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মা ।[৩]

অদ্বৈতবাদীর মতে জগতে সত্য বস্তু একটিই আছে, তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম হতে উদ্ভাবিত। তাই স্বামীজি বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল পুনরায় সেই ব্রহ্মে ফিরে যাওয়া। আর আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্ম। সেই সত্য, কিন্তু মায়াসমন্বিত। তবে যদি এই মায়া বা অজ্ঞানের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করতে পারি, তা হলে আমরা প্রকৃতপক্ষে যা তাই হব। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার বাইরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এস্থলে প্রথমে ছান্দোগ্য 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎ কারণ ঈশ্বরের জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ হেতু তাঁকে (ঈশ্বরকে) সকলের আত্মা বলে নিরূপণ করে, তিনিই সত্য, তিনিই তুমি অর্থাৎ আমি শব্দবাচ্য চেতন পুরুষ বলে নিরূপণ করেছেন। তদনন্তর সেই তুমি ও আমি রূপী সেই ঈশ্বর তাঁর উপাধিবর্জিত অবস্থা বলে উপসংহার করেছেন কোনোপনিষদেও ব্রহ্ম ও আত্মার (জীবের) একত্ব উপদিষ্ট হয়েছে — "অনদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"[৪] — অর্থাৎ তিনি বিদিত (হেয় কার্য্য) হতেও অন্য, অবিদিত (উপাদেয় কারণ) হতেও অন্য । আত্মা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও শরীরের স্বরূপ। সুতরাং সেটি হেয় না। আত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, তাই উপাদেয় নয়। আত্মাই অহেয় অনুপাদেয়, উদাসীন। আলোচ্য মন্ত্রে ব্রহ্মকে অহেয় অনুপাদেয় বলায় আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ উভয়ের একত্ব প্রমাণিত হল। সেই কার্য ও কারণাতীত অপরিচ্ছিন্ন দুরূহ আত্মতত্ত্বটিকেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবাসীদের বোধগম্য করে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণাবিহীন বা বিপরীত ধারণাবিশিষ্ট দুর্জ্ঞেয় স্বরূপটিকে বোঝানোর জন্য পাশ্চাত্য শ্রোতৃবর্গের কাছে স্বামীজিকে অনেক সরল কথাও বলতে হয়েছে, আবার অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বেরও অবতারণা করতে হয়েছে ।[৫]

দেহ জড় কিন্তু দেহের মধ্যে আত্মা জড় নয়। যেহেতু আত্মা জড় নয়, অতএব আত্মা যৌগিক বস্তু হতে পারে না, এবং যৌগিক পদার্থ নয় বলে আত্মা প্রাকৃতিক কার্য কারণ নিয়মের অধীনও নয়, সেই জন্য আত্মা অমর। যা অমর তা অনাদি, কেননা যার আদি আছে, তারই অন্ত আছে। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা চেতন নিরাকার; জড় ছাড়া আকার থাকতে পারে না। সকল সাকার বস্তুরই আদি অন্ত আছে । আমরা কেউই এমন সাকার বস্তু দেখি না, যার আদি ও অন্ত নেই, যেমন একটা চেয়ারের একটা বিশেষ আকার আছে; এর অর্থ এই যে, কিছু পরিমাণ জড়ের উপর কিছু পরিমাণ শক্তি কার্য করে ঐ জড়কে একটি বিশেষ আকার ধারণ করতে বাধ্য করে। এই আকারটি জড় ও শক্তির সংযোগজ। এই সংযোগ শাশ্বত হতে পারে না, সংযোগ কালক্রমে ভেঙে যায়। এই কারণে সকল আকারই আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট। আমরা জানি, আমাদের দেহ বিনষ্ট হবে; এর আরম্ভ বা আদি ছিল, একদিন এর শেষ হবে। কিন্তু আকার নেই বলে আত্মা এই আদি অন্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা অনাদি কাল হতেই আছে; কাল যেমন শাশ্বত মানবের আত্মা ও তেমনি শাশ্বত। আত্মা

সর্বব্যাপী। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত মতে আমার, তোমার, সকলের মধ্যে আত্মা পরিব্যাপ্ত। স্বামীজি একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, তুমি যেমন পৃথিবীতে আছ, তেমনি সূর্যেও আছ; যেমন আমেরিকায় আছ, তেমনি ইংলণ্ডেও আছ। আত্মা দেহ মনের মাধ্যমেই কার্য করে এবং যেখানে দেহ মন আছে সেখানে তার কার্যও দৃষ্ট হয়।[৬]

জীবের সর্বব্যাপিত্বাদি স্বরূপ নিরীক্ষা

জীবের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম। ব্যাবহারিক জীব তাঁর প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। জীব তার ঐ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুষ্ট প্রতিবিম্বমাত্র। অতএব ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ হয়। এজন্য বলা হয়েছে — 'জীবো ব্রহ্মৈব, নাপরঃ'।[৭] ব্রহ্ম হতে পৃথক সত্তা জীবের নেই। এজন্য শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভাব বিবক্ষিত হয়েছে। অভেদ উক্ত হয়নি। আত্মা (জীব) নিত্য, বদ্ধ নয়। তাকে বন্ধন করার শক্তি কারও নেই। এই ব্যাবহারিক জীব, দেশ কাল ধর্মের দ্বারা উপহিত হওয়ায় বদ্ধ বলে প্রতীত হয় অর্থাৎ বোধ হয় "তিনি যেন বদ্ধ হয়ে রয়েছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি বদ্ধ নন" সুতরাং জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ এই, তিনি সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য স্বভাব; সুতরাং তিনি নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অপরিমিত আনন্দস্বরূপ। 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'[৮] বিজ্ঞানমানন্দ-ব্রহ্ম। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত, সুতরাং জন্ম মৃত্যুর প্রশ্ন আসতে পারে না।[৯]

ন্যায় বৈশেষিক প্রমুখ দার্শনিকেরা আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলেন। এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন আত্মা জ্ঞানস্বভাব, জ্ঞানবান্ নয়। আত্মা জ্ঞানবান এই কথা বললে 'জ্ঞান' ও তার আশ্রয় দ্রব্যের সঙ্গে ভেদ অথবা অভেদ, কিংবা ভেদাভেদ এই তিনটির মধ্যে কোনটি সে, এই প্রশ্ন উঠবে। যদি জ্ঞান ও তার আশ্রয় দ্রব্যের ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহলে আত্মা ও জ্ঞান অনিত্য হয়ে পড়বে, কারণ যেখানে যেখানে 'ভেদ' আছে সেখানে সেখানে 'অনিত্যত্ব'ও থাকে। সর্ববাদিসম্মত ঘর, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থে ভেদ থাকায় সেগুলি অনিত্য। তাহলে তো বিপক্ষীগণের পক্ষে আকাশ ইত্যাদিও অনিত্য হয়ে পড়ে আর আত্মার নিত্যত্বকথা ব্যর্থ হবে। আবার জ্ঞান ও তার আশ্রয় দ্রব্যের অভেদ স্বীকার করলে যেটা আশ্রয় সেটাই আশ্রয়ী হয়ে যায়। এতে আশ্রয়াশ্রয়ীভাব সম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়। তাই জ্ঞান ও জ্ঞানবান্ উভয়ের অভেদ কল্পনা উপপন্ন হয় না। আর যদি একান্তই অভিন্ন স্বীকার করতে হয়, তা হলে প্রকারান্তরে বলা হল, জ্ঞানই আত্মা। আর ভেদাভেদ বিরুদ্ধ বলে এটা স্বীকৃত হতে পারে না।[১০]

অতএব দেখা গেল যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অনন্ত হওয়ায় নিত্য বা সত্য। এখন একটা আশঙ্কা উঠতে পারে, এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিত্য হলেও বহু নিত্য জ্ঞান অর্থাৎ বহু আত্মা স্বীকার না করে একটি আত্মা স্বীকার কেন করব? লোকেরা নিজের

নিজের আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে মনে করে। তাছাড়া 'আত্মা একটা' স্বীকার করলে একজনের মুক্তি হলেই সকলের মুক্তি হয়ে যায় বলে ধরতে হবে। এক 'আত্মা' মানলে একজন বদ্ধ আর একজন মুক্ত কিভাবে হতে পারে ? এর উত্তরে স্বামীজি বলেছেন যে, বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমি (জীব)। শুধু তাই নয়, তুমিই তিনি (ঈশ্বর)। তুমি তাঁর সঙ্গে অভিন্ন 'তত্ত্বমসি'[১১]। যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেই খানেই বিবাদ। আত্মা জানেন তা নয়, আত্মা নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ; আত্মা সুখী তা নয়, আত্মা অপরিমত সুখ স্বরূপ।[১২]

এটাও স্বামীজি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ঐ জ্ঞান নিত্য বা সত্য। সত্য মানে সত্তাবান নয়। কিন্তু সত্তাস্বরূপ। অবাধিত সত্তাস্বরূপ জ্ঞানই আত্মা। আত্মাকে সত্তাবান্ বললে সত্তা আত্মার ধর্ম হয়। ধর্মধর্মীভাব যেখানেই থাকে, তা অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন ও জড় হয়। সেজন্য আত্মা অবাধিত সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। এই আত্মা আবার আনন্দস্বরূপও। কারণ সমস্ত প্রাণীর স্বীয় আত্মার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম রয়েছে। অন্য বিষয়ে বা অন্য লোকের উপরে যে ভালবাসা তা সব সময় থাকে না। কিন্তু নিজেকে সবাই ভালবাসে সব সময়ের জন্য। অন্যের উপর ভালবাসা কৃত্রিম। এইভাবে মানুষের নিজের উপর যারপর নাই ভালবাসা দেখে বোঝা যায় যে, আত্মা অপরিমিত সুখস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ)। আনন্দস্বরূপ না হলে আত্মাতে প্রত্যেক জীবের অকৃত্রিম ভালবাসা হত না। স্বামীজি এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। সেই আনন্দ নিত্য ও নিরতিশয় উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'ভূমানন্দ'। 'সদা মে সুখং ভূয়াৎ। দুঃখং মা ভূৎ' — সর্বদা যেন সুখই হয়, দুঃখ যেন কখনো না হয়। জীবের স্বস্ব অনুভূতিও আত্মার নিত্যত্ব ও নিরতিশয়ত্বে প্রমাণ। আত্মা বস্তুতঃ এক হলেও দেহাদিরূপ উপাধির ভেদবশতঃ বহু বলে মনে হয়। তাই এক দেহ অবচ্ছেদে আত্মার মুক্তি হলেও অপর দেহ অবচ্ছেদে আত্মার বন্ধন সম্ভব হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির অব্যবস্থা হয় না। সকল দেহে বস্তুতঃ একই আত্মা আছেন —- এটি না জানার জন্যই জগতে যত বিভেদ অনৈক্য দেখা যায়। সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বেদান্তের এই জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মা এক ও অদ্বিতীয় — অদ্বৈত বেদান্তের এই তত্ত্ব সকলে উপলব্ধি করতে পারেন না। সাধন না থাকায়, অনেকে এই অভিন্ন আত্মার ধারণাই করতে পারে না। সেজন্য বেদান্তে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীকেই এই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হত। কিন্তু স্বামীজি বলেছেন এই অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞানে সকল মানুষের অধিকার আছে; বিশেষতঃ এই আধুনিক যুগে পৃথিবীর সবাইকে এই তত্ত্ব শোনানো প্রয়োজন। এইখানেই স্বামীজির উদারতা ও অপূর্বতা। এটিই তাঁর নবচেতনা। কারণ অতীতে শাস্ত্রকারগণ কেউই সকল মানুষকে এই তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী বলেন নি।[১৩]

ব্রহ্মাত্মার শক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতি বিধৃত রয়েছে, প্রকৃতির সকল স্তরে নিয়মের

শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আবার যে অমিত শক্তির মাহাত্ম্যে প্রকৃতি নিয়মিত হয়, তিনি ব্রহ্মাত্মা জগৎ কারণ সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর। যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে। সেই আত্মা হতে আকাশ উৎপন্ন হল, আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল ইত্যাদি "তস্মাদাকাশ উৎপন্ন, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ।[১৪]

ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উপায়

ব্রহ্মবাদের বিপক্ষে একটি প্রশ্ন এসে পড়ে যে, আত্মা যদি শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ হয়, অসঙ্গ অবিনাশী, একরস চৈতন্য স্বরূপ হন তবে তা হতে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ উদ্ভূত হয় কিরূপে ? বৈচিত্র্যবর্জিত একরস বস্তু হতে বিচিত্র কার্যের উদ্ভব হল কি করে ? সমাধানে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে যে, জগৎ কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিতর্কের অন্তে ঋষিগণ ধ্যানযোগে অবস্থিত হয়ে পরম দেবতার আত্মভূত ত্রিগুণের দ্বারা প্রচ্ছন্ন শক্তিকেই দেখতে পেলেন।[১৫] সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের সাহায্যে ব্রহ্মাশ্রিত শক্তিই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির কারণ। আত্মা একরস শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ হলেও আত্মার বিচিত্র শক্তি বিচিত্র বিশ্বের বীজ বলে অভিহিত হয়। সুতরাং আত্মশক্তি হতে বিচিত্র জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়।[১৬]

বৃহদারণ্যক ব্রহ্মাত্মা হতে সকল বিশ্বের সৃষ্টি বর্ণনা করে ও ব্রহ্মাত্মাতেই লীয়মান সকল নানাত্বের (সকল বৈচিত্র্যের) নিষেধ করেছেন। মনের দ্বারাই দর্শন করতে হবে এতে (ব্রহ্মাত্মাতে) নানা কিছু নেই ।[১৭]

যে ব্রহ্মাত্মা হতে জগৎ সৃষ্ট সেই ব্রহ্মাত্মাতেই নানাত্বের নিষেধ নানাদর্শনের নিন্দা এবং 'নানা ইব' এই রূপ উক্তির দ্বারা বিচিত্র সৃষ্টির মিথ্যাত্বই সূচিত হয়েছে। ব্রহ্ম বিবর্তের উপাদান । এখানে অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায়ে ব্রহ্মের সৎ স্বরূপতাই সূচিত হয়েছে। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বলে এবং সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম স্বরূপ বলে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ং সিদ্ধ। স্বতঃ সিদ্ধ বলেই নিরপেক্ষ সত্য — পারমার্থিক সত্য। সেই পারমার্থিক সত্যের দৃষ্টিতে যা কিছু চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত প্রমাণ সিদ্ধ তাই সাপেক্ষ সত্য বলে ব্যাবহারিক সত্য বা মিথ্যা।[১৮]

এতাদৃশ পারমার্থিক সত্যকে পূর্ণরূপে জীবনে জানতে পারলে তবেই সত্য লাভ হয়, নতুবা মহতী বিনষ্টি হয়ে থাকে।[১৯] এই ব্রহ্মাত্মাকে পূর্ণরূপে জানতে হলে অনাদি মূল অবিদ্যাকে বিনাশ করতে হয়, অবিদ্যার পর পারে যেতে হয়। প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হয়েছে। আপনি আমাদের পিতা যিনি আমাদের অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।[২০]

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতির দ্বারাই ঐ অবিদ্যার নাশ হয়। কেননা, আমাদের যে ব্রহ্মাত্মার অজ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মে জগদ্দর্শন বা আত্মাতে কর্তৃত্ব,

ভোক্তৃত্বাদি নানা ধর্মদর্শন হয় তা প্রত্যক্ষভ্রম। এরূপ প্রত্যক্ষভ্রম দূর করতে হলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানই প্রয়োজন। কারণ পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষভ্রমের নাশ হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন ঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"[২১] — আত্মাকে দর্শন করতে হবে। কি উপায়ে দর্শন করা যাবে, দর্শনের সাধন রূপে যাজ্ঞবল্ক্য "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২২] — এই উপদেশ করে বলছেন যে, দর্শনের চিরন্তন উপায় — শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতিবাক্য অথবা গুরুর মুখ হতে ব্রহ্মাত্মা বিষয়ে শ্রবণ করতেহয়, তদনন্তর সেই বিষয়ে অসম্ভাবনা বুদ্ধি দূর করার জন্য যুক্তি তর্কের দ্বারা মনন করতে হয়। মননের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব ও তার ব্রহ্মত্ব সম্ভব মনে হলেও তখন বিপরীত সংস্কার বা ধারণা দূর করার জন্য সতত তাদৃশ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মাত্মার ধ্যান করতে হয়। এগুলিই ব্রহ্মাত্ম সাক্ষাৎকারের হেতু বা সাধন।[২৩] কিন্তু এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানকে ফলপ্রসূ করতে হলে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের সাধনা আবশ্যক হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেছেন ঃ অতএব এটা জেনে শান্ত, দান্ত, উপরতিযুক্ত, তিতিক্ষা যুক্ত এবং সমাহিত হয়ে (জীব) আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করে। সব কিছুকে আত্মা বলে দর্শন করে।[২৪] এই বাক্যে যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি এবং সমাধির কথা বলা হয়েছে তা যোগাঙ্গেরই অনুরূপ। আবার কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে, যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সঙ্গে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি ও কোন প্রকার চেষ্টা করে না, তাকেই পরমা গতি বলা হয়। এই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকেই যোগ বলা হয়।[২৫] আবার বলা হয়েছে যে, মুমুক্ষুকে দুশ্চরিত বা পাপ হতে বিরত থেকে, বহিরিন্দ্রিয় সকলকে সংযত ও বশীভূত করে, অন্তরিন্দ্রিয় মনকে শান্ত ও সমাহিত করে শ্রবণ ও মননের অনন্তর নিদিধ্যাসনের সাহায্যে ব্রহ্মাত্মার দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভব করতে হবে। শ্রবণের দ্বারা আত্মার প্রাথমিক ধারণা উৎপন্ন হয়। এটা পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষানুভূতি নয়। সংশয় বা অসম্ভাবনা বুদ্ধি দূর হয় মননের দ্বারা। তদনন্তর নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত সংস্কার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধির সংস্কার অথবা আত্মা কর্তা, ভোক্তা, দেহে সীমাবদ্ধ ইত্যাদি সংস্কার বিনষ্ট হয়ে ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষানুভূতি বা দর্শন হয়ে থাকে। "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা"[২৬] — একাগ্রবুদ্ধির দ্বারাই (আত্মা) দৃষ্ট হয়। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[২৭] — মনের দ্বারাই দর্শন করতে হবে। ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এই আত্মদর্শন শুদ্ধ একাগ্রবুদ্ধির দ্বারাই হয়ে থাকে। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তত্ত্ব তং পশ্যতে নি ষ্কলং ধ্যায়মানঃ"[২৮] । বিশুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষ ধ্যান করতে করতে তারই ফলে বুদ্ধির নির্মলতা লাভ করে সেই নিষ্কল ব্রহ্মাত্মাকে দর্শন করেন।

স্বামীজি বলেছেন ঃ আত্মা স্বভাবত স্বরূপত শুদ্ধ ও মুক্ত, কার্যকারণাতীত, অবিনাশী। কিন্তু এটা যদি সত্য হয় অর্থাৎ আত্মা যদি মুক্ত স্বভাব হন, তবে বাইরের কোন বস্তুই এর উপর কখনো কার্য করতে পারবে না — তা হলে আত্মা কখনও মরে না।

আত্মা কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত।[২৯] কঠোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ "অন্যত্রস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ"[৩০] অর্থাৎ (আত্মা) এই কার্য ও কারণের অতীত।

বেদান্তকথা অনুসরণে স্বামীজির আত্মদর্শন

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের কথা অনুসরণ করে স্বামীজি বলেছেন — "হে মৈত্রেয়ি স্ত্রীর জন্যই কেউ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে (নিজেকে) ভালবাসে, সেহেতু স্ত্রীকে ভালবেসে থাকে। এই জগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তা জগতের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু জগৎ তার প্রিয়। অতএব এই প্রাণাধিক প্রিয় আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করতে হবে, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ এর ধ্যান করতে হবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হও।[৩১]

স্বামীজির শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এপর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা হল — আত্মা অবিনাশী নিত্য সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ। আত্মা বিষয়ী জ্ঞাতা, আত্মা বিষয় হতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ বা স্বয়ং প্রকাশশীল। তিনি সকলকে প্রকাশ করেন, কিন্তু নিজে কারও দ্বারা প্রকাশিত হন না। আত্মা আনন্দ স্বরূপ বলে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রিয়তার জন্যই অপর সকল বস্তু প্রিয় হয়। বিবেকানন্দ এর অনুসরণ করে বলেছেন ঃ "হে মৈত্রেয়ি আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হয়।"[৩২] এই আত্মার জ্ঞানের দ্বারা সব কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ সকল বস্তুই তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাদেরকে আত্মা হতে পৃথক রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোক সমূহ, এই দেবগণ এমন কি যা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।[৩৩] আত্মাকে সকলের সঙ্গে অভিন্ন বলে জানতে হবে। নচেৎ আত্মা হতে ভিন্ন যা দেখবে তা হতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে এই স্থলেই অদ্বৈতবাদের উপস্থাপনা রয়েছে। কোন কিছুকেই কারও আত্মা হতে ভিন্ন দেখবে না। 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা[৩৪] এই সবই আত্মা"।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে আরো জানা যায়, মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের যে উপদেশ আছে তাতে অমৃতত্ব লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ীর যে জিজ্ঞাসা — "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"[৩৫] । আর এই জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই বাইবেলে — What profits us if we gain the world but lose our own Soul? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সংসারে যা কিছু আমাদের প্রিয়, তা আত্মার জন্যই । এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, আত্মাকে শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা যায়। এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন, এটিও অদ্বৈতবেদান্তের

সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকৃত, বৈদান্তিকগণও সেই জীবন্মুক্তির কথাই বলেছেন। স্বামীজিও এই ত্রিবিধ সাধনের দ্বারা আত্মোপলব্ধির কথা প্রচার করেছেন।[৩৭]

ভদবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানও আত্মার অমরতার কথা বলে অর্জুনকে ক্লৈব্য পরিহার করার ও ভয়শূন্য হবার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮] কিন্তু কঠোপনিষদের বীর্যবান ও শ্রদ্ধাবান নচিকেতার চরিত্রই স্বামীজিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, পিতার যজ্ঞকালে বালক নচিকেতার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। স্বামীজি বলেছেন, এই শ্রদ্ধা কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে শ্রদ্ধা বলতে বোঝায়, সংকল্প সাধনে দৃঢ় ও অবিচলিত নিষ্ঠা যা মানুষকে সহস্র প্রলোভন জয় করতে শিক্ষা দেয়, আর যে নিষ্ঠার ফলে মানুষ ধর্মের পথ থেকে কুশলের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না। নচিকেতা যখন মৃত্যুরাজের কাছে পরলোকের রহস্য জানতে চাইলেন, তখন মৃত্যুরাজ তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসু বালক কোনো প্রলোভনেই বিচলিত হন নি। তখন যম তাঁকে বলেছিলেন — "তুমি বালক হয়েও যে প্রেয়ের পথকে পরিহার করে শ্রেয়ের পথ বেছে নিয়েছ, সে জন্যে তুমি প্রশংসার যোগ্য।"[৩৯] তারপর যম নানাভাবে আত্মতত্ত্ব ও আত্মলাভের উপায় বিবৃত করে বললেন ঃ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ বিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।[৪০]

তোমরা উত্থিত হও মোহ নিদ্রা ত্যাগ করে জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে গমন করে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হও; যাঁরা ক্রান্তদর্শী তাঁরা বলেন — আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুর ধারের মত দুর্গম দুরতিক্রমণীয়। সুতরাং স্বামীজির স্বীকৃত ও প্রবর্ত্তিত নবচেতনার উন্মেষ মন্ত্র ছিল — উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী দুটি দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সহায়তায় আত্মদর্শন বা আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ, দ্বিতীয়তঃ ভারতদর্শন অর্থাৎ ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল।[৪১] কারণ অমৃত আস্বাদন করেও সেই অমৃত সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকার বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি। তিনি জীবন রহস্যের সন্ধান পেলেন, কিন্তু সেই রহস্য কক্ষের চাবিকাঠি রইল শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে। শিষ্যের আকাঙক্ষা তিনি অহরহ সমাধিস্থ হয়ে থাকবেন, গুরুর আকাঙক্ষা, তাঁর শিষ্য বিশাল বটগাছের মতো হাজার হাজার লোককে আশ্রয় দান করবে। স্বার্থান্বেষী লোকের মতো নিজের মুক্তি কেন তাঁর কাম্য হবে ? তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ।[৪২] হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হয়ে

থাকার সঙ্কল্প নিয়েই বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবন শুরু। কিন্তু বারবার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনার গভীরতম উপলব্ধির আকর্ষণে তিনি জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্যকেসহজে স্বীকৃতি দিতে চাননি, তার ফলে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সঙঘর্ষ। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব ও সঙঘর্ষের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে জীবনের গভীর তাৎপর্য অভিব্যক্ত হয়েছিল। হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল মানব জাতির প্রতি সমবেদনায় ও ভালবাসায়। মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার প্রতি তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন যে হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে, লোকের দুঃখ অনুভব করতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, খুব অনুভব করছি। এই অনুভূতি কি সেই বুদ্ধদেবের নয়? স্বামী তুরীয়ানন্দ যেন পরিস্কার দেখতে পেলেন মানব জাতির সমগ্র দুঃখ স্বামীজির হৃদয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। স্বার্থপরতার অপনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরার্থপরতার অসামান্য অবিচল নীতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। তার এই অনুভূতি আত্মদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি বা নীতির উপর নয়।

''আমাদের বিশ্বাস সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত, একজনের সঙ্গে আরেক জনের পার্থক্য কেবল এই কোথাও সূর্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই আত্মাই সকল ধর্মের ও সকল সনাতন নীতির ভিত্তি স্বরূপ।'' এই আত্মতত্ত্ব স্বামীজির কাছে প্রতিপাদনীয় তত্ত্বমাত্র ছিল না, চরম উপলব্ধির বিষয় ছিল। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণচিন্তার মূলে ছিল এই আত্মদর্শন।[৪৩]

আমিই ব্রহ্ম, আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, শাশ্বত, সত্য, সৎ ও আনন্দ ঘন — এই উপলব্ধিতে মানুষ পৌঁছাতে পারলেই অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করা যায়। সেখানে জীব জীব নয়, সে একটি পরমাত্মা ব্রহ্ম। এবং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' — স্বামীজির এই চেতনা সমাজ জীবনকে করেছিল আলোড়িত। ভারতবর্ষের পরাধীনতার যুগে এক মহামানব নবীন সন্ন্যাসী বৈদান্তিক বাণী নিয়ে পৃথিবীকে নবচেতনায় শিক্ষা দিলেন যে, মানুষ মর্তবাসী হয়েও অমৃত স্বরূপ।

১। স্বামীজির বাণী ও রচনা ঃ সঙ্কলন। পৃঃ - ১২১

২। বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা। পৃঃ ৬৭

৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা। দ্বিতীয় খণ্ড। পঞ্চমসংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ-৩০

৪। কেনোপনিষদ্ ১/৪

৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ২৩৭

৬। স্বামীজির বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড। পৃঃ ২৩৭-২৩৮

৭। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা শঙ্করাচার্য শ্লোক ২১

৮। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ - ২/১/২

৯। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ২২,
১০। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ১৭৮
১১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ - ৬/৯/৭
১২। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৯৪
১৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ - ৬/৯/৭
১৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৯৪
১৫। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ১৮১
১৬। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/১/৩
১৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১/৩
১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১/৩
১৯। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৪/৪/১৯
২০। কঠোপনিষদ্ ২/১/১১
২১। কেনোপনিষদ্ ২/৫
২২। প্রশ্নোপনিষদ্ ৬/৮
২৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৫
২৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ২/৪/৫, ৪/৫/৬
২৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৬২-৬৩
২৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৪/২৩
২৭। কঠোপনিষদ্ ২/৩/১০-১
২৮। কঠোপনিষদ্ ১/৩/১২
২৯। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৪/১৯
৩০। মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/১/৮
৩১। স্বামীজির বাণী ও রচনা সঙ্কলন ঃ ১২৩
৩২। কঠোপনিষদ্ ১/২/২৫
৩৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৫৮
৩৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৫/৬
৩৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৫৯
৩৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৫
৩৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৩
৩৮। শতাব্দী জয়ন্তী উদ্বোধন পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।
৩৯। স্বামীজির বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৬০-৬১
৪০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বিশ্বরূপ দর্শনের অংশ বিশেষ।
৪১। কঠোপনিষদ্
৪২। কঠোপনিষদ্ ১/৩/১৪
৪৩। যুগদিশারী বিবেকানন্দ। পৃঃ ৬০
৪৪। যুগনায়ক বিবেকানন্দ। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১৫২
৪৫। যুগদিশারী বিবেকানন্দ। পৃঃ ৬১

বিবেকানন্দের আত্মদর্শন ও শাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বস্তু বিষয়ক উপলব্ধি একই চৈতন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, এবং ঐক্যবদ্ধ হয় বলে প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন কালে একই আত্মার অভেদানু- সন্ধান হয়। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞায় একই ব্যক্তি বা আত্মচেতনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জড়িত থাকে । সুতরাং আত্মচেতনা ব্যতীত কোনও রকম চেতনা বা জ্ঞানই সম্ভবপর নয়। ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "প্রতিবোধবিদিতং মতম্"[১]। আত্মচেতনার সঙ্গে বিষয়ের চেতনা জড়িত, কারণ আত্মাকে কখনও শুধু তার নিজের চেতনার মধ্যে ধরা যায় না। অতএব আত্মচেতনা ও বিষয়ের চেতনা বোধশক্তির একটি ক্রিয়ার দ্বারা যুগপৎ অভিব্যক্ত হয়। অনাত্মার জ্ঞানকালে একই সঙ্গে আত্মার জ্ঞান হয়। এটি আমরা বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস হতে জানতে পারি ।

আত্মচেতনার দ্বারা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি লাভ

স্বামীজি আরো বলছেন, বিষয়ের মধ্যে যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থাকে তা নয়, অধিকন্তু এটার মধ্যে এমন একটি ঐক্যও থাকে, যা অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তকে একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করে। আমাদের নিকট একটি বিষয় হতে পারে, যখন একই জ্ঞানে একই বিষয় রূপে সংযুক্ত হয়।[২] সুতরাং আত্মার ঐক্য বিষয় চেতনার একটি পূর্ব নিয়ামক, কিন্তু এটা যদি কেবল একটা শূন্য গর্ভ ঐক্য হোত, তা হলে আমরা এই ঐক্যকে জানতে পারতাম না। আত্মার বিশেষ বিশেষ অনুভূতি সকলের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের তুলনাতেই আমরা আত্মার এই ঐক্যকে উপলব্ধি করতে পারি ।[৩]

আত্মচেতনা দ্বারা আত্মা ও বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধে জাগ্রত চেতনা

সমগ্র বিবর্তনের ধারাকে বেদান্তের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকেও প্রগতিশীল ক্রমবিকাশ বলে বিবেকানন্দ মনে করেন। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশের সমগ্র যাত্রাপথই বেদান্তের দৃষ্টিতে শাশ্বত অসীম আত্মার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে প্রকাশ। এটি জড়ের বিকাশ এবং আত্মার প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর জীব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, আদি প্রাণী ছিল চৈতন্যবান্, স্বীয় আত্মিক সত্তায় সত্তাবান্। এই আত্মিকসত্তা ক্রমশ বেড়ে চলল ক্রমবিবর্তনের পথে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এই চেতনা ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় আরও পরিস্ফুট হল এবং পরিণামে পরিবেশ ও প্রকৃতির উপরে প্রাণীর বিজয়াভিযান অধিকতর দ্রুত প্রসারিত হল।

স্বামীজির মতে ক্রম উন্মোচিত এই চেতনায় নবদিগন্ত যখন দেখা গেল তখন ক্রমবিকাশের পথে মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এর আগে পর্যন্ত যে সব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তারা মুখ্যতঃ বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধেই সচেতন ছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিল অন্তর পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুটি রূপ সম্বন্ধেই মানুষের চেতনা জাগ্রত হল।

এইভাবে এবং বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানে বেদান্তের এই অন্তর পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতাই বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এটি চেতনা ক্ষেত্রে একদিকে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসায়, অন্য দিকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করল।[৪]

আত্মচেতনার দ্বারা বিজ্ঞান দর্শন ধর্মতত্ত্ব মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানের উন্মেষ লাভ

অতঃপর বলা যায় ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করলাম তাতে বোঝা গেল মানুষের মধ্যে সত্তায় যে রহস্য তাই হচ্ছে আত্মার রহস্য। আত্মার এই রহস্যের সমাধান না হলে বিশ্বের কোন রহস্যই উন্মোচিত হবে না। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব কোন কিছুই আমাদের এই বিশ্বজগতের রহস্য পুরোপুরি সমাধান করতে পারবে বা; এগুলি শুধুমাত্র অনুমান প্রমাণের গোলক ধাঁধায় ঘুরতে থাকবে। চরম সত্যের মত একটি বিষয়ে কেবল মাত্র অনুমান করেই ভারতীয় মন তৃপ্ত থাকতে পারে নি। ভারতীয় ঋষিরা সাহসিকতার সঙ্গে অন্তর জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন, চেতনা ও অহং বোধের সূত্র ধরে তাঁরা প্রবেশ করে নশ্বরের পিছনে অবিনশ্বরকে খুঁজে পেলেন, সসীমের গভীরে পেলেন অসীমকে।[৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথা বলা হয়েছে; যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম আত্মা সর্বান্তরঃ''[৬] বহু উপনিষদে বার বার এই সত্যের কথাই বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবেও মানুষের চিন্তার মধ্যে এমন এক শক্তি রয়েছে যার সাহায্যে সে একটি সামান্য সূত্র দিয়ে বিশাল বিশ্বজগৎকে যদি ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে নিত্য অসীম আত্মার ক্ষেত্রেও কি তার অনন্ত শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়? বিশ্ব জগতের রহস্য শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হল মানুষের স্বীয় অন্তর রহস্যের সমাধান করে। উপনিষদের ঋষিরা উপলব্ধি করলেন, বিশ্ব রহস্যের কেন্দ্র মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এবং এই কেন্দ্রকে খুঁজে পেলেই মানুষ তার শাশ্বত সত্তাকে অনুভব করতে পারে। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্বজগৎ আত্মার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর এই সত্যের উপলব্ধিতেই মানব জীবনের পূর্ণতা।[৭] 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায়ঃ—

''যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।

অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ।।"[৮]

এ ছিল এক আশ্চর্য আবিষ্কার আনন্দের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল আবিষ্কার। উপনিষদের ছত্রে ছত্রে এরই অনুরণন চরম সত্য আত্মায় উপলব্ধি করে ঋষিরা জ্ঞানের চরমে পৌঁছালেন, উপনীত হলেন চেতনা, শান্তি ও আনন্দের পরিপূর্ণতায়। খুঁজে পেলেন সত্য, জ্ঞান আর আনন্দের চিরপ্রস্রবণকে, পেলেন সৎ চিৎ আনন্দকে ।

স্বামীজি শাস্ত্র বাক্য অনুসরণ করে বলেছেন যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, ধারণা শক্তি কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। ঐকান্তিকতার সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভে প্রয়াসী সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্ব স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অন্তর্যামিরূপে আত্মা যাঁকে অনুগ্রহ করেন, তাঁরই নিকট আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।[৯]

আত্মচেতনার দ্বারা বন্ধন নাশ

স্বামীজির মতে আত্মদর্শনের অভাবে অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মার দেহের সঙ্গে ভ্রান্ত সম্বন্ধ বোধ হয়। দেহ সম্বন্ধবোধই আত্মার বন্ধন । বন্ধাবস্থায় আত্মা তার ব্রহ্মরূপত্ব বিস্মৃত হয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন দুঃখী ও দুস্থ জীব বলে ভাবে এবং মনে করে যে, সে অসার কাম্য বস্তু পেলেও সুখী হয়। সে নিজেকে দেহ মনের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে। এটা হতেই তার অহংজ্ঞান বা আমিত্ববোধ জন্মে এবং অন্য বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। অহং বা আমি বাস্তবিক আত্মা নয়; এটা আত্মার এক প্রাতিভাসিক পরিচ্ছিন্ন রূপমাত্র।

স্বামীজি আরো বলেছেন, আত্মদর্শন না হলে মানুষের বন্ধাবস্থায় আত্মার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন হয়। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃ করণের মাধ্যমে বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ হয়। স্বামীজি এরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে দু-ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। একটি হল প্রত্যক্ষ ও অপরটি হল পরোক্ষ। আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে জানতে পারি। জল কোন নালী দিয়ে কোন জমিতে পড়লে জমির আকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অন্তঃকরণ কোন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে বহির্বিষয়ে গমন করলে তদাকারে পরিণত হয় এবং তা হলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। পরোক্ষ জ্ঞানকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করেছেন — অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি । এইসব প্রমাণ বিষয়ে অদ্বৈতমত ভট্ট মীমাংসা মতের অনুরূপ।[১০]

আরো বলা যায় — সুষুপ্তি কালে আত্মার দেহ সম্বন্ধবোধ থাকে না। আত্মার দর্শন হলে তা হতে আত্মার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আত্মা স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র ও দুঃখী জীব নয়। তবে এটা অহং বা আমি নয়, এবং ত্বং বা তুমি নয়। এর বিষয়

বাসনাও নেই এবং তজ্জন্য শোক ও দুঃখ নেই। এটি বাস্তবিক অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। স্বামীজির মতে আত্ম দর্শন হলে এইসব সম্বন্ধে জানতে বা বুঝতে আমাদের বেশি সময় লাগে না। আত্মদর্শনের ফলে সব বিষয় সহজে অবগত হয়।[১১]

স্বামীজির মতে আত্মদর্শন হলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। তাই আমরা আত্মা সম্পর্কে বেদান্ত বা উপনিষদের যে সর্বপ্রধান তথ্য ও ঘোষণা পাই তা হল ''অয়মাত্মা ব্রহ্ম''[১২] — এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা জানি এটি হল বেদের অন্যতম মহাবাক্য। বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ সর্বদাই ভাবুন — 'আমি ব্রহ্ম'। অন্যচিন্তা দুর্বলতাজনক বলে দূর করে দিতে হবে।'' তিনি আরও বলেছেন যে, সাধনার দ্বারা যে আপনাদেরকে এই ব্রহ্ম হতে হবে তা নয়, আপনারা তো পূর্ব হতেই 'ব্রহ্ম' আছেন, আপনাদেরকে ঈশ্বর হতে হবে বা পূর্ণ হতে হবে, একথা সত্য নয়।আপনারা সর্বদা পূর্ণস্বরূপই আছেন। তিনি আবার অন্যত্র বলেছেন আমরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর হতে অভিন্ন। কিন্তু যেমন এক সূর্য লক্ষ শিশির বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়ে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সূর্যরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বর বহু জীবাত্মা রূপে প্রতিভাত হল।[১৩]

আত্মচেতনার দ্বারা জড়তামুক্তি

স্বামীজি গীতার একস্থান হতে বলেছেন যে, বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হলে মাধুর্যের আস্বাদন পাওয়া যায়; রোগের প্রশমন হলেই ঔষধের মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্ ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, যখন চৈতন্য এসে তাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে। তেমনি শাস্ত্রের আলোচনা অথবা যোগাদির অভ্যাস তখনই উপযোগী হয়, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞা পাওয়া যায়। এইভাবে আত্মানুভূতি লাভ করার ফলে অর্জুন নিঃশঙ্ক চিত্তে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন এবং বললেন — হে দেব, আপনার বাক্য আমি মেনে নিলাম। সত্যই আমার প্রতীতি হয়েছে যে, আপনি দেব ও মানবের বুদ্ধির অগম্য, আপনার উপদেশ বাক্য শ্রবণ না করে কেউ নিজ বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানতে পারে না — এই বিশ্বাস আমার নিশ্চিতভাবে হয়েছে। অতঃপর বলা যায়, অর্জুন আত্মদর্শন লাভ করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৪]

''স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তমম্।
ভূতভাবনভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।''[১৫]

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ দৃপ্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করে বলেছেন যে, 'তত্ত্বমসি'[১৬] তুমিই তিনি, তুমিই ব্রহ্ম। তোমার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর। তাহলে বুঝতে পারবে তুমিই সচ্চিদানন্দ চিরমুক্ত চিরশুদ্ধ পরমাত্মা, তুমিই সেই একমাত্র দৈবীসত্তা যিনি বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। তুমিই সূর্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই

অগ্নি, তুমিই ঝঞ্ঝা, তুমিই মহাকাল, তুমিই মহাতরঙ্গ; যা কিছু সবই তুমি। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মায়াচ্ছন্ন হয়ে তুমি সুখ দুঃখ ভালোমন্দ লাভ-ক্ষতির মিথ্যা জালে আবদ্ধ হয়ে ক্লিষ্ট হচ্ছ। জেগে ওঠ, আত্মোপলব্ধি কর। তাহলে প্রত্যক্ষ করবে তুমি সুখ দুঃখ ভালোমন্দ লাভক্ষতির সমূহ জাগতিক দ্বৈতবোধের অতীত অখণ্ড আনন্দ, পরা শান্তি, চরম জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম।[১৭]

আর এই পরম সত্যকে লাভ করতে হলে প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞান বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। তাই বিবেকানন্দ সবাইকে বলেছেন নির্ভীক হতে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে তিনি যে মন্ত্ররত্নটি উদ্ধার করেছিলেন সেটি হল 'অভীঃ'। তিনি বারবার বলেছেন — দুর্বলতা বা ভয়ই একমাত্র পাপ।[১৮] গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি যে শ্লোকাংশের উল্লেখ করেছেন সেটি হল —

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"।[১৯]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন — ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, দুর্বলতা ও ভয় ত্যাগ করে অসীম সাহসে উদ্বুদ্ধ হও, তবেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অর্জুন তদনুরূপ আচরণ করেছিলেন, তাই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের মহান্ সৌভাগ্য ঘটেছিল আত্মচেতনার বলে বলীয়ান হয়ে। বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন — "কোন কিছুতেই ভয় করো না। ভয় কিসের ? তুমি ব্রহ্ম, তোমার আবার ভয় কাকে ? তুমি ছাড়া আর কেই বা আছে ? কাকে তুমি ভয় করছ ?" প্রত্যেককেই আপন চেষ্টায় আপন সাধনায় আপন বীর্য বলে পরম সত্যকে লাভ করতে হবে। একজন অন্ন গ্রহণ করলে অন্য জনের যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ একজনের সাধনায় অপর জনের সিদ্ধিলাভ কখন সম্ভব নয়। গুরু শুধু পথ- প্রদর্শক, শিষ্যকে সেই পথের যাত্রী হতে হবে, তবেই সিদ্ধি লাভ হবে তার নিজের করায়ত্তের মধ্যে। তাই বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ সবাইকে বলেছেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হতে, আত্ম- প্রত্যয় সম্পন্ন হতে। তিনি বলেছেন, আমরা নিজের চোখ ঢেকে যদি চিৎকার করি কেউ এসে আমাকে আলো দেখাও তবে এটি হবে নির্বোধের মত বাক্য। কারণ চোখ হতে যদি আমরা হাত সরিয়ে নিই তা হলে সব অন্ধকার চলে যাবে। স্ব চেষ্টাতেই চোখের মোহ কালিমা মুছে ফেলতে হবে। তাহলে সেই মুহূর্তে নিখিল বিশ্ব এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তবে এই সমস্ত কথা স্বামী বিবেকানন্দ নিজ আত্মদর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই বলেছিলেন।[২০]

আত্মচেতনার দ্বারা ঈশ্বর লাভ

তিনি আরো বলেছেন, আত্মদর্শন লাভ হলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরকেও আমরা জানতে পারব। আর না হলে আমরা শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরকে জানতে পারব না।

আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরম পুরুষের জ্ঞান যা বাহ্য জগৎ হতে পাওয়া যায় না। অন্তরের মধ্যে আত্মার ঐ তত্ত্ব অন্বেষণ করতে হয়। বাহ্য জগৎ আমাদেরকে সেই অনন্তের কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করলেই এই সংবাদ পাওয়া যায়। এইভাবে কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই ঈশ্বরকে জানতে পারা যায়।

যাঁর আত্মদর্শন লাভ হয়েছে তিনি পরমাত্মস্বরূপ হন। আত্মা মন ও স্থূল শরীর উভয় হতেই পৃথক, এই ধারণাটি পরিষ্কারভাবে তাঁর মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে নিয়ে এক দেহ হতে দেহান্তরে গমন করে; আর যখন পূর্ণত্ব লাভ করে তখন এর আর জন্ম মৃত্যু হয় না — তখন এর মুক্তি হয়ে যায়; ইচ্ছে করলে জীবাত্মা এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখতেও পারে অথবা একে পরিত্যাগ করে অনন্ত কালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে যেতে পারে, মুক্তিই জীবাত্মার লক্ষ্য।[২২]

স্বামীজি বলেছেন আত্মা আনন্দ স্বরূপ, আর লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নেই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারীর ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আরোপ করা ভ্রমমাত্র — শরীর সম্বন্ধেই তা সত্য। আবার আত্মার কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হতে পারে না। সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হলেন, একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হয়েছি, জ্ঞানোদয়েই অজ্ঞানের নাশ হলে মুক্ত হব। জ্ঞানই আমাদেরকে এই অজ্ঞানের পর পারে নিয়ে যাবে। এই জ্ঞান লাভের উপায় কি ? ভক্তি পূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তি হলে জ্ঞানের উদয় হবে, অজ্ঞান দূরীভূত হবে, সকল বন্ধন টুটে যাবে এবং জীবাত্মা মুক্তি লাভ করবেন।[২৩]

আত্মচেতনা দ্বারা মানস উন্নতি ও চরিত্র গঠন

আবার গীতা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে পুরুষকার বা আত্ম নির্ভরতাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়। গীতার দর্শন অনুযায়ী লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হলো লোক জীবন। যেমন মা তাঁর শিশুকে শেখাবার সময় তার মধ্যে অহং ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগিয়ে তোলেন। সেই কারণে এমন কি এই শিক্ষাকেও বেদান্ত আত্মজ্ঞানের অঙ্গ রূপে বিবেচনা করে। আত্মানুভূতির প্রথম উন্মেষ ঘটে যখন শিশুটি নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক একজন মানুষ বলে ভাবতে শুরু করে —

আমি একজন বিশেষ কেউ, আমার একটা নিজস্ব সত্তা আছে, আমি কেবলমাত্র একটা মাংসপিণ্ড নই, বাহ্য প্রকৃতিতে আমি শুধুই বস্তু বিশেষ নই।

এতদিন পর্যন্ত আমরা ভারতীয় অধ্যাত্ম বিদ্যা বা আত্মজ্ঞানকে সমাধি, তুরীয় অবস্থা, এসবের সাথে যুক্ত অতীন্দ্রিয় অনুভব হিসাবে স্বীকার করেছি। যে কোন দেশেই এই পর্যায়ের অনুভূতি উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন অতিমুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নির্বিশেষে সকল মানুষের ক্রমবিকাশের সব স্তরেই যে এর কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। স্বামীজি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই বেদান্তকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছেন। একজন স্বাভাবিক সুসমঞ্জস্য যে মানুষ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে সে ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারে। একজন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে পরিবার ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।[২৪]

আবেগপ্রবণ শিশুর ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। কারণ সেই শিশুর সচেতনতার অভাবে কর্মে অনীহা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাববোধ ঘটে। এই শিশুদের মানসিক সমস্যাকে সহজে দূরীভূত করে তাদের বিকাশের স্তরে উপযুক্ত আত্মচেতনা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে আধুনিক মনোরোগ চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষতঃ খেলার মাধ্যমে এক অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছে।[২৫]

লৌকিক শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্নতি ও চরিত্র গঠন হলো মানুষের ভিতর যে দিব্য আত্মার নিত্য বিরাজ তার প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া। বেদান্ত ও গীতাকে অনুসরণ করে স্বামীজি যে আত্মজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মূল বক্তব্য হল এটাই।[২৬]

আত্মদর্শনে ভক্তির অপরিহার্যতা

ভক্তি শাস্ত্রে যাকে শরণাগতি এবং ভগবৎ কৃপা বলা হয়েছে, উপনিষদেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যমের উপদেশের মধ্যে আত্মোপলব্ধি — সর্বভূতে এক অনন্ত আত্মার কথায় এই কৃপা ও সমর্পণের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ।।''[২৭]

এই আত্মা বেদ আয়ত্ত করেও উপলব্ধ হয় না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা ও নয়, অনেক শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নয়। এই আত্মা যাকে অনুগ্রহ করেন কেবলমাত্র তিনিই তাঁকে জ্ঞাত হন। সেই ভক্তের কাছে পরমাত্মা কৃপা করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

আচার্য শঙ্করও বলেছেন, কঠোপনিষদের উপরি উক্ত এই শ্লোকটির ভাষ্যে

আত্মার অভিব্যক্তির জন্য ভগবৎকৃপার উপর জোর দেওয়া হয়েছে — যম এব স্বাত্মানম্ এষ সাধকো বৃণুতে, প্রার্থয়তে তেনৈব আত্মনা, বরিত্রা, স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়তে। একমাত্র যাকে, অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব সত্তাকেই একজন সাধক একান্তরূপে অন্বেষণ করেন, আকাঙক্ষা করেন, কেবলমাত্র সেই শরণাগতির দ্বারা সাধক তার নিজস্ব সত্তাকে প্রাপ্ত হন।

এক্ষেত্রে সাধকের ব্যাকুলতা ও প্রচেষ্টা সাধকের আত্মজ্ঞান লাভের কারণ হয়। সব রকম আধ্যাত্মিক শিক্ষা পদ্ধতিতেই এই ব্যাকুলতা ও সংগ্রামকে সাধকের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। আমরা আগে দেখেছি আত্মোপলব্ধির জন্য আত্মকৃপা আকর্ষণে ঐকান্তিক চেষ্টা, শংকরাচার্য এই মন্ত্রটির ভাষ্য করতে গিয়ে ভগবৎ-ভক্তি ও ভগবৎ-কৃপার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

"কথং লভ্যতে ইত্যুচ্যতে, তস্য আত্মা —
কামস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে, প্রকাশয়তি, পারমার্থিকীং তনূং স্বাম্ স্বকীয়াং স্বযাথাত্ম্যম্, ইত্যথ"— কিভাবে (এই আত্মাকে) পাওয়া যাবে ? উত্তর হলো, যিনি আত্মাকে ভালবাসেন আত্মা তার কাছে প্রকৃতরূপে স্বকীয় মহিমায় প্রকাশিত হন। এই তো এর অর্থ।

যদি ধ্যান, তপস্যা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা আত্মাকে জানা সম্ভব হতো তবে আত্মা কর্মের ফলরূপে পর্যবসিত হতেন। তা হলে তা হতো আপেক্ষিক ও সসীম, অতএব অনিত্য। সীমিত জ্ঞানের বা বিষয়ের প্রজ্বলিত দীপ কি অসীম জ্ঞান বা বস্তুকে কখনো আলোকিত করে তুলতে পারে ? একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যায়। যেমন একটা মশাল তা সে যত বড়ই হোক বা যতই উজ্জ্বল হোক সে কি সূর্যকে আলো দিতে পারে যা কিনা সৌর জগতের ছোট বড় সকলকে উদ্ভাসিত করতে পারে। সেইরূপ ধ্যান বা অন্যান্য ক্রিয়া সকল যত নিষ্ঠার সঙ্গেই সম্পন্ন হোক না কেন, তা কখনো আত্মাকে উদ্ভাসিত করতে পারে না এবং একমাত্র আত্মাই মনের ক্ষীণ দীপালোককে অভিভূত করে তাকে আলোয় আলোময় করে তুলতে পারে। উপনিষদ্ এই আত্মাকে অনন্ত, অদ্বৈত, অক্ষয়, শুদ্ধ চৈতন্য বলেছেন সব উপনিষদই ঐকতানে আত্মার এই স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং এই আত্মাকেই মানব ও বিশ্বের সর্বোচ্চ বা পরম সত্যরূপে উপস্থাপিত করেছেন। তাই কঠোপনিষদ্ এই আত্মাকে আলোর আলো বলে অভিনন্দিত করেছেন[২৯] —

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।।"[৩০]

সেখানে (আত্মাতে) সূর্য দ্যুতিময় নয়, চন্দ্র ও নয়, তারকা ও নয়, বিদ্যুৎ ও এই (পার্থিব)

অগ্নিও সেখানে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। যখন তিনি (আত্মা) ভাস্বর হন তখন তাঁর আলোকেই সব লোক উদ্ভাসিত হয় ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে —

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।।"[৩১]

ঋষি ঘোষণা করেছেন যে, যিনি জেনেছেন সেই পরমপুরুষকে — আদিত্যবর্ণ সেই পুরুষকে জগতের পরপারে যার নিবাস — তাকে জেনেই মৃত্যুকে তিনি করেছেন জয় — এছাড়া মৃত্যুত্তরণের আর কোন পথ নেই । তিনি ঘোষণা করছেন — "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"।[৩২] বিশ্ববাসী সকলেই অমৃতের পুত্র। যে অদ্বৈতবোধ মুমূর্ষুর কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসে আবদ্ধ ছিল —স্বামীজি সেটিকে নিয়ে এলেন প্রতিটি মানুষের কর্মমুখর লৌকিক ভাবনায়। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[৩৩] বেদান্ত যেখানে বলেছে, যে আত্মা সর্বত্র বিরাজমান — সেখানেই এই সত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে। কাজেই প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে সদাজাগ্রত আপন দেবতা। আর সেই দেবতার পূজা যদি মানুষের পূজাতে রূপান্তরিত হয় — তবে সে পূজাই হবে প্রকৃত পূজা। এইভাবে স্বামীজি বনের বেদান্তকে নিয়ে এলেন ঘরের আঙিনায়। বৈদান্তিক ধারণা বা পুঁথিগত বিদ্যা পূর্ণ রূপ পেল স্বামীজি প্রদর্শিত মানুষের সেবার ভেতর দিয়ে। এটাই হল শাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ ।

১। কেনোপনিষৎ ২/৪
২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৭১
৩। ঐ, পৃঃ- ৭২
৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ- ৫৯
৫। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ । পৃঃ- ১০
৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ - ৩/৪/১
৭। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ- ৫১০
৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ - ২/১৫
৯। বাণী সঞ্চয়ন। পৃঃ- ৯০
১০। শঙ্কর মতে আত্মা বন্ধ ও মোক্ষ। ডঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকা দ্রষ্টব্য । (উদ্বোধন - ৬৫ তম)
১১। শঙ্কর মতে আত্মা, বদ্ধ ও মোক্ষ। ৬৫ তম উদ্বোধন বর্ষসূচীতে । ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
১২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩/৪/৫
১৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ৩য় খণ্ড। পৃঃ- ৫৪

১৪। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৭৬
১৫। শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতা ১০/১৫
১৬। ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৫/৮/৭
১৭। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ২য় খণ্ড। পৃঃ-১১২
১৮। The complete works. Vol.-III. P-237
১৯। শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতা ২/৩
২০। স্বামীজির বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড। পৃঃ- ১৭০
২১। ঐ । পৃঃ- ৯১
২২। স্বামীজির বাণী ও রচনা। ৫ম খণ্ড। পৃঃ-১৭
২৩। ঐ। পৃঃ- ১৮
২৪। ভগবৎকৃপা - পৃঃ- ১৩
২৫। বাণী ও রচনা ৪র্থ খণ্ড। পৃঃ- ৫৮-৫৯
২৬। ভগবদ্‌ কৃপা । পৃঃ - ১৫
২৭। কঠোপনিষদ্‌ - ১/২/২৩
২৮। কঠোপনিষদ্‌ ১/২/২৩ ভাষ্য ।
২৯। ভগবদ্‌ কৃপা। পৃঃ - ৬৮-৬৯
৩০। কঠোপনিষদ্‌ ২/২/১৫
৩১। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ৩/৮
৩২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ২/৫
৩৩। স্বামীজির বাণী ও রচনা । ষষ্ঠ খণ্ড । বীরবাণী 'সখার প্রতি' কবিতার শেষ একটি পঙ্‌ক্তি।

বিবেকানন্দের নবচেতনায় সঞ্জীবিত অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ

মানুষের মানস উন্নতি বিকাশে অদ্বৈতবেদান্ত

রক্তিম আকাশের বুক চিরে উদিত হয় তিমিরবিদার সূর্য্য। ঘুমন্ত ভুবনকেই তিনি এক লহমায় জাগরিত করেন। দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার, জড়তা, আলস্য ও নিদ্রাকে চূর্ণ করে তিনি উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকেন। পৃথিবীর কোলে আবির্ভূত হয় এক নতুন প্রভাত। মানুষের মনে জাগ্রত হয় নবীন আশা, সঞ্চারিত হয় নতুন উদ্যম, নতুন প্রেরণা। বিগত শতাব্দীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বামী বিবেকানন্দের যে আবির্ভাব তা প্রকৃতির আকাশে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। জাতির জীবনের অন্ধকার রাত্রি, তামসিকতার পুঞ্জীভূত পাহাড় অপসৃত হয়ে গিয়েছিল তাঁর আলোকোজ্জ্বল অভ্যুদয়ে। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে এসেছিল অভূতপূর্ব জাগরণ, অদৃষ্টপূর্ব এক উদ্দীপনা, কর্মোদ্যোগ, আশা ও আত্মত্যাগের জোয়ার।[১]

ভারতভূমিতে স্বামীজির আহ্বান-এসো মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখো — সব জাতি কেমন উন্নততর পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকেভালবাস ? দেশকে ভালবাস ? তা হলে এসো । ভাল হবার জন্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। পেছনে চেও না, অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদে কাঁদুক, তবু পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও — বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। পুরুষকারের ও পরার্থপরতার ওজস্বিনী বাণী শুনিয়েছিলেন দেশকে। জাগাতে চেয়েছিলেন অধঃপতিত মুমূর্ষু দেশবাসীকে। মনুষ্যত্বের অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি দেশবাসীর মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করতে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে মানুষ শক্তিক্ষয় করেছে । শতশত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে। সর্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। আর মানবিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা পশুত্বে পরিণত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।[২]

অশিক্ষিত দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য এই সর্বজনীন প্রেমানুভূতি ও মমত্ববোধ স্বামীজির মনের নিছক ভাবালুতা বা অতিশয়োক্তি নয়, এ যে সত্য তা তাঁর আমরণ নিঃস্বার্থ কর্মযোগের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে ।

সর্বত্যাগী বিবেকানন্দ মুক্তপুরুষ ছিলেন সত্য, কিন্তু অসংখ্য বন্ধনের দুঃসহ যে

সংসার, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে বন্ধনমুক্ত আত্মোপলব্ধি দ্বারা সর্বজীবের আত্মায় পরমাত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাই বুঝি তিনি বলেছেন সন্ন্যাসীর জীবন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই পরম সত্যটি যদি কেউ ভুলে যায়, তবে বৃথা তার জীবন। স্বামীজির সকল সাধনা ও প্রার্থনার একটি লক্ষ্য সর্ব জীবে সেবা ও সমদর্শিতা। একে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে তিনি দীক্ষা দিলেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"[৩] এই মন্ত্রে।

জগতের হিতার্থে ও পরসেবার্থে ত্যাগী-শ্রেষ্ঠের এই কর্মপ্রেরণা শুধু তাঁর নিজের জীবনকেই মহত্তর করেনি, সারা বিশ্ববাসীর প্রাণেও অভূতপূর্ব প্রেরণা, উৎসাহ ও কর্মদক্ষতা যুগিয়েছিল, তাই আমরা দেখতে পাই দেশে দেশে তাঁর অতি আদৃত সেবাশ্রম, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও বেদান্ত কেন্দ্র।[৪]

স্বামীজি আরো মনে করতেন, মানুষের উন্নতির অর্থ তার মনের উন্নতি। ইতিহাসের অর্থ - মানুষের মন প্রকৃতিকে কতখানি নিজের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষ মূলতঃ পরিবেশের দাস নয়। পরিবেশ তাকে এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে সাহায্যে করতে পারে মাত্র, কিন্তু এই মানুষের মধ্যেই এমন একটা শক্তি আছে যার দ্বারা সে পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং অভিনব সৃজনী শক্তির সাহায্যে পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারে। এই শক্তি যার মধ্যে যত বেশি তাকেই আমরা তত উন্নত বলে ধরে থাকি।[৫]

স্বামীজি ভারতপ্রেমী ছিলেন। ভারত তাঁর কাছে পুণ্যভূমি কর্মভূমি ধর্মভূমি। ভারত ঋষির দেশ, সেইসব মানুষের দেশ, যাঁরা সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন। স্বামীজি ভারতকেই সত্য বলে সম্বোধন করেছিলেন। বলেছিলেন ভারতের মৃত্যু হলে সত্যের মৃত্যু ঘটবে, ধর্ম লোপ পাবে, সমস্ত সু-উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। শুধু ভারতের জন্য ভারতের বেঁচে থাকার দরকার নয়, বিশ্বের জন্যে ভারতের বেঁচে থাকার দরকার। ভারত সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুরু।[৬]

সমাজের উন্নতি কল্পে অদ্বৈতবেদান্ত

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ পুঁথিগত অদ্বৈতবেদান্তবিদ্যাকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নরনারায়ণের সেবা এবং মানব সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে পন্থা নির্দেশ করেছিলেন তাও এই অদ্বৈত-ভূমির উপরই প্রসারিত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এই জগতে নরনারায়ণ-সেবার বা সামাজিক অভ্যুদয়ের সামঞ্জস্য হবে কি রূপে ? কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, ভারতের ঐশ্বর কর্মগুলি সংসার বৈমুখ্যের মূলীভূত কারণ হলে, ঐ ধর্মগুলি কিরূপে জাগতিক উন্নতির প্রেরণা দেবে ?[৭]

অতএব উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, নেতিমূলক অদ্বৈত বেদান্ত বা যে কোনও সংসারবিমুখ ধর্মমত কোন ইতিমূলক চেষ্টার খোরাক জোগাতে পারে না। আপত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও নেতি পরায়ণ অদ্বৈতবেদান্তই স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ এবং কার্য ধারার ভিত্তি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁকে সযত্নে অদ্বৈত মতের উপদেশ করেছিলেন। এবং স্বয়ং অদ্বৈত ভাবনার পরম উৎকৃষ্ট ভূমি নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হয়ে ঘোষণা করলেন, 'অদ্বৈত সব শেষের কথা; অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁর গুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও অদ্বৈতানুভূতি এবং ব্যাবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখতেন না।[৮]

বেদান্তোক্ত অদ্বৈততত্ত্বের চরম অনুভূতি লাভে কৃতার্থ হলেও স্বামীজি কিন্তু জগতের প্রতি উদাসীন থাকেননি। সর্বজীবে এক ব্রহ্মাত্মার দর্শন বশতঃ তিনি জীব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্মা হতে কীট পরমাণু পর্যন্ত সর্বভূতে সেই প্রেমময় পুরুষ বিরাজমান। মনপ্রাণ শরীর অর্পণ করলে তাঁকে পাওয়া যায়।

সমীক্ষণীয় এই, ঈশ্বরে ফলসমর্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হলে এবং আত্মজিজ্ঞাসা না জাগলে সাধকের হৃদয়ে বেদান্ততত্ত্ব স্ফুরিত হয় না। এটা বেদান্ত শাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ। পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যেরা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্দনা, নিরভিসন্ধি, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম বিধান করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়। এখন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম নিষ্কামভাবে করে চিত্ত শুদ্ধি করবার সুযোগ ও অবসর নেই। তাই স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে স্ব-পরভেদবুদ্ধি বিসর্জনপূর্বক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জীবকে উদারচিত্তে আপন করে নিতে বলেছেন।[৯] ''উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।'' জীবে প্রেম ঘনীভূত হলে ঈশ্বরপ্রেম ঘনীভূত হবে। এইভাবে স্বামীজি আধুনিক কালের সকলের পরম উপযোগী চিত্তশুদ্ধির সহজ পথকে নির্দেশ করেছেন এবং সকলের প্রাতঃ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

স্বামীজির অদ্বৈতবেদান্তে নবচেতনার উন্মেষ

স্বামীজির ভারতভূমিতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি শঙ্কা হয়ে থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত অধিকারী কিনা তা কত বিচার করে তবে এই অদ্বৈতবেদান্তের উপদেশ দিতেন। একমাত্র প্রিয় নরেন্দ্রনাথকেই তিনি বিশেষ ভাবে অদ্বৈততত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজি অধিকারী অনধিকারী নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সকলকে এই উপদেশ দিলেন কেন ? আর এতে শ্রীগুরু প্রদর্শিত পন্থার বিরুদ্ধ আচরণ করা হল

কিনা, এর উত্তর- কল্পে স্বয়ং স্বামীজিই বলেছিলেন ঃ

ঠাকুর লোক দেখেই কে কিরূপ অধিকারী তা বুঝতে পারতেন। আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। আমি অকাতরে রত্ন বিলিয়ে গেলাম, যে অধিকারী সে গ্রহণ করে ধন্য হবে। কি সুন্দর সরল কথা! কি অপূর্ব হৃদয়বত্তা ও নিরভিমানতা! তত্ত্বজ্ঞ আচার্য ব্যতীত আর কে এরূপ কথা বলতে পারেন ?

স্বামীজির অদ্বৈতবেদান্ত নির্দেশ ব্যর্থ হয়নি। এই অদ্বৈতবেদান্ত পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে যেমন একটি সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তেমনি ভাবতেও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নবযুগের উদ্‌গাতা স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁর শিক্ষা বহু ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে ও বহু ভাব্যবান্ পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন। এখানে অদ্বৈতবেদান্তেব ভাবের উদ্বোধের একটা ছোট ঘটনা উল্লেখ করি। স্বামীজির সাহচার্যে তাঁর প্রিয় ইংরেজ শিষ্য মিঃ সেভিয়ার অদ্বৈতবেদান্তের একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং অদ্বৈতভাবের চিন্তাতেই একান্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। আর শ্রীগুরুর ইচ্ছানুযায়ী অদ্বৈতভাবের সাধনের অনুকূল একটি কেন্দ্র তিনি নির্মাণ করলেন। এটিই মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম। অসীম পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন।[১০]

ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজির পরিকল্পিত অদ্বৈতবাদের উদার দৃষ্টিতে অধিকারী অনধিকারীর বিবেচনা থাকতে পারে না। বর্তমানে সমাজ যা এবং যে রূপ হোক না কেন অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে বর্তমানের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। আর অদ্বৈতবেদান্তের তথ্যগুলি শুধু পুঁথিগত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবার জন্য নয়। এদেরকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেই হবে। ভারতের অবনতির কারণ আদর্শের ন্যূনতা নয়, প্রত্যুত আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার ঐকান্তিকতার অভাব।[১১] শাস্ত্র বললেন ঃ

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"[১২]
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।[১৩]

গীতায় শ্রীভগবান্ বললেন ঃ

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি নঃ প্রিয়ঃ"[১৪]

প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের কোন বিরোধ হতে পারে না। অস্পৃশ্যতা সমাজের একটি ব্যাধি এবং প্রকৃত বেদান্তীর কর্তব্য হবে এটা হতে সমাজকে মুক্ত হতে সাহায্য করা। অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্বদৃষ্টিতে অস্পৃশ্যতার কোন

স্থান নেই। আত্মায় কারো কোন ভেদ নেই।

বর্তমান যুগে আমরা রাজনৈতিক সাম্যবাদের কথা শুনতে পাই। কিন্তু স্বামীজি সাম্যবাদকে প্রচার করে কি বলতে চেয়েছেন। তা জানবার জন্য সততই আমাদের আগ্রহ হয়। এখানে সমাধান এই, স্বামীজি বেদ বেদান্ত অবলম্বনেই সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গীতায় ভগবান্ বলেছেন ঃ

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"।
"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ"।[১৫]

বেদান্তের এই সাম্যের কথা স্বামীজি বহুস্থলে বলেছেন এবং এটাও ঘোষণা করেছেন যে, আমরা চাই বা না চাই, সাম্যভাবনা নানা বেশ ধরে ভাবী সমাজে আত্ম প্রকাশ করবেই।[১৬]

মনুষ্যত্বের বিকাশে স্বামীজির স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ

বিবেকানন্দ তাঁর নবচেতনায় সঞ্জীবিত অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ তাঁর হৃৎপদ্ম, দেশের প্রতিটি নরনারী তাঁর জাগ্রত দেবতা, প্রতিটি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ তাঁর প্রাণ। এই দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনে এবার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ এবার কেন্দ্র। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের জীবনে নতুন নতুন প্রাণের তরঙ্গ সৃষ্টি করাই বিবেকানন্দের ধর্মের ধারণা। এই ধারণার মর্মমূলে অদ্বৈতবেদান্তের চূড়ান্ত সুরটি বাঁধা ছিল। তা হলো প্রকৃত মানুষ হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মান হুঁষ — মানুষ। মানুষ এক অখণ্ড চৈতন্যময়। সমস্ত বন্ধনদশা ঘুচিয়ে উঠতে পারা, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে আরও আরও বড় মানুষ হতে পারা, এ জীবনে আরেক পদক্ষেপ অগ্রসর হতে পারা, বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোকে দেখতে পারা এবং সেই ঐকতান কান পেতে শুনতে পারাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বিশ্বমানবতাবাদকে উপন্যাস করেছেন। এর অনুরূপ উক্তি পাই বাজসনয়ি সংহিতায় — 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।[১৭] এখানেই তিনি ভারতবর্ষ ও সারা বিশ্বকে এক ও অখণ্ড করে দেখতে চেয়েছেন এবং তা পেরেছেনও। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোন তত্ত্বে মত্ত হওয়ার দরকার নেই, স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দরকার নেই, মন্দির মসজিদ নির্মাণ করার দরকার নেই। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু একদিন যেন তাঁকে দেখতে পাই — এমন মনোবাসনারও দরকার নেই। "worship the living God" মানুষকে পূজা করাই ঈশ্বরোপাসনা। উদাত্ত কণ্ঠে এটাই ঘোষণা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই হলো বিবেকানন্দের বেদান্ত। আমি

যখনই আমার আমিত্বকে লুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারব এই দুরতিক্রম পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে তখনই আমি আমার জীবন সাধনা পরিপূর্ণ করতে পারব। এই হলো সবচেয়ে বাস্তব ধর্মবোধ, এই হলো প্রত্যক্ষ মানুষ বিধাতাকে আবিষ্কার করতে পারা। স্বামীজির বেদান্তের মধুময় বাণী — প্রতিটি মানুষকে তার নিজের পথ নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। তাহলে মানুষ মুখ্য চেতনায় আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে।[১৮] মহাভারতে ধ্বনিত হয়েছে —

"ম মানুষাদ্ধি শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ" ।[১৯]

"They are only steps toward the truth and not the truth itself. They are good and beautiful, and some wonderful ideas are there, but Vedanta says at every point :" "My friend, Him whom you are worshipping as unknown, I worship him as you ... has been with you all the time. You are living through Him, and He is the Eternal witness at the universe."

ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবাসীর কাছে বিবেকানন্দ এই আত্মবোধ দাবি করেছিলেন। এই আত্মোপলব্ধিই আসল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা 'Song of the Soul" (আত্মার সুর) আত্মোপলব্ধিই মানুষকে মানুষে পরিণত করে। মানুষের 'মানুষ' হওয়াই ছিল অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের পরম আকাঙ্ক্ষা।[২০]

শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তে অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মাই পরমতত্ত্ব বা চরম সত্য হলেও জীবাত্মাই সবকিছুর কেন্দ্র । কারণ জীবাত্মার সমস্যার সমাধানের জন্যই, জীবাত্মার প্রয়োজন মেটাবার জন্যই, জীবাত্মার বন্ধন বা অজ্ঞান মোচনের জন্যই বেদ ও বেদান্তের প্রচেষ্টা, সকল দর্শনের ও দার্শনিকগণের তত্ত্বজ্ঞান ও তার সাধন নিরূপণ। জীবাত্মা না থাকলে কোন প্রয়োজনও থাকত না — অজ্ঞান ও তজ্জনিত কোনও সমস্যা থাকত না, সুতরাং ঐ সকল সমাধানের জন্য কোন শাস্ত্রেরও প্রয়োজন থাকত না। জীবাত্মাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সবকিছুর মূল, সকল প্রিয়ের মূল প্রিয়, সুতরাং সর্ব প্রধান জ্ঞাতব্য — এটা বুঝবার জন্যই বৃহদারণ্যকে পতি জায়া, পুত্র, বিত্ত, বেদ, দেবতা প্রভৃতি সর্ব পদার্থের প্রিয়তা এই আত্মার প্রিয়তার জন্যই এটা বলা হয়েছে। "ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ।"[২১]

অতঃপর স্বল্প পরিসর ঊনচল্লিশ বর্ষব্যাপী জীবনে স্বামীজি কর্মজীবন ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য মাত্র পনের ষোল বছর সময় পেয়েছিলেন। তার মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্ত অধ্যয়ন করে বেদান্তে এত ব্যাপক ও জীবনোপযোগী গভীর দৃষ্টি লাভ করেছিলেন যে, তা বিস্ময়কর। দেশে ও বিদেশে তাঁর অদ্বৈতবেদান্ত প্রচারের

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত করা, মানুষকে ব্রহ্মাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ করা। তাই বলা যায় স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তাধারাকেই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ও বলপ্রদ বলে বিশ্বাস করতেন। অদ্বৈতবেদান্তকেই তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম বলে মনে করেছেন। তাই দেশ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের উদ্দেশ্যেই তিনি অদ্বৈত বেদান্তবাণী প্রচার করেছেন। এবং শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তার অপরোক্ষ অনুভব মিলিত হয়ে তাঁর সেই প্রচারকে বিশেষভাবে সার্থক করেছে। তত্ত্বদ্রষ্টা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে বিবেকানন্দ মহামন্ত্র পেয়েছিলেন — ''শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'' মানবের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি সম্পন্ন তাঁর প্রেমিক হৃদয়ে এই মন্ত্রটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সমগ্র জাতিকে — বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীকে সকল বঞ্চিত, অবহেলিত ও অপমাণিত মানবকে সর্ববিধ 'দান' বা 'সেবা' দ্বারা উন্নীত করবার জন্য প্রেরণা প্রদান করতে। এটা বিবেকানন্দের বিশেষ মহত্ত্ব আর এটা অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগও বটে। যা তাঁর প্রয়োগাত্মক বেদান্তের একটা দিক।[২২]

সবশেষে ভারতের সামাজিক ইতিহাসে অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা বা ব্যর্থতা যেমন আছে তেমনি সাফল্যের দৃষ্টান্তের অভাবও নেই। ভারতবর্ষ যেহেতু অতীতে প্রধানতঃ ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই ধর্মনেতাদের বাক্যে ও কার্যে স্বামীজির এই অদ্বৈতভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ সাম্যবাদের প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় এমন কি বহির্ভারতের ধর্মনেতারাও যে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

কোন জাতির জীবনে আত্মবিশ্বাস ও পবিত্রতা না থাকলে সে জাতি কোনো দিকে অগ্রসর হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং ধরা ধামে বহু রূপে উৎপন্ন হয়েছেন ''তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।''[২৩] কাজেই প্রতিটি জীব যে ব্রহ্মই — এই পরম সত্যকে স্বামীজি ভারতের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। আমরা ক্ষুদ্র নই — সসীম নই — দুর্বল নই — ধর্মীয় পবিত্রতা কর্মযোগের মধ্য দিয়ে ভারতে পুনশ্চ সুরক্ষিত হোক — এই ছিল স্বামীজির চিন্তা। নিষ্কাম কর্মযোগের ভিতর দিয়ে প্রতিটি স্তরে জাতীয় জীবনে তপস্যালব্ধ জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক। মানুষ নিজেকে জানুক। সমাজের সকলের মধ্যেই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ জীবন ও কর্মজীবন জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়ে আলোকিত হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক জীবনেও এই পবিত্রতা সমভাবে লক্ষিত হোক। বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের জ্ঞান ও অর্জুনের নিষ্কাম কর্মসাধনা ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবে। একজন ব্যক্তি নিজের মনোরাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি। অদ্বৈতবাদ কেবল তত্ত্বকথায় সীমাবদ্ধ থাকবে না — তা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে জনজীবন ও সমাজকে ধরে রাখবে ও পরিচালিত করবে —

এই ছিল স্বামীজির স্বপ্ন।

১। এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ। পৃঃ ৪৯
২। 'এষ মানুষ হও' — স্বামীজির বক্তৃতাংশ হতে গৃহীত।
৩। বাণী ও রচনা। ষষ্ঠ খণ্ড। বীরবাণী। সখার প্রতি কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি।
৪। বেদান্ত মুক্তির বাণী। পৃঃ ২৫
৫। বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা। পৃঃ ১৪
৬। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের তথ্যাবলীতে দ্রষ্টব্য।
৭। উদ্বোধন ৬০ তম। পৃঃ ১৩১
৮। ঐ ১৩২।
৯। উদ্বোধন ৬৫ তম বর্ষ।
১০। উদ্বোধন ৬৫ তম। পৃঃ ১৩৮ - ১৩৯
১১। শতাব্দী বর্ষ জয়ন্তী। পৃঃ ১৮৭
১২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৫/১৮
১৩। ঐ ১৩ / ২৮
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২/২৯
১৫। ঐ ৫/ ১৯
১৬। শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সংকলন। পৃঃ ১৮৮
১৭। বাজসনয়ি সংহিতা ৩২/৮
১৮। শতবর্ষের আলোর স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন। পৃঃ ৫৬
১৯। মহাভারত
২০। শতবর্ষের আলোয় স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন। ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
২১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৫/৬
২২। উদ্বোধন ৬৫ তম। পৃঃ ১৩০
২৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬/২/৩

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনে বিবেকানন্দের অবদান

জাতির উন্নতির জন্য প্রত্যেক মানব জাতিকেই কিছু না কিছু দিতে হয়। এ বিষয়ে ভারতের নিজস্ব অবদান অধ্যাত্ম চিন্তা। আমরা পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, যেখানেই কোন বিশ্বজনীন আদর্শের সন্ধান মিলে তার জন্ম যে এই ভারতবর্ষে তা অস্বীকার করা চলে না।

অধ্যাত্মচিন্তা ভারতীয়দের নিজস্ব সম্পৎ

প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে বহু শক্তিশালী খ্যাতনামা অভারতীয় জাতি অনেক উচ্চ উচ্চ ভাব প্রচার করেছেন যেটা অন্য জাতির নিকট ছড়িয়েছে "যুদ্ধের তূর্য ধ্বনির সঙ্গে রণোন্মত্ত সেনাবাহিনীর অভিযানের উত্তুঙ্গ ভঙ্গিতে" — প্রত্যেকটি ভাব যেন রক্তের বন্যার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ফলত দেখা গিয়েছে বিক্রমশীল বিজেতার অমিত [illegible]। লক্ষ লক্ষ আর্তের চিৎকার, অনাথ শিশুর ক্রন্দন এবং নিরাশ্রয় বিধবার আকু[illegible]পাত। কিন্তু ভারতে এজাতীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবশ্যই বিরলদর্শন। ভারতের ভাবরাশি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে শান্তি ও শুভেচ্ছার পথ ধরে। প্রভাতের কোমল শিশিরকণা যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে মনোরম গোলাপের কুঁড়িগুলিকে ফুটিয়ে তোলে, সেরূপ ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তা নীরবে জাগিয়ে তোলে সকলের মধ্যে এক অনবদ্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হৃদয়বৃত্তিকে।[১]

লক্ষ্য করা যায়, যখনই অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তখনই সমগ্র জগতে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তাস্রোত প্রবল বেগে ছুটেছে। বর্তমান যুগে জগতের অপরাপর জাতিগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ পুনঃ স্থাপিত হওয়ায় এক্ষণে সেই সুযোগ আবার উপস্থিত। ভারতের ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছায় পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — জগতে ভারতীয় ঋষিদের শান্তির বাণী মুখরিত হয়ে উঠেছে। যত দিন যাবে ততই এটা বর্ধিত ও বিস্তৃত হতে থাকবে। আর এই সুযোগ ভারত জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কাল বিলম্ব না করে জগৎকে অধ্যাত্ম উপহার দান করছে ও করবে।[২]

ভারতীয়দের জীবনে ফল্গুধারার মত অধ্যাত্ম ভাবধারা নিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই অনাদি কাল হতে শুরু করে অদ্যাবধি। অমৃতধারার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল উপনিষদের

যুগে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর অন্তরে। যখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে সম্পত্তি বিভাজন করে দিয়ে নিজ তপস্যায় মগ্ন হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন — তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেছিলেন, এই সম্পদ দিয়ে অমৃতলাভ করা যায় কিনা। যাজ্ঞবল্ক্য নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে — এই অমৃত লাভ কেবল ত্যাগেই সম্ভব। তখন মৈত্রেয়ী বলেছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"[৩] অর্থাৎ যা নিয়ে অমৃত লাভ হবে না তা নিয়ে আমি কি করব ? এই অমৃতের স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আজও মহামানবের মিলনতীর্থ এই ভারতে অমৃত লাভের বাসনা পুনশ্চ দেখা দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ভারতবাসীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই অমৃতের স্বাদ পেতে সাহায্য করেছেন ।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিদ্যমান এই অমৃতধারা শুধু অনুভূতি ও উপলব্ধির বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি বলেছেন, মানুষের অন্তরেই ভগবান্ বিরাজমান, তাঁকে পাওয়ার জন্য মন্দিরে মসজিদে ছুটে বেড়াবার প্রয়োজন হয় না। হরিণ যেমন নিজের নাভিতে কস্তুরি বিদ্যমান বলে জানতে না পেরে চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায় কস্তুরির সন্ধানে, আমরাও তেমনি নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে না খুঁজে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াই ঈশ্বরের সন্ধানে। আসলে আমরা যে প্রত্যেকেই ব্রহ্ম হতে পারি, প্রত্যেকে অমৃতের আস্বাদ পেতে পারি, সেই বিষয়টাই স্বামীজি বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের বংশধর। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা ঋষিস্পর্শে পবিত্র, সামান্য ছুঁয়াতেই আমরা অমৃত হয়ে যেতে পারি। আসলে আমরা অমৃতই। অজ্ঞানই আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। স্বামীজি এই সুপ্ত অধ্যাত্ম চেতনাকেই পুনশ্চ জাগরূক করতে চেয়েছিলেন।[৪]

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তাধারায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞান বাস্তব জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে আবিষ্কার করেছে । আর বৈদান্তিক মননালোকে বেদোক্ত ধর্ম আন্তর জগতের রহস্য সন্ধানে যেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছে, বিজ্ঞান সেখানে তার যাত্রাপথ শেষ করেছে। বিভেদের মধ্যে একতা অনুসরণই ধর্মের কাজ। শাস্ত্রকারগণ সেই কারণে সর্বজীবে এক আত্মার অনুভবকে পরম ধর্ম বলেছেন । স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ ঋষিগণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীক ভাবে আত্মানুসন্ধান করেছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। অধ্যাত্ম জগতের সত্য লাভ করতে হলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেতেই হবে। যাঁরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে সমর্থ তাদেরকে ঋষি বলে। কারণ এঁরাই সত্যকে সাক্ষাৎ করে থাকেন।[৫]

মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি জাগতিক বিদ্যালাভের ব্যবস্থার প্রয়োজন অনিবার্য; অপরদিকে তেমনি তার মনে যাতে

সকল মানুষের জন্য যথার্থ ভালবাসা, যথার্থ কল্যাণেচ্ছা জাগে, যাতে সে যথার্থ মানবপ্রেমিক হয়, তারও ব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুবা অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত হলেও বিশ্বমানব কল্যাণকামী দেবতা না হয়ে অমিত শক্তিধর দানবেও পরিণত হতে পারে। জড়বাদকে ও ভোগসর্বস্বতাকে ভিত্তি করে সভ্যতা গড়ে উঠলে মানুষের মনে এক সময় স্বার্থপরতাই রাজত্ব করে। এবং ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় বিরোধিতা ও বিচ্ছিন্নতা বিশেষ স্থান অধিকার করে। সেজন্য বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে অধ্যাত্মচিন্তাকে আমাদের সর্বাগ্রে সভ্যতার ভিত্তি করতে হবে। অধ্যাত্মভাবনা অন্তরের বিষয়নিরপেক্ষ অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান দিয়ে মানুষকে নিঃস্বার্থপর করে । বিচ্ছেদহীন আনন্দ লাভ করাই যে জীবনের চরম উদ্দেশ্য এতে দ্বিমত নেই। প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির জীবনের সব প্রচেষ্টা এই আনন্দ লাভের জন্যই। স্বামীজি বলেছেন, ধর্মাচরণ মানে পরজন্মে আনন্দ পাবার আশায় এই জন্মে কেবল দুঃখ ভোগ করা নয়; যথার্থ অধ্যাত্ম চিন্তার পথে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন আনন্দ-অভিষিক্ত হতে শুরু করে। এ পথে চলবার সামান্য প্রচেষ্টা সার্থকতা আনে।[৬]

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"[৭]

খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি দেহজ ভোগ হতে মানুষ যে আনন্দ পায়, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সে আনন্দ সাধারণ, প্রত্যেক দেহধারী প্রাণীই কম বেশি সে আনন্দের অধিকারী। তবে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও অধ্যাত্মচিন্তার বিকাশই উচ্চতর আনন্দের সন্ধান ও আস্বাদ এনে দিয়ে অন্যান্য প্রাণীর স্তর হতে মানুষকে অতি উচ্চে টেনে আনে। মানবতার যথার্থ প্রগতির পথ আবিষ্কার করে। দেহ-ইন্দ্রিয়জ আনন্দ সবচেয়ে নিম্নস্তরের আনন্দ। তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরের আনন্দ হল বুদ্ধিজ আনন্দ; জ্ঞান আহরণ করে জ্ঞানের চর্চা করে মানুষ যে আনন্দ পায়, অন্যান্য প্রাণীর কাছে সে আনন্দের দ্বার রুদ্ধ। আধ্যাত্মিক আনন্দ তারও অনেক ঊর্দ্ধে।[৮] অধ্যাত্ম আনন্দ সম্পর্কে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন—

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ।।"[৯]

সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন স্বসংভূত মূলা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজ প্রতিবিম্বিত আত্মাকে মায়াকৃত দেহাধিকার পূর্বক প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তঃসাক্ষীচৈতন্য রূপে তাতে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন, কিন্তু পরমার্থতঃ যাঁর ব্রহ্মরূপেই অবস্থান সেই পরা প্রকৃতি উপহিত ব্রহ্মের যে জীবভূত স্বভাব, তাকেই 'অধ্যাত্ম' আনন্দ বলে।

অধ্যাত্ম স্বরূপের সম্যক জ্ঞানে ও তার লাভে সর্বোচ্চ আনন্দ হয়। এই সর্বোচ্চ আনন্দ বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন, প্রতিক্রিয়াহীন, অফুরন্ত আনন্দ । এই আনন্দ লাভের জন্য মানুষকে বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না, কারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করতে বা কেড়ে নিতে হয় না, অপরের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে হয় না। এই আনন্দের আস্বাদ পেলে জীবনের আর সবকিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় 'আলুনি লাগে।' এই অধ্যাত্ম আনন্দের স্বাদ ও লাভ

করবার প্রচেষ্টাই সর্ববিধ মানসিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে তুলে মানুষকে 'মানুষ' করেছে। এই অধ্যাত্মভাবনা-সঞ্জাত অসীম প্রেমের প্রেরণা যীশু মানব কল্যাণের জন্য দিয়েছেন। বুদ্ধদেব মানুষ তো দূরের কথা একটি পশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছেন। নিঃস্বার্থপরতাই আধ্যাত্মিকতা। যে মানুষ নিজের জন্য কোনও কিছু যশ পর্যন্ত না চেয়ে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে অপরের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, সে অন্য কোন ধর্মানুষ্ঠান করুক বা না করুক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হোক বা না হোক, নিঃসন্দেহে সেই অধ্যাত্ম আনন্দময় প্রকৃত ধর্মের পথেই অগ্রসর হয়। স্বামীজি বলেছেন যে, কিছু না চেয়েও যা কিছু পাওয়া যায় তাই ভগবান্।[১০]

অধ্যাত্মভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্বামীজি আরো বলেছেন, যথাসাধ্য সংযম অভ্যাস করে মানুষ যাতে নিঃস্বার্থপর হতে পারে, একাগ্রতার সাধনা করে এই অধ্যাত্ম আনন্দের আস্বাদ যাতে সমাজের সকলেই কিছু না কিছু পেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে সেরূপ ব্যবস্থায় গঠিত সভ্যতার নামই অধ্যাত্ম - ভিত্তিক সভ্যতা। কারণ জীবনে এই অধ্যাত্ম আনন্দের সন্ধান ও আস্বাদ একটুখানি না পেলে কেবল উপদেশ শুনে মানুষ কখনও তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। অপর দিকে, অতি সামান্য আস্বাদও কোন রূপে একবার পেলে, বাস্তবতায় একবার বিশ্বাস আসলে পর তাকে লাভ করবার চেষ্টা সে নিজের গরজেই সারাজীবন করে চলবে। যেমন অন্যান্য আনন্দ লাভের বেলা আমরা করে থাকি । এরূপ হলে তার জীবন স্বতই অধ্যাত্মভিত্তিক হবে। স্বামীজি দেখলেন, পাশ্চাত্য জগৎ অন্যান্য বিষয়ে খুবই উন্নত হলেও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় অধ্যাত্মচিন্তার একান্ত অভাব ঘটেছে ।[১১]

স্বামীজি ছিলেন ভারতবাসীর অধ্যাত্মসাধনার পথে বলিষ্ঠ পথিক। সর্বোপরি তাঁর ছিল অপূর্ব ভারতপ্রেম, আর সমগ্র সত্তার সঙ্গে একাত্মভাব । জন্মভূমি, কর্মভূমি ও পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সমকালীন বাস্তব সকল গ্লানি ও কুশ্রীতাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর যে ভূমিতে অনন্য উত্তরণ ঘটেছিল, সে ভূমিতেই তিনি অবলোকন করেছিলেন অমৃতময় শাশ্বত ভারতকে। আমাদের এই বিশাল দেশের পথে ঘাটে, পাহাড় জঙ্গলে, সাগরে, মরুভূমিতে, আকাশে বাতাসে এবং নদনদীর নিত্য প্রবহমান ধারায় মহাকালের পদচিহ্নে রচিত ইতিহাসের খোলা পাতায় তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ, অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অসামান্য মননশীলতা তাঁর অধ্যাত্মচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে ইতিহাসসাগরের গভীরে রত্নসন্ধানে।[১২]

স্বামীজি ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের সংস্কার সাধনের যে সকল চিন্তা করেছেন, এবং যে সকল পথ নির্দেশ করেছিলেন সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে তাদের সর্বত্র একটা সুর অনুরণিত হয়ে উঠে । ভারতীয়দের ধর্মীয় চিন্তা ও সাধনা হতে, সামাজিক নীতি ও প্রথা হতে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা হতে, নারী ও নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি আচার আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে, এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্র হতে তিনি সেই সকল

বস্তুগুলি নির্মমভাবে দূর করতে চেয়েছেন, যেগুলি তাদের অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতির পক্ষে অসমঞ্জস্য এবং প্রতিকূল। কারণ অধ্যাত্ম চিন্তাকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্রুবতারা বলে নির্দেশ করেছেন। অধ্যাত্মচিন্তার নিরিখেই ভারতবর্ষের সকল সংস্কারের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, সাফল্য এবং বৈফল্য নির্ধারিত হবে। এবং এই অধ্যাত্মচিন্তা বলতে তিনি বেদান্তের ধ্রুব সত্য উপলব্ধির কথাই বুঝিয়েছেন।[১৩]

অধ্যাত্মশক্তি বিকাশের পর্যায়ক্রম

ভারতীয়গণের শক্তিবিকাশের তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় দৃষ্ট হয়। প্রথম পর্যায়ে বাহ্যিক পূজার্চনা এবং উপাসনার মধ্য দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণা মূর্ত হয় এবং তাঁর কাছে ঈশ্বর তখন এক বহিঃসত্তা। তাঁর তখন প্রধান অবলম্বন মন্দির ও গীর্জা, মূর্তি ও প্রতীক, স্তোত্র ও ভজনকীর্তন, উপবাস এবং তীর্থদর্শন। প্রতিটি ধর্মের এটিই হচ্ছে প্রথম পর্য়ায় অর্থাৎ জড় এবং স্থূলের মধ্য দিয়ে সেই নিত্যের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস। এই প্রথম পর্যায়ের সুনিয়ন্ত্রিত আন্তরিক অনুশীলন ভক্তকে অতি অবশ্যই দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। সেটি হচ্ছে অন্তর্মুখী ধ্যানের পর্যায়, তখন তিনি অন্তরে অর্থাৎ তাঁর অতি কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে শেখেন। এই পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ের সেই বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, কলকোলাহল এবং দর্শনাদির কিছুই প্রায় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়েই হয় প্রকৃত ধর্মজীবনের সূত্রপাত। আরো বলা যেতে পারে, প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে ধর্মের শিশু শিক্ষা মাত্র। মন যত পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়ে ওঠে, অন্তরস্থ ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণও ততই বাড়তে থাকে। ধর্ম তখন (দ্বিতীয় পর্যায়ে) হয়ে ওঠে ভগবানের সঙ্গে আত্মার এক অপার আনন্দময় সম্মিলনের হেতু। ধ্যানের অনুশীলন হয়ে ওঠে পরম আনন্দের উৎসমুখ। এই পর্যায়ের নিরন্তর সাধনায় ঈশ্বরের কৃপালাভ হয় এবং আত্মার তখন হয় তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরণ — যে পর্য়ায়ে ঘটে থাকে উপলব্ধির পূর্ণ পরিণতি। ধ্যানের মধ্যে সাধক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁর অন্তরে এবং সমাধির পরাকাষ্ঠায় আত্মাকে খুঁজে পান সর্বভূতের অন্তরে। ভারতবর্ষ এই উপলব্ধিকে সকল আধ্যাত্মিক সাধনার চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, ভারতে প্রতিটি ঈশ্বরের ভক্ত এই অবস্থাকেই তাঁর চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা একথাও বিশ্বাস করেন যে, এক জীবনের সাধনায় এ অবস্থায় উপনীত হওয়া কখনোই যায় না, বহুজন্মের সাধনায় কারো কখনো সেটা লাভ হয়।[১৪]

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" ।[১৫]

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কচাদিৎ কেউ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করেন, আর প্রযত্নশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যে কখনো কেউ আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন।

আরো বলেছেন —

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" ।[১৬]

জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ বহু জন্মের সাধনার ফলে শেষ জন্মে সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেবই - এরূপ জেনে জ্ঞানী আমাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ।

জপ এবং ধ্যান ভারতীয়দের অধ্যাত্মসাধনার প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপ বা তাঁর কোন অবতার মূর্তিকে ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবতারূপে কল্পনা করেন। কোন দেবতাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সাধককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে; কারণ বেদান্ত এখানে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয় যে, সেই চরম সত্য 'এক' ভক্তের প্রবণতা ও অনুসৃত সাধনের পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়। উপাসকগণের সিদ্ধির জন্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য স্বানুগ্রহে নানারূপ পরিগ্রহ করেন — এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশঃ

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।।'

আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'স্যাৎ পরমেশ্বস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।'[১৭] গীতার মধুসূদনভাষ্যে কথিত হয়েছে 'কথং তর্হি দেহগ্রহণমিত্যুত্তরার্ধেনাহ প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবামি প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং স্বাম্ স্বেপাধিভূতামধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি।'[১৮]

ইষ্ট নির্বাচনের যে বিষয়টি এতকাল হিন্দুদের নানা দেবদেবী এবং অবতারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, হিন্দু ও অহিন্দু উভয় ধারার সিদ্ধ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবে তা যীশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধদেব পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছে এবং তাঁদেরকেও এখন রাম এবং কৃষ্ণের মতই অবতার রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে।[১৯]

'তীর্থদর্শন' ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। সারা দেশব্যাপী অসংখ্য তীর্থস্থানগুলি ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য গৌরব। হিমালয়ের গহন প্রদেশবর্ত্তী বহু পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম হলো তিব্বতে অবস্থিত 'কৈলাস পর্বত' শিবের আবাসস্থল। হিন্দু ও তিব্বতীয় বৌদ্ধদের কাছে সমানভাবে পবিত্র। এই তীর্থক্ষেত্রটি ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে বর্ত্তমান রামেশ্বরম এবং কন্যাকুমারীর মন্দির। আরও দুটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান দ্বারকা এবং পুরী। এদের মধ্যে প্রথমটি ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং অপরটি পূর্ব সমুদ্রতটে অবস্থিত।[২০]

ভারতের অধ্যাত্মজীবনে সন্ন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সন্ন্যাস জীবন।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও অতুল মর্যাদাসম্পন্ন এই সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালেও সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে পরিগণিত হতো এবং বুদ্ধদেব ছিলেন ঐ সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার জন্যই এই সন্ন্যাসীগণকে ভারতবর্ষে দেবতার মত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ এই সন্ন্যাস সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারার উত্তরসূরী — যে ধারায় উৎসমুখে ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং সনৎকুমার প্রমুখ। অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভের এই একই প্রেরণার ফলে ভারতের অসংখ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে। আজও দেখা যায়, ভারতে হাজার হাজার লোক সংসার ছেড়ে এসে অধ্যাত্ম সত্য লাভের জন্য সন্ন্যাস সাধনায় জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছেন। কোন কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস- দীক্ষার পূর্বে বিশেষ ধরনের হোম অনুষ্ঠান করা হয়, যে অনুষ্ঠানে চিরকুমার অথবা একপ্রস্থ বিবাহিত জীবনযাপন করার পর সম্ভোগে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসপ্রার্থী পরব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ ঐ পূত হোম হুতাশনে তাঁর জাগতিক যাবতীয় কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়চেতনা, মন এবং অহংবুদ্ধিকে আহুতি দিয়ে নিজেকে সকল জাগতিক সম্পর্করহিত শুদ্ধ অনুভব করেন। গৃহহীন, নিঃসম্বল অবস্থায় শুরু হয় সন্ন্যাস ধর্মজীবন। সে জীবন কারো মধ্যে কোন রূপ ভেদাভেদ না রেখে সকল জীবকে ভালবাসা এবং সেবার জীবন । তবে একটা কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সে যুগে অখণ্ড ভারতের চিন্তা কোন বাঙালী সন্ন্যাসী মনীষীর হৃদয়েই উদিত হয় না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে অখণ্ড ভারত ছিল একটা প্রত্যক্ষ সত্য স্বপ্ন।

অধ্যাত্মসাধনাই ভারতের গৌরব

কালের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটেছে। ভারতের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার ললাট উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মহামূল্য মণিরত্নোপম বৈদিক যুগের তরুণ আর্য্যজাতির অধ্যাত্মপ্রেরণায় ।

স্বামীজির মতে জাতির অধ্যাত্ম-অনুভূতিই ভারতীয় জীবন সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ কারও শাসনকালই ভারতীয় জীবন সাধনা ও আদর্শ হতে কখনও বিচ্যুত হয় নি।[২১] ভারতের ইতিহাসে এমন কোন যুগ নেই যখন সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমুদ্ভাসিত করতে সমর্থ মহাপুরুষের অভাব ছিল। যখন তাতার, পারসিক, গ্রীক্ বা আরব জাতি এই দেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ সাধন করেছে, তখনই এই দেশ হতে অধ্যাত্মচিন্তার প্রবাহ বন্যাস্রোতের ন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করেছে। আবার ইংরেজদিগের দ্বারা পুনরায় সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের যখন সংযোগ সাধিত হয়েছে, তখনও সেই একই ব্যাপারের সূচনা দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সভ্য বিদেশবাসী ভারতীয় ঋষিদের অধ্যাত্ম অনুভূতির ভাবোজ্জ্বল

সেই বাণীর জন্য অপেক্ষা করেছে। আধুনিক যুগের ঘৃণ্য অর্থোন্মাদনা যাদেরকে নরকাভিমুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, নরকের ঐ করাল কবল হতে তাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করবে সেই বাণী। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও আজ বুঝতে পেরেছেন যে, বেদান্তের উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাবধারাই তাঁদের সামাজিক আশা আকাঙক্ষা পূর্ণ করতে পারে।[২২]

অধ্যাত্মচিন্তায় স্বামীজির দান

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা-রাজ্যে স্বামীজির দান অপরিসীম। সুবিশাল অধ্যাত্মজাগরণের ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তিনি এর জন্য অভিনবত্বের দাবি করেন না। বরং তিনি বলেছেন যে, "আমি যা কিছু করেছি তা সবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসম্ভূত। অবশ্য আমাদের শাশ্বত বিশ্বাস, অধ্যাত্মরাজ্যের সমস্ত সত্যই বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তবু আধ্যাত্মিক ভাবনায় উদ্ভাসিত বিবেকানন্দের নিজস্ব কৃতিত্ব অবশ্যই আছে। সে সাফল্যের স্বরূপ কি, কতদূর তার ব্যাপ্তি, কতখানি তার গভীরতা, কোথায় তার অভিনবত্ব এবং অধ্যাত্মজীবনকে নবীন পথে পরিচালনার কতটুকু সম্ভাবনা এই সমস্ত পথ তিনি ভারতবাসীকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে গেছেন।[২৩]

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরো দেখা যায়, স্বামীজির ন্যায় এরূপ একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যিনি সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করেও তার স্বর্গীয় আনন্দে ডুবে না গিয়ে জগৎকে ভাল বেসেছেন এবং দেশে ও বিদেশে মানব জাতির দুঃখভার লাঘব করবার জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছেন।[২৪] অতঃপর স্বামীজি বলেছেন, ভারতে অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন ধর্মের একটি আলোড়ন — সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারা দ্বারা ভারতকে প্লাবিত করবার আগে দেশকে অধ্যাত্মচিন্তার ভাববন্যায় ভাসিয়ে দাও। যে ধর্মকে আশ্রয় করে স্বামীজি বর্তমান ভারতকে গড়তে চেয়েছিলেন, সে কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ নয়। ধর্ম অর্থে তিনি বুঝেছিলেন মানুষের ভিতর তার ঘুমন্ত ভাগবত সত্তার উদ্বোধন।

"Religion is the manfestion of the divinity in man."

এই দিব্য ভাবের বিকাশের উপরই নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ। তাই স্বামীজি চেয়েছিলেন অন্তরে সত্যের বিকাশ। নিছক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় নিজেকে রক্ষা করা যায় না। নিজেকে এবং পরকে ত্রাণ করবার যোগ্যতা আছে একমাত্র অধ্যাত্মশক্তির। স্বামীজি বলেছেন, ভারতের অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজন শুধু নিজের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা জাতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র মানব সভ্যতা রক্ষার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।[২৫]

স্বামীজি অনুভব করেছিলেন, অধ্যাত্ম-আদর্শগুলি জীবনে প্রতিফলিত করে

ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করে সেগুলিকে জীবন্ত করে তোলার উপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেজন্য উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শে জীবন উৎসর্গ করতে পারে এমন সব খাঁটি মানুষ গড়ে তোলার উপযোগী কয়েকটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ভারতে ও বিদেশে। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে তিনি মূলতঃ সন্ন্যাসী সংঘরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন যে, সেটা চিরাচরিত সন্ন্যাসী সংঘগুলির মত অধ্যাত্ম প্রয়োজনে অপরের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত ও স্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক হবে না, বরং হৃদয়বান্ অনুরাগী জন সাধারণের সঙ্গে একযোগে লেগে পড়বে জাতিবর্ণের কোন ভেদ না রেখে মানব জাতির অতি প্রয়োজনীয় সেবার কাজে ।[২৬]

ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়েছে যে, কোনো অধ্যাত্মভাবের অভ্যুত্থানের পরে তারই অনুবর্তী একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে থাকে এবং ঐ বোধই যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ অধ্যাত্ম-আকাঙক্ষা তাকে শক্তিশালী করে থাকে। বিবেকানন্দের মতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষ বিশেষ অধ্যাত্ম ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক একটি বিশেষ অধ্যাত্মভাবাদর্শ সমাজের এক বিশেষ সময়ের ঐ সমাজের বিশেষ রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থা, বিধি - নিষেধ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি রূপদান করে এবং সমাজের ভৌতিক পরিস্থিতি যে বিশেষ অধ্যাত্মভাবাদর্শ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেই বিশেষ অধ্যাত্ম-ভাবাদর্শকে আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলে। ভারতীয় সমাজের ইতিহাস অন্বেষণ করে বিবেকানন্দ তাঁর এই মতবাদের উদাহরণ পেয়েছেন। ভারতীয় ইতিহাসে তিনি কয়েকটি প্রধান প্রধান অধ্যাত্মভাবাদর্শের অস্তিত্ব দেখেছেন এবং ভারতীয় ইতিহাসের এক একটি যুগকে অথবা ভারতীয় সমাজের এক একটি পর্যায়কে তিনি এক একটি অধ্যাত্মভাবাদর্শ দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করেছেন। কার্য-কারণ নিয়মের প্রতিফলন সমাজ ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি দেখেছিলেন। কার্য-কারণ-নিয়ম আর্য জাতিরই সুপ্রাচীন মত । এই নিয়ম কোনো দেশ বা কালের সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়, সমাজ জীবনে যখন এই কার্য-কারণ নিয়মের প্রয়োগ প্রতিফলিত দেখি তখন কারণ হিসাবে উপস্থিত থাকে একটি মৌল অধ্যাত্মভাবাদর্শ।[২৭]

পাশ্চাত্যেও আধ্যাত্মিক জাগরণ প্রয়োজন

স্বামীজি বলেছেন, আমরা ভারতবাসী অপরকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি ঠিকই, আবার অপরের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পেতে পারি। আমরা পৃথিবীকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, পৃথিবী তার জন্য এখন অপেক্ষা করছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেটা সমূলে বিনষ্ট হবে। মানব জাতিকে তরবারি বলে শাসন করবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। যে সকল স্থানেই আধ্যাত্মিক অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়। জড় শক্তির লীলা ভূমি ইউরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন

করে আধ্যাত্মিকতার উপর তাকে স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। উপনিষদের ধর্মই ইউরোপকে রক্ষা করবে।[২৮]

অবশ্য বিবেকানন্দ নৈতিক দিক হতে ভারতকে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলে মনে করেছেন। পরাধীনতা-সত্ত্বেও নৈতিক ভিত্তিতে ভারতের অধ্যাত্মভাবধাবা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। স্বামীজি প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রগতির, অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে জড়শক্তির, রাষ্ট্রীয় মুক্তির সঙ্গে জনকল্যাণের, সাম্যের সঙ্গে ত্যাগের, প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের এমন সমন্বয়ের কথা জোরালো ভাষায় বলেছেন যে, আর কেউ কখনো তা বলেননি। পশ্চিমের বস্তুবাদের উপর ভারতের অধ্যাত্মবাদের বিজয় স্বামীজির প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব। তাঁর শিকাগো বিজয়কে মনে হতে পারে "Counter attack of the East"।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাবের প্রভাব

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুভূতির আলোকে যুগসন্ধিক্ষণে যে কয়জন তরুণ সাড়া দিয়ে ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের এক এক দিকপাল। সুন্দরের সীমানা পার হয়ে আনন্দলোকের বারতা এঁরা এনেছিলেন। এঁদের ব্রত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রসারিত করা — অধ্যাত্মসাধনার বাণী জগতে প্রচার করা। শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় উপলব্ধির বাণীর আলোকে তাঁদের অন্তরে যে চেতনা জেগেছিল তারই সাধনায় দুর্গম গিরি নিবিড় কান্তারে তাদের অভিযান শুরু। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এঁরা সকলেই অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা সমস্ত ভারতবাসীর জীবনকে অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।[২৯]

সমস্ত ভারতবাসী সেই অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় জাতি, ভাষা ও সমাজের সমুদয় বাধা ধর্মের সমন্বয়ী শক্তির দ্বারা তিরোহিত হয়েছিল। তবে আমরা এটা জানি যে, ভারতবাসীর ধারণা হয়েছিল অধ্যাত্ম আদর্শ হতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নেই। আর এটাই হল ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনের মূলমন্ত্র।[৩০]

স্বামীজি পাশ্চাত্যবিদ্‌গণকে ভাষণদানকালে বলেছেন যে, শারীরিক শক্তি বলে অনেক অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন হতে পাবে সত্য; আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে যন্ত্রাদি নির্মাণ করে তার দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য দেখানো যায়- এটা ও সত্য; কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির যেরূপ প্রভাব এর তুলনায ঐগুলি কিছুই নয়। স্বামীজি আরো বলেছেন যে, ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় ভারত বরাবরই কর্মকুশল। ভাবত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল একথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্মপরায়ণ, অন্য কোন দেশই সেরূপ নয়। ভারতে কর্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু এটা অপরের দৃষ্টি পথে না পড়বার কারণ — যে যে কাজটি করে ও ভাল বোঝে, সে সেটিকেই মাপকাঠি করে অপরের বিচার করে, আব এটাই হল ভারতীয় অধ্যাত্ম মনুষ্য জীবনের প্রকৃতি।[৩১]

বিশ্বে সর্বজনের আরাধ্য ভারতীয় অধ্যাত্মশিক্ষা

এটা আমাদের গর্ব ও গৌরব যে, সমগ্র পৃথিবী অধ্যাত্মসাধনা লাভের জন্য ভারতভূমির দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে আছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলি আকৃষ্ট হয়ে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা লাভের জন্য স্বতস্ফূর্ত্তভাবে এগিয়ে আসছে। ভারত সন্তানগণের এখন কর্তব্য সমগ্র পৃথিবীকে মানব জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃষ্ট সমাধানের শিক্ষা দেবার জন্য নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম শিক্ষায় দীক্ষিত করা। অতএব বলা যায়, ভারত- ভূমিতে ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার অবিনশ্বর অমৃত রত্ন রয়েছে তাকে আহরণ ও আস্বাদন করে উচ্চাকাঙক্ষা ও বিষয়বিষভোগোন্মাদনায় প্রায় অর্ধমৃত হীনদশাগ্রস্ত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতি নতুন জীবন লাভ করতে পারে।[৩২]

ভারতবাসীর অধ্যাত্মভাবগুলি ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। সেটা এখন একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। সমগ্র জগৎ ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট কতদূর ঋণী এবং ভারতের অধ্যাত্মশক্তি মানব জাতির অতীত ও বর্তমান জীবন গঠনে কিরূপ শক্তিশালী উপাদান তা এখন সকলেই অবগত।[৩৩]

স্বামীজি ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জাগরণের প্রতিটি ক্ষেত্রকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তেমনি ভাবে পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে তাদের জীবনে অন্তর্মুখিতা ও অধ্যাত্মচিন্তার আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে — এ হল পাশ্চাত্য সম্পর্কে স্বামীজির চিন্তা। কাজেই পাশ্চাত্যে গিয়ে পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্য সর্বজনীন ধর্মপ্রচারে স্বামীজি তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করলেন। স্বামীজি যদিও ছিলেন ভারতের রত্ন তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর প্রাণ এবং তাঁর উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ দাবি করতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্বত্রই নরনারীকে দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা, মানব জাতির ঐক্য সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করা ও সকলের হৃদয়ে অধ্যাত্মভাবকে উদ্বুদ্ধ করাই তার প্রচারের উদ্দেশ্য।[৩৪]

অধ্যাত্মজগতে নারীর স্থান

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টে ম্বর মাসে ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব শুধু ভারতের পক্ষেই একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাছেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ স্বামীজি ধর্মমহাসভায় একটি অভিনব বাণী প্রচার করলেন, যা তখনো ছিল পৃথিবীর মানুষের অজানা। সেই অশ্রুতপূর্ব বাণী হলো সকল ধর্মমতকে সত্য বলে গ্রহণ করার বাণী। ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও স্বামীজি পাশ্চাত্যে একজন ভ্রাম্যমাণ ধর্মাচার্যের ভূমিকাও পালন করেছিলেন। তাঁর এই সম্মেলনে যোগদান ও ধর্মশিক্ষকরূপে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ভারতকে গৌরবান্বিত করেছিল। কারণ বহির্বিশ্ব স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমেই ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ সম্বন্ধে অবহিত হয়।[৩৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বামীজি শিকাগো ধর্মমহাসভায় যে নতুন বার্তা জগৎকে

দিয়েছিলেন তা ছিল সর্বাংশে এবং সর্বতোভাবে অধ্যাত্মবার্তা। সেই বার্তার পিছনে ছিল স্বামীজির তপস্যা এবং সাধনার পটভূমি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ঐশ্বর্য।

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহ্য সমাজে নারীকে ওপরে স্থান দিয়েছে। সে স্থান শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও পূজার। সুতরাং স্বামীজি যখন তাঁর সম্বোধনে প্রথমে নারীকে স্থান দিলেন তখন তা তিনি বক্তৃতায় চমক সৃষ্টি করার জন্য করলেন না, তা করলেন তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রেরণায়। ভগিনী নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন ধর্মসংস্থার প্রতিনিধি রূপে এসেছিলেন। একমাত্র স্বামীজির বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুত্বের অধ্যাত্মভাবধারা। এবং সেদিন তাঁরই মাধ্যমে ঐ ভাবগুলি সর্ব প্রথম সংজ্ঞা, ঐক্য ও রূপ লাভ করেছিল। যে ভাবগুলিতে ঐক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।[৩৬]

অতএব ভারতবর্ষে অধ্যাত্মজীবন গঠনের ক্ষেত্রেও স্বামীজির দান অকল্পনীয়। স্বামীজি বলেছেন যে, এতদিন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা সুপ্ত ছিল, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। তবে তাঁর মনে যে চিন্তাটি সর্বক্ষণের জন্য প্রধান হয়ে উঠেছিল সেটি হল, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই অধ্যাত্মভাবনার সঞ্জীবতা ফিরিয়ে এনে ভারতবর্ষকে তার অকৃত্রিম অতীত গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

তবে একটা কথা বলতে হয়, সন্ন্যাস জীবনের নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষ বিশ্বাসী নয়। যখন নতুন সমাজ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে এক কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তখন ঐ সন্ন্যাসী সঙঘ ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাইরের মানুষের সুখ এবং সমৃদ্ধির জন্য এক গঠনমূলক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধদেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কম্বুকণ্ঠে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই একই আহ্বান "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়" এই বাক্যে আমরা শুনতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। এই আহ্বান তিনি জানিয়েছেন আধুনিক ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তাদের সামনে তিনি ত্যাগ ও সেবার এক মহান আদর্শ তুলে ধরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহ আধুনিক ভারতবর্ষের কাছে সব থেকে সক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তিস্বরূপ, এই শক্তি ভারতবর্ষের গৃহী এবং সন্ন্যাসী, দুই শ্রেণীর মানুষকেই বিশ্বের উপযোগী অধ্যাত্মজীবনের এক নতুন ধারাপ্রবর্তনে সহায়তা করে চলেছে।[৩৭]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠায় স্বামীজি বিরাট অংশ গ্রহণ করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর জন্যও রেখে গেছেন অমূল্য পথ নির্দেশ, অনেক মনীষীই তাঁকে মহান ভারতের স্রষ্টা বলে মনে করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটা কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে তাকালে যে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবেন — স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কতটা ঋণী। ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির অধ্যাত্মভিত্তি নির্মাণ করেছেন। যখন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনায় মানুষ ছিল অন্ধ, তখন

তিনি তাদের দৃষ্টি খুলে দিলেন। আর সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়ে ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে উদ্বুদ্ধ করে পাশ্চাত্য দেশকেও অধ্যাত্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

কর্মযোগী, ধ্যানযোগী, ভক্তিযোগী, জ্ঞানযোগী শিল্পী, সুরকার, দার্শনিক সবাই অধ্যাত্ম- জগতের অধিবাসী। কর্মযোগী নিষ্কাম কর্মসাধনার ভিতর দিয়ে, ধ্যানযোগী উপাসনার ভিতর দিয়ে, ভক্তিযোগী ভক্তির মাধ্যমে ও জ্ঞানযোগী তত্ত্বোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ক্রমশ জীবনের উর্ধ্বায়তন লাভ করেন। শিল্পী সুন্দরের সাধনার ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম সাযুজ্য অনুভব করেন অথবা রূপের ভিতর দিয়ে অরূপের দিকে অগ্রসর হন, দার্শনিক সত্যোপলব্ধির লক্ষ্যে ভাবজগতে বিহার করেন। নিষ্কাম কর্ম, উপাসনা, ভক্তি, জ্ঞান, সুন্দরের সাধনা, দার্শনিকের তত্ত্ব বিবেচনা — চেতনার এ সব বিভিন্ন ধারা অধ্যাত্মলোকের আলোতে উদ্ভাসিত। গিরি গুহাতলে যোগী একান্ত সাধনার পথে সমধিক উচ্চভূমিতে আরোহণ করবার মানসে ধ্যানাবিষ্ট। শিশু গদাধর সবুজ প্রান্তরে এক ঝাঁক বলাকা দেখে সৌন্দর্যানুভূতিতে সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। যোগীর মন ও শিল্পীর চিত্ত একই ভাবাবেগ ও রসে স্নাত । ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞের একান্ত গভীর অনুভূতিতে 'ছোট আমি'-র অহং বোধ লোপ পায়। এইভাবে আমরা ক্রমশঃ সত্তার বিরাট সাগর সঙ্গমে মিলিত হই। এই অনুভূতি, সৌন্দর্য, ঈশ্বরানুরাগ অথবা কোন মহৎ ভাবাবেগ দ্বারা সঞ্চালিত হোক না কেন, সবার মূলে রয়েছে অধ্যাত্মবাদের প্রসাদ। স্বামীজির অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকায় দিব্য ও লৌকিক জীবন, ভাবলোক ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের মনন সাধনা, সামাজিক রাজনৈতিক কৃষ্টি অথবা সংস্কৃতির অন্তরালে এক গভীর অধ্যাত্মবাদের স্পর্শ অনুভব করেছেন এবং তাঁর অধ্যাত্মবাদ ভারতবর্ষের সমগ্র জীবনসাধনার মূলাধার। সুতরাং অধ্যাত্মধারণা ব্যতিরেকে যে কোন ধর্মসাধনাই যে অকিঞ্চিৎকর ও নিষ্ফল তা নির্বিবাদসিদ্ধ ।

১। স্বামীজির বাণী ও রচনা । পঞ্চম খণ্ড। পৃঃ ১-২ দ্রষ্টব্য ।
২। ঐ, পৃঃ ৫
৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ । ২/৪/৩
৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৭৮৭
৫। স্বামীজির বাণী ও রচনা । পঞ্চম খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ (১৩৬৩) পৃঃ ১৪৬
৬। স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫৮
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/৪০
৮। স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৫৯
৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮/৩
১০। দুঃসাহসিক অভিযান। পৃঃ ১৫ ১৬
১১। ঐ। পৃষ্ঠা - ৫৭
১২। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৪৩৭
১৩। ঐ। পৃঃ ৩৬

১৪। ভগবৎকৃপা। পৃঃ ২৩
১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৭/৩
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৭/১৯
১৭। ব্রহ্মসূত্র ১/১/২০ শারীরকভাষ্য ।
১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৪/৬ মধুসূদনভাষ্য ।
১৯। ধ্যান শান্তি আনন্দ। পৃঃ ৪০-৪১
২০। স্বামী বিবেকানন্দ। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত। পৃঃ ২৩১
২১। আমার ভারত অমর ভারত। পৃঃ -২
২২। স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ। পৃঃ - ১২৪
২৩। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন। পৃঃ - ২৪
২৪। ঐ, ২৫
২৫। ঐ ৯৪
২৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ। পৃঃ ২৬৯
২৭। বিবেকানন্দ স্মৃতি। পৃঃ ৩৫৮-৫৯
২৮। The complete works. Vol. VIII. P. 349
২৯। বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ। পৃঃ ৭১
৩০। The complete works. Vol. III. P 286-287
৩১। The complete works. Vol III. P 137-138
৩২। Ibid P. 440
৩৩। ৬৫ তম উদ্বোধন, পৃঃ ২
৩৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । প্রথম খণ্ড ভূমিকা ।
৩৫। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৩৯
৩৬। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ১০০২
৩৭। ভারতীয়দের অধ্যাত্ম জীবন। পৃঃ ৩৩-৩৪

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনে বিবেকানন্দপ্রবর্ত্তিত জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা

ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সর্বজন অভিনন্দিত। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সত্তামাত্র নয়, ভারতবর্ষ তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃভূমি বিরাটের মূর্তি, যে মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে বৈদিক ঋষির ভাবানুভূতি ঃ

"সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।"[১]

অধ্যাত্ম-অনুভূতির ভিত্তিতেই স্বামীজির দেশপ্রীতি। এই বিশুদ্ধ দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ স্বামীজি গর্বিত সন্তানের মতো বলতেন যে, দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞান বলুন, অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানব জাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এ সবেরই অনবদ্য প্রসূতি। এখনও ভারত এই কারণে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২]

স্বামীজির প্রচেষ্টায় ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

হীনম্মন্যতারূপ মেঘের আড়ালে দীর্ঘকাল পরাধীন ভারতবর্ষ ধুঁকছিল। সেই সময় শৌর্য বীর্যের স্ফুরিত আধার বীর সন্ন্যাসী জাতিকে দিয়েছিলেন মোহমোচনের মন্ত্র — ভারতবর্ষের জীয়ন কাঠি ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদ। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতবাসী জড়তা ত্যাগ করে নবপ্রাণতরঙ্গে প্রাণবন্ত বলশালী হয়ে ওঠে। ধর্মই ভারতবাসীর ভাবানুভূতির আশ্রয়। ধর্ম কেন্দ্রিক চিত্তোত্থান ও নব জাগরণ জাতীয় জীবনে সর্বপ্রথম উপস্থিত হল স্বামীজির অতি পবিত্র আগমনে। ধর্মভিত্তিক এই জাগরণে প্রাণ চাঞ্চল্য জাতির শিরায় উপশিরায় সঞ্চালিত হল। জাতির সামাজিক জীবনে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায়, বাণিজ্যিক প্রয়াসে সবদিকে যে জাতীয়তার উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার ব্যাপকতা ও তাৎপর্য সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।[৩] ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ— এই মন্ত্রের উদ্‌গাতা ধর্মনিষ্ঠ নির্ভীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মশক্তির বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ। বহুজাতি ও ধর্মের মিলনভূমি ভারততীর্থের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে স্বামীজি ভারতের জাতি গঠনের নিজস্ব উপায় নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখেছেন ঃ "ত্যাগ ও চরম সত্যের অপরোক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করে ভারতের জাতীয়তারূপ সুমহান সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রয়েছে, ঐ জাতীয়তার

প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত।[৪] সেই সঙ্গে স্মরণযোগ্য জাতীয় ঐক্যের নীতি ঘোষণা করে স্বামীজি বলেছেন ঃ "A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune."[৫] ভারতরাষ্ট্র, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারায় উপযুক্তভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে একাত্মরূপ পরিগ্রহ করুক — এইরূপ উদার ও গভীর অধ্যাত্মচেতনার ঐক্যভূমিতে স্বামীজি রোপণ করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধবৃক্ষ। স্বামীজির এই প্রয়াসের ফলে ভারতীয়দের হৃদয়ে সহজেই স্বাভাবিক জাতীয়তাবোধ স্ফুরিত হয়েছিল। জাতির পুনরুত্থান সহজসাধ্য হয়েছিল। অতঃপর স্বামীজি কর্তৃক প্রচারিত অধ্যাত্মনিষ্ঠ এই জাতীয়তাবোধ ভারতবাসীকে কিরূপ উদ্বুদ্ধ করেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি শ্রী অরবিন্দের বাণী। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন "ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশীঃ বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করেছিলেন। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের কর্তা। তিনিই এর প্রধান নেতা।"[৬] নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়ে সর্ব ধর্মের যে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন. সেটাই স্বামীজির জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং সেটাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।"[৭] জাতীয় জীবনের সংগঠনকর্তা স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানের ঋণ স্বীকার করে চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী লিখেছেন ঃ "Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We, therefore, owe everything to Swami Vivekananda."[৮] (বিবেকানন্দ হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করে হিন্দুত্ব তথা ভারতকে রক্ষা করেছেন। বিবেকানন্দকে বাদ দিলে আমাদের হিন্দুধর্মও লুপ্ত হবে এবং আমরা আমাদের স্বাধীনতাও হারাব। তাই বলতে হয়, আমরা সর্বাংশে ঋণী বিবেকানন্দের কাছে।)

শতাব্দীর দর্পণে দেখতে পাই, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ আবিষ্কার ও তদনুযায়ী সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রবাহ ও সামগ্রিক গতিকে নিয়মিত করেই জাতির ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। স্বামীজি তাঁর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়েছে যে, কোন অধ্যাত্ম-অভ্যুত্থান হলে তারই অনুবর্তী একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষা, তাকে শক্তিশালী করে থাকে।"[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাধনায় যে মহান অধ্যাত্ম শক্তির প্রবোধ ঘটেছিল তারই অন্যতম ফলশ্রুতি ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। স্বামীজি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও ভারতীয় যুবকদের দিয়েছিলেন

দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের অতুলনীয় অনুপ্রেরণা । এই বীর্যবান্ বলপ্রদ প্রেরণা দেশবাসীদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে মহান জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[১০]

অতঃপর বলা যায়, স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রত্যয় হলো জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের এক শ্রেষ্ঠ অবদান। আর এই মুক্তির সাধনা হল বেদান্তভিত্তিক। উপনিষদে বলা হয়েছে — "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্"[১১] মন, বাক্, শ্রোত্র ও বিজ্ঞান এ সকলের আধিপত্যই হল 'স্বারাজ্য' । এই স্বারাজ্যের লাভে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ হয়।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল মাত্র মায়ার বন্ধন-মোচনই চাননি, মানুষের রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক মুক্তিও ছিল তাঁর কাম্য । স্বাধীনতা বলতে স্বামীজি কি বুঝতেন তা তাঁর বহু চিঠিপত্র ও রচনাদিতে প্রকাশ পায়। তাঁর মতে, "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথমশর্ত।" যেমন মানুষের চিন্তা করবার ও কথা বলবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন — তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কারও কোনও অনিষ্ট না করে।[১২] আবার সার্বিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সকলের মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই মানুষের পরম পুরুষার্থ। যাতে অপরে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই সকলের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে সকল সামাজিক নিয়ম এরূপ স্বাধীনতার স্ফুরণে ব্যাঘাত করে, তা অকল্যাণকর। যাতে তার শীঘ্র নাশ হয়, তাই করা উচিত। অতএব যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় তার সহায়তা অবশ্যই করা উচিত।[১৩]

অতঃপর আমরা দেখি, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু প্রকাশ পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের মতামতের সঙ্গে স্বামীজির মতামতের অদ্ভুত সাদৃশ্য। অরবিন্দ ঘোষের মতো সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও চান যে, কংগ্রেস গণমুখী হোক। রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বা ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করে আত্মশক্তির বলে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করুক।[১৪]

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক প্রয়াস

জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় খুঁজতেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি আমেরিকায় গেলেন। বস্তুতঃ আমেরিকায় স্বামীজির বিশ্ববিজয়ী সম্মান লাভ এবং বহির্বিশ্বে স্বামীজির ঐক্যমুখী প্রচারকাজ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তরকরী ঘটনা। অবশ্য আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে ? এখানে আগে আমাদের দুটি জিনিস মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমটি হচ্ছে, ইংরেজের দুঃশাসনে আমাদের দেশ স্থবির, জাতির ঐক্য বিনষ্ট, দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা হীনম্মন্যতা বিদ্যমান, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত — বিদেশীর চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না — যেটা যে কোন মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় এধরনের রাজনীতি কৌশলের অনেক নজির মিলবে। বিদেশে বিবেকানন্দের কীর্তিকথা ভারতবাসীকে দিল গৌরব, ঐক্যবোধ এবং সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় । সেটাই হল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি । এর ফলে প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল। বহু বৎসরের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা সমবেতভাবে যা করতে পারেননি, বিবেকানন্দ তা করলেন। এ সম্পর্কে ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের[১৫] অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্যঃ "He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the west than what has hither been done by all our political leaders together. [১৬] (পশ্চিমী চিন্তা ভাবনার মূল্যায়ন বিষয়ে রাজনৈতিক নেতারা সর্বসাকুল্যে যা করেছেন, একা বিবেকানন্দ তার অনেক বেশি ভারতরাষ্ট্রকে উন্নীত করেছেন।)

পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবোধে স্বামীজির প্রেরণা

স্বামী বিবেকানন্দ এবার সত্যই সাইক্লোনিক মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের বুকে। পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হীনম্মন্য জাতির সামনে প্রচার করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ও ঐক্যের প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল করে তুললেন। আর সুদৃঢ় কণ্ঠে ভারতবাসীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, কাপুরুষতা, পরানুবাদ, পরানুকরণ এবং দাসসুলভ দুর্বলতাই জাতির পরাধীনতার কারণ। আরো জানিয়ে দিলেন, কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে দেশের বীর সন্তানেরাই স্বাধীনতাকে লাভ করতে পারে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।" জাতিকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন, আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুললে কোন ক্ষতি নেই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাচ্ছেন ।ভারতের জাতীয়

দেবতাই একমাত্র জাগ্রত ।[১৭]

অতঃপর স্বামীজি বলেছেন, জনসাধারণের সেবা করে তাদেরকে মানুষ করে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি হবে। স্বামীজি 'মানুষ' চেয়েছিলেন — মানুষ, খাঁটি অকপট মানুষ, দ্রবিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, যে অবিচলিত শ্রদ্ধা আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত — যদি এমন একশ আত্মবিশ্বাসী আদর্শনিষ্ঠ যুবক মেলে তবে ভারত মুক্ত হবেই। ভাবীকালের দেশপ্রেমিকদের সামনে তিনি রাখলেন স্বদেশ প্রেমের এক নতুন আদর্শ। পশ্চিমের আমদানি করা দেশপ্রেম নয়, তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মততিন দিনের জন্য দেশ প্রেমিক সাজা নয় — প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে গেলে চাই তিনটি জিনিস হৃদয়, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা ।[১৮]

স্বামীজির মতে ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি হল ধর্ম এবং ধর্মের ভিত্তি হল আধ্যাত্মিকতা। "In India religious life forms the centre the key-note of the music of national life."

কিন্তু এখানে সমস্যা এই — স্বাধীনতার উত্তর যুগে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আজ বুঝতেই পারছেন না উন্নতির পথ কোন দিকে। ইউরোপীয় ছাঁচে ঢেলে দেশকে তাঁরা গড়তে চলেছেন। স্বাধীন ভারতের সংস্কার করা ভারতীয় ধর্ম বা জাতীয় আদর্শে ভাবিত নন। এরা ইউরোপীয় শিক্ষায় দীক্ষিত, ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, তাই তাদের কার্যপ্রক্রিয়া এবং চিন্তা ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা। অতএব স্বামীজি তাঁদেরকে সাবধান করে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন — ভারতে আগে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা আনতে হবে, পরে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা। ভারতকে আরও সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, ধর্ম বা অধ্যাত্ম জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন পার্থিব বা লৌকিক উন্নতি পেতে তোমরা যদি চেষ্টা কর তাহলে আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

বিবেকানন্দ "My Plan of Campaion" বক্তৃতায় তাঁর নিজস্ব ভাবধারা এবং দেশ গঠনের মৌলিক আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিষদিক সত্যগুলি শিক্ষা ও অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রেম, ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা, আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প, দেশের প্রতি মানব জাতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেম, স্বদেশবাসীর প্রতি ঘৃণা বা নিন্দাভাবের বিসর্জন-এই ভিত্তিগুলির উপরেই জাতীয় উন্নতির সৌধ নির্মিত হতে পারে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। আর এই আদর্শগুলিকে জাতীয় জীবনে আনতে গেলে চাই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ।[১৯]

জাতীয় আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি — ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি বলিষ্ঠ আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন পরাধীনতার

তমসাচ্ছন্ন সুপ্ত ভারতে ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তক রাজা রামমোহন ছিলেন প্রথম জাগ্রত মহাপুরুষ। পরবর্তী কালে তাঁর মতানুসারে ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র 'নববিধান' স্থাপন করেন। ঠিক এই সময়ে পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক আর্য সমাজ স্থাপিত হয়। এই তিনজন মনীষীই ধর্ম জাগরণের সহায়ে ভারতে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত ধর্ম জাগরণ এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই আন্দোলনের সঙ্গে দেশের জনগণের যোগসূত্র রক্ষিত হয় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুগধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্ম সমন্বয়কে অবলম্বন করে স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম জাগরণ আনয়ন করেন, তা শিক্ষিতশ্রেণী হতে আরম্ভ করে ভারতের অশিক্ষিত জন- সাধারণের মধ্যেও বিস্তৃত হতে থাকে। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব সাফল্য হতে এর সূচনা হয়। সেখানে তাঁর হিন্দুধর্ম মাহাত্ম্যকীর্তন পাশ্চাত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের করতালি অর্জন করে। এই সংবাদ শুনে পরাধীন ভারতবাসীর আত্মসন্ধিৎসা প্রথম জেগে উঠে। এই সময় হতেই ভারতে সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। তাই ভারতবাসী মনে প্রাণে অনুভব করে যে, জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে তাদের দান করবার যে অমূল্য ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি আছে, তা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নেই।[২০]

অতঃপর বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভারতের এক অশ্রুতপূর্ব জাতীয় জাগরণের উন্মেষ হয়। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ প্রভৃতি মনীষীগণ বেদাশ্রিত হিন্দু ধর্মের অসংখ্য মত ও পথের মধ্যে এক একটি মত ও পথ গ্রহণ করে সেটাকেই একমাত্র যুগ- ধর্ম বলে প্রচার করেন। কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও উপদেশালোকে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রমুখ সকল ধর্মমত ও পথকেই ভগবান্ লাভের এক একটি উপায় বলে ঘোষণা করেন। এই রূপে তিনিই সর্ব প্রথম পরস্পর বিবদমান ধর্ম সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যথার্থ ঐক্যস্থাপন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমবায়ে ভারতে যথার্থ গণতান্ত্রিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই পরিস্ফুট হয় যে, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে ঐক্য স্থাপন এবং এদের সমবায়ে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আধুনা রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ ভারতের নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে ধর্ম ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সর্বধর্ম সমন্বয় রূপ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাকে জাতীয় জীবনে সংহতি স্থাপনের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন।[২১]

স্বামীজি জাতীয়তাবাদকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করে ভারতবর্ষে আবেগময় অধ্যাত্ম-জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন যে, কেবলমাত্র অতীত

গৌরবের উপর ভিত্তি করেই জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব।[২২]

স্বামীজি আরো মনে করতেন যে, অতীত আধ্যাত্মিক আদর্শকে কেন্দ্র করেই ভারতের গৌরব ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, অধ্যাত্মিকতাই অতীতে ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। সুতরাং এই আধ্যাত্মিকতামূলক ধর্মই জাতীয় জীবনের ধারক হবে। কোন প্রকার সংস্কার সাধন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম বলতে স্বামীজি কখনই বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানাদিকে বোঝেননি। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন পৃথিবীর সর্বধর্মের মূলতত্ত্বকে উদারভাবে গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন, নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোপলব্ধি। তাই তাঁর ধর্ম হল "man - manking religion." জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি ধর্মকে দেখেছেন। নিঃস্বার্থ মহান্ ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার সাধন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর কাছে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

কোঁতে ও হার্ডারের প্রেরণা স্বামীজির মধ্যে

বিবেকানন্দ তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের আলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেলেও তাঁর সমাজ সেবার আদর্শ পেয়েছিলেন কোঁতের ভাববাদ হতে এবং তাঁর জাতীয়তাবাদের গুরু সম্ভবতঃ জার্মান দার্শনিক হার্ডারের কাছ থেকে । এটি অধ্যাপক সরকার মনে করেন।[২৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধাংশ ভারতে জাতীয়তাবাদের যুগ বলা যায়। ইউরোপখণ্ডে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব তার বহু পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। এই উগ্রতা একমাত্র লাঞ্ছিত অবনমিত পরাধীন জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংগ্রামের মধ্যেই মূর্ত হয়েছিল। অন্যত্র তা ধনতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়! এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদী দর্শনের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা আমরা দেখেছি তা ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল তার লক্ষ্য)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত জাতীয়তাবাদ ভারতের জাতীয় সাংস্কৃতিক ভাবধারার সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে এক অভিনব ভাবসম্পদে পরিণত হয়েছিল বিবেকানন্দের আন্তরিক প্রয়াসে। রাষ্ট্রসেবা, দেশসেবা ও সমাজসেবাকে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, কোঁতে বা হার্ডারের রোমাণ্টিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে নয়, ভারতের বেদান্ত ধর্মের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। যদি ব্রহ্মই সত্য হয় এবং সত্যই ধর্ম হয় তবে জীবন কেথায়ও ধর্মের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। বিবেকানন্দের সাম্যবাদের উৎসও এখানে। তারপর তিনি তাকে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। আর এই কারণেই তাঁর সাম্যদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের

মতের কোনো কোনো অংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হলেও উভয় সাম্যবাদের বৈসাদৃশ্য যে বেশি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২৫]

স্বামীজির জাতীয়তাবাদের তত্ত্বসমীক্ষা

স্বামীজি ভারতীয় জাতীয় জীবনে কিছু ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় জীবনের ত্রুটি হল ঈর্ষ্যা এবং একতার অভাব। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই সম্পর্কে তীব্র নিন্দা ও কষাঘাত করেছেন। আমরা একসঙ্গে মিলিত হতে পারি না, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না, আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা কয়েকজন একসঙ্গে মিললেই পরস্পরকে ঘৃণা করে থাকি, ঈর্ষ্যা করে থাকি।[২৬] স্বামীজি আরো বলেছেন যে, পাশ্চাত্যে এরূপ হিংসা, বিদ্বেষ দেখা যায় না। তিনি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করছে। এই চার কোটি ইংরেজ তাদের সমুদয় ইচ্ছা শক্তি একযোগে প্রয়োগ করতে পারে, এবং এটার দ্বারাই তাদের অসীম শক্তি লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে আমাদের চাই সংহতি শক্তি সংগ্রহ ও বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন। আর এই কারণে স্বামীজির জাতীয়তাবাদের বিশেষ প্রাসঙ্গি কতা এসে পড়ে।[২৭]

স্বামীজি যে অধ্যাত্মজাতীয়তাবাদের প্রচার করেছিলেন তা চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১) জাতির ভিত্তি জনসাধারণও সেই জনসাধারণের জাগরণ। ২) মানুষের শারীরিক এবং নৈতিক বলের উন্নতি। ৩) সর্বজনীন অধ্যাত্মভাবগুলির ভিত্তিতে জাতীয় একত্ব। ৪) ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা সম্পর্কে সচেতনতা ও গর্ববোধ।[২৮]

স্বামীজির প্রেরণায় ভারতীয়গণের চেতনার জাগরণ

স্বামীজি অধ্যাত্ম-জীবনে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায়-ভারতের সমস্ত মানুষের অপরিসীম সাধনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল ভারত চেতনা। সেই ভারত চেতনার প্রসারিত জ্যোতিধারা অনুসরণ করেই শত সহস্র যুবক দেশমাতৃকার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। সে জ্যোতির কিরণে দেশ বিদেশে উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবিগণ ভারতের সঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদ আহরণ ও মূল্যায়নে ব্যাপৃত হয়েছেন। সেই জ্যোতির আলোকে সঠিক পথ সন্ধান করে অগ্রসর হতে পারলেই জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হবে।[২৯]

ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল বা অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি একে মনোবাক্যে ঘৃণা করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে অক্টোবর মেরী হেলকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা এর অন্যতম প্রমাণ। স্বামীজি

লিখেছেন ঃ "No good can be done when the main idea is blood - sucking."[৩০] (শোষণ যদি হয় ধ্যান-জ্ঞান তাহলে ভালর আশা করা বৃথা।)

বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দের "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-র আদর্শে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনব বেদান্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠল নব যুগের ধর্ম এবং ধর্ম আন্দোলন। আর এরই ভিত্তিতে সংঘটিত হল পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল মুক্তির বিপ্লব একথা সংশায়াতীতভাবে বলা যায়। পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলামুক্তির আকাঙক্ষা এবং প্রয়াসে নতুন শক্তি, নতুন গতি এবং নতুন মাত্রায় অভিনন্দিত হল স্বামী বিবেকানন্দের আগ্নেয় আহ্বান ও ঐতিহাসিক সাফল্য। আমরা দেখি বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বপূর্ণ বাণী ও রচনা হয়ে উঠেছে মুক্তিসংগ্রামী আদর্শ, তাঁর আহ্বান হয়ে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের রণধ্বনি।[৩১]

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের পূজারী হয়ে বলেছিলেন যে, সকল ভারতবাসীর প্রাণে স্পন্দিত ধর্মীয় চেতনার সূত্রেই ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড সত্তা। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অসংখ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অধ্যাত্ম পর্যায়ে যে ঐক্য বিদ্যমান সেটাই জাতীয় সংহতির ভিত্তিভূমি। এ ধরনের জাতীয়তাবোধে সংকীর্ণতার স্থান নেই। দ্বেষ বিদ্বেষও সেখানে নেই। সংহতির এই মৌল সূত্রটিকে তিনি দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকা আচার্য শঙ্করের সঙ্গে তুলনীয়। ঐতিহাসিক কে.এম্. পানিক্কর যথার্থভাবে স্বামীজিকে আখ্যা দিয়েছিন "দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য"[৩২]।

ভারতের ভবিষ্যৎ

স্বামীজি অদ্বৈতবেদান্তের যে মানবিক ব্যাখ্যা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন তাকে মূলমন্ত্র করে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাকে জাতীয়তাবাদী অধ্যাত্মসাধনায় পরিণত করতে হবে। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে অবলম্বন না করলে সত্যকার জাতীয়তাবোধ জাগে না, আত্মা উদ্বোধিত না হলে মানুষের চিত্ত সচেতন হয় না। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় জড়বাদের পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বামীজি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন — "ভুলিও না ভারত, তোমার নারী জাতির আদর্শ। তোমার উপাস্য দেবতা সর্বত্যাগের আদর্শ। তোমার জীবন সমাজ সেবায় উৎসর্গীকৃত।"[৩৩]

স্বামীজির ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নৈতিক বল। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী হতেই আমরা প্রথম শিখলাম যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে আমাদের নিজেদের কোন রূপ হীনম্মন্যতা বোধ জাগা উচিত নয়। পাশ্চাত্য যদি জড় সভ্যতায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চস্থানে আসীন হয়ে থাকে এবং ভারতবর্ষকে নিজের সমকক্ষ হবার জন্য সাহায্য করতে চায় ভারত ভিক্ষুকরূপে সেই সাহায্য গ্রহণ করবে না। বিনিময়ে ভারতেরও এমন কিছু দেবার আছে

যা না পেলে প্রতীচ্য সভ্যতার সৌধ ধূলোতে মিশে যাবে। অতএব ভারতবর্ষ আদান প্রদানের নীতি অনুসরণ করবে। তার শির চির উন্নত থাকবে। কারণ যে সম্পদ তার রয়েছে, তার বলে এইটুকু সে বলতে পারে যে, পাশ্চাত্যের তুলনায় সে কোন অংশে হীন নয়। এই মহাসত্যটি ঘোষণা করে স্বামীজি ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনে যখন চরম হতাশা, যখন উচ্চ নীচের ভেদাভেদে চরম দুর্দশা, যখন আত্মবিশ্বাস - হীনতায় সমস্ত দেশ অবসন্ন ঠিক তখনই পুণ্যময় মহাদেশে ধ্বনিত হল এক মহাবীরের কণ্ঠস্বর, ধ্বনিত হল এক নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ভারতীয় মহাজীবনের শাশ্বত বাণী। সমগ্র দেশে জাতি নিদ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে চোখ মেলে তাকালো, তাকালো দেশের বিশাল রূপের দিকে, তাকালো নিজের দিকে, তাকালো গৌরবময় ঐতিহ্যের অত্যুজ্জ্বল অতীতের দিকে।[৩৫]

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের পুনরুত্থানের কর্মসূচীকে সংক্ষিপ্ত ভাষণেই উপন্যাস করে গেছেন। অবশ্যই এই কর্মসূচীর ভিত্তি ছিল ধর্ম। তিনি হতাশা ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন মানসিক ভয় পরিত্যাগ করে জাতীয় মোহাচ্ছন্নতার গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে আসবার জন্য। তিনি তাদের দেহে ও মনে শক্তিমান হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানেই তিনি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন যে, অধঃপতিত জনসাধারণ দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোনো শক্তিমান জাতিই এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না যা চিন্তাশক্তিকে নিঃশক্তি করে দেয়। বিপ্লববাদীরা স্বামীজির কর্মসূচীর বাস্তব তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৬] তাঁরা উপনিষদের যে বাণীকে মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন সেটি হল — ''নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ''।[৩৭]

স্বামীজি ভারতবর্ষের বুকে আবেগময় অধ্যাত্মজাতীয়তাবাদের অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মচেতনাবাদ জাতীয়তাবাদের ধারক। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দৃষ্টিতে স্বামীজির জাতীয়তাবাদ হল অধ্যাত্মসাম্রাজ্যবাদ। কারণ তিনি মনে করতেন, স্বামীজির ডাকে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একটি গোঁড়া জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে এবং গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভারতের অধ্যাত্মজীবনভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিবেকানন্দপ্রবর্ত্তিত। শান্তিপ্রদায়ী এই জাতীয়তাবাদ অবশ্যই প্রশংসনীয়।[৩৮]

প্রসঙ্গত অবশ্যই বলতে হয়, বিবেকানন্দের মানবতাবিকাশের কর্মসূচী কেবল তাঁর নিজের দেশের জাতীয়তাবাদকে লক্ষ্য করে নয়, তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে রূপায়িত করার জন্য সার্বভৌম জাতীয়তাবাদকে ও বিশ্বমানবতাবাদকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত।

উপসংহারে বলা যায়, অধ্যাত্মজাতীয়তাবাদে স্বামীজির বিশেষ দৃষ্টি ছিল সর্বভারতীয় ও ব্যাপক। তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান উদ্‌গাতা। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদে শক্তি সঞ্চার করতে তিনি বহুল পরিমাণে মনঃসন্নিবেশ করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উল্লেখ অনেকেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। কিন্তু স্বামীজি জাতীয়তাবাদকে সর্বজনীন ধর্মের স্তরে উন্নীত করে তিনি ভারতবর্ষে আবেগময় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন যে, কেবলমাত্র অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করেই জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব। অতীত অধ্যাত্মজীবনকে কেন্দ্র করেই ভারতের গৌরব ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, অধ্যাত্মজীবনকে ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল সুতরাং এই অধ্যাত্মজীবনই জাতীয় জীবনের ধারক।

সর্বশেষে বলা যায়, সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজি সংসারত্যাগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রতীক। দেহের শক্তি আর মনের উদারতা এই দুটি বিষয়ের উপরই তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করতেন। সর্বপ্রকার ভীরুতা এবং ক্লীবত্বের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। যুবশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষদের আচরিত রীতিনীতিকে তিনি যুক্তির দ্বারা যাচাই করার উপদেশ আজীবন দিয়ে গিয়েছেন। রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের তিনি বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু সমাজজীবন থেকে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করার প্রতি তিনি আরোপ করতেন অধিকতর গুরুত্ব। সুস্থ বলীয়ান, কর্মনিষ্ঠ নাগরিক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যই জাতীয়তার মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন সকল শ্রেণীর ভারতবাসীকে। তাঁর প্রতিটি রচনার পঙ্‌ক্তিতে তীব্র জাতীয়তাবোধ এবং আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করে গিয়েছেন সম্প্রদায় - বর্ণ - ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ সমকালীন এমনকি পরবর্তী যুগের আর কোন ভারতীয় নেতার নামোল্লেখ সম্ভবপর নয়, যিনি স্বামীজির মতো সর্বভারতীয় চিন্তাধারাকে এত বিশাল মাত্রায় সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, স্বামীজির অধ্যাত্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নবজাগরণে সমগ্র ভারত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, কেবল তাই নয় তাঁর জাতীয়তাবাদের চির অম্লান আলোকে সমস্ত পৃথিবী উদ্‌ভাসিত হয়েছিল ও তার প্রভাব নিখিল বিশ্বে বিচ্ছুরিত

হয়েছে। স্বামীজির এটি নিজস্ব অবদান ।

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ । ৩/১৬
২। The complete works. Vol. III, P. 138
৩। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ । প্রথম খণ্ড । পৃঃ ১৭৪
৪। ভারতের সাধনা। পৃঃ ৩ - ৪
৫। The complete works. Vol. III. P. 371
৬। শঙ্করী প্রসাদ বসু ও শঙ্কর বিশ্ববিবেক । পৃঃ ১৬৭
৭। World thinkers on Ramakrishna - Vivekananda P. 47
৮। Ibid. P. 54
৯। The complete works. Vol. VI. P. 166
১০। উদ্বোধন ৪৯ তম বর্ষসূচী । পৃঃ ৬১৬
১১। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১/৬/২
১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । সপ্তম খণ্ড। পৃঃ ৪০
১৩। ঐ, অষ্টম খণ্ড। পৃঃ ২৪
১৪। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ । পৃঃ ৪৩৫
১৫। বিবেকানন্দের রাজনীতি। পৃঃ ২৭-২৮
১৬। বিবেকানন্দের স্মৃতি। পৃঃ ৩২৬
১৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । ৫ম খণ্ড। পৃঃ ১৯৮ - ১৯৯
১৮। ঐ, ৫ম খণ্ড। পৃঃ ১১৩ - ১১৪
১৯। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন । পৃঃ ৮৫
২০। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ । ২
২১। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ৩-৪
২২। The complete works, , P. 324
২৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । প্রথম খণ্ড। (ভূমিকাংশ)
২৪। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন। পৃঃ ১৩১
২৫। বিবেকানন্দ শতদীপায়ন। পৃঃ ১৩১
২৬। The complete works. Vol. III, P. 241 - 242
২৭। ıbid. vol. - III. P.- 299
২৮। স্বামী বিবেকানন্দ। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃঃ ২৯৪
২৯। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। ৬ষ্ঠ খণ্ড , পৃঃ ৫৯-৬০ ।
৩০। স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম । পৃঃ ৩৮
৩১। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ । পৃঃ ৭২
৩২। স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। ষষ্ঠ খণ্ড । পৃঃ ৩২
৩৩। স্বামী বিবেকানন্দ। স্মারক গ্রন্থ । পৃঃ ১৬
৩৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৪২
৩৫। বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা। পৃঃ ১৪
৩৬। বিবেকানন্দের রাজনীতি । পৃঃ ৫৮
৩৭। মাণ্ডুক্যোপনিষদ। ৩/২/৪
৩৮। বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা । পৃঃ ২০

বিবেকানন্দের ধ্যান, ধারণা ও তিতিক্ষারূপ সাধনা ও তার ফল

'দুর্গম পথের অভিযানে আঘাত লাগে'। কিন্তু এই আঘাত তখনই উপেক্ষিত হয়, যখন আঘাতের সঙ্গে কিছু শ্রেয় প্রাপ্তি ঘটে। অভিযানের সম্পর্কে এমার্সনের দৃষ্টিভঙ্গি "যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, স্বর্ণখনি ও নতুন দেশ বা কিছু আবিষ্কারের মত অভিযানের তৃষ্ণা নিয়তিই আমাদের দিয়েছেন। এগুলিই আমাদের কল্পনাকে বিকশিত করে ও সীমিত শক্তিকে প্রসারিত করে।" আমাদের বাস্তবিক সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মজীবন যাপন যেন আসুরিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দৈবী প্রবৃত্তির সংগ্রামের অভিযান। এই ধর্মযুদ্ধের পথে শত্রুদের এড়িয়ে পুণ্যধামে পৌঁছানোই আমাদের লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "সোনা রয়েছে আমাদের হৃদয়ে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না।" আমাদের এই সোনার খনির সন্ধান করতে হবে। এর অনুকূল প্রবল প্রচেষ্টার ফলে আমাদের নতুন শক্তির উন্মেষ হবে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে আমরা আমাদের স্বস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবো।[১]

তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অষ্টাঙ্গযোগ সাধনাবিশেষ

বিবেকানন্দ আত্মজ্ঞান লাভের উপায়রূপে অষ্টাঙ্গযোগের আলোচনা করেছেন। যোগসাধনার ফল চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা মনের শক্তি লাভ করে ব্যক্তিত্বের চরম উৎকর্ষের জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর অমূল্য উপদেশ সত্যই লক্ষণীয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মজ্ঞানের অনন্য উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন — "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২] আত্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন সেই নিদিধ্যাসনকে সুষ্ঠু চরিতার্থ করবার জন্য যোগশাস্ত্রের অষ্টাঙ্গযোগের (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধির) একান্ত উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। উপনিষদেও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি যোগের এবং যোগাঙ্গের অপরিহার্যতাকে উপদেশ করেছেন।[৩] সেখানেও আত্মজ্ঞানই যোগসাধনার প্রধান লক্ষ্য বলে নিরূপিত হয়েছে। যদিও পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রধান কারণতা ও বহুপুরুষাদি তত্ত্বাংশের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্বাংশের সুমহৎ পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি আত্মার অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্যরূপতা, পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব, অকর্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব বিষয়ে এবং বুদ্ধি, অহংকারাদির জড়ত্ব বিষয়ে ও বিশেষতঃ যোগের তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্ব বিষয়ে যোগদর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। এবং পাতঞ্জল দর্শনভিত্তিক যোগানুষ্ঠান যে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট সাধন সে বিষয়ে আচার্য শঙ্করও একই মত পোষণ করেছেন।[৪] বিবেকানন্দ অনেক স্থলে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সাযুজ্য বা ঐক্যকেই যোগের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এবং আত্মতত্ত্বোপলব্ধি বা স্বস্বরূপোপলব্ধিকেই যোগের ফল বলেছেন। ধ্যানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ করতে করতে স্ফটিক (স্ফটিকের সঙ্গে তুলনীয়

মন) নিজের স্বরূপ জানতে পারে এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয়। অন্য কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদেরকে সত্যের অধিকতর নিকটে নিয়ে যায়।[৫]

রাজযোগ ও ধ্যানাভ্যাস

স্বামীজি রাজযোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, সারা জীবনের অমূল্য কাজ এটি। আর যাকে লাভের জন্য এই প্রচেষ্টা, তাকে পাবার জন্য যত মূল্যই আমাদেরকে দিতে হোক না কেন, সে মূল্যের এটি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; কারণ আমাদের লক্ষ্য হল ভগবৎসত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্বানুভূতি।[৬] তিনি আরো বলেছেন, স্থূল চিত্তবৃত্তিগুলিকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর বৃত্তির সংস্কারগুলিকে দমন করা যায় কিরূপে? এর সমাধানে স্বামীজি বলেছেন, যখন আমি রুষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি এটা অনুভব করতে পারি, এর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীরে এর কারণ জানতে না পারি, তবে কখনই আমি একে জয় করতে সমর্থ হব না। ধর কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলল, আমারও বোধ হতে লাগল আমি উত্তেজিত হচ্ছি, সে আরও কড়া কথা বলতে লাগল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম, আত্মবিস্মৃত হলাম, ক্রোধবৃত্তির সঙ্গে যেন নিজেকে একত্রিত করে ফেললাম।[৭] যখন সে আমাকে প্রথমে কটু কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, তখন আমার বোধ হয়েছিল আমি যেন ক্রুদ্ধ হচ্ছি। তখন ক্রোধ একটি এবং আমি তার থেকে পৃথক ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হয়ে গেলাম। স্বামীজির মতে এই বৃত্তিগুলিকে মূল বীজ ভেবেই সূক্ষ্মাবস্থাতেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। এগুলি আমাদের উপর প্রতিনিয়ত ক্রিয়া করছে। এর পরিণতি বুঝবার পূর্বেই এগুলিকে সংযত করতে হবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নয়। যে অবস্থায় এই বৃত্তিগুলি অবচেতন ভূমি হতে একটু একটু করে উদিত হয়, তাকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা হয়। যখন কোন হ্রদের তলদেশ হতে একটি বুদবুদ উত্থিত হয়, তখন আমরা একে দেখতে পাই না; শুধু তাই নয়, উপরিভাগের খুব নিকটে আসলেও আমরা এটা দেখতে পাই না। যখনই এটা উপরে উঠে মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখনই আমরা জানতে পারি একটা তরঙ্গ উঠছে। ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মনের সূক্ষ্মবৃত্তিরূপ তরঙ্গগুলি প্রশমিত হতে পারে। যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এর অভ্যাস করা যায়, যতদিন না এটা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়, অর্থাৎ যতদিন না ধ্যান আপনা হতে আসে, ততদিন যদি এর পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা যায়, তা হলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি দুষ্ট মনোবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে ও পরে নিরস্ত হবে।[৮]

স্বামীজির মতে 'ধারণা'

স্বামীজি বলেছেন যে, ধ্যানের দ্বারা মনকে একত্রিত করতে পারলে তার থেকে কোন একটা বিষয়ে মনকে ধরে রাখাই হচ্ছে 'ধারণা'। আমাদের সকলের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কোন একটা বিষয়ে মনকে ধরে রাখার অর্থ কি ? এর উত্তরও আমরা স্বামীজির বাণী ও রচনা হতে জানতে পারি যে, মনকে অন্য সকল বিষয় হতে বিশ্লিষ্ট করে কোন একটি বিশেষ বিষয় অনুভব করতে বাধ্য করা দরকার। উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে আরো সুন্দর ভাবে বলতে পারি যে, শরীরের অন্যান্য অবয়ব অনুভব না করে যদি কেবল হাতটিকে অনুভব করার চেষ্টা করা যায়, তখন মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ হয় একেই বলে 'ধারণা'। পতঞ্জলির সূত্র 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা'।[৯] অবশ্য এই ধারণা নানাবিধ হয়ে থাকে। স্বামীজি আরো বলেছেন, মনে কর হৃদয়ের মধ্যে এক বিন্দুর ধারণা করতে হবে। এটি কার্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায়, হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, সেটা যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। সেই স্থানে মনকে ধারণা করলে ঐ জ্যোতিটিকে দেখতে পাওয়া যাবে। আর অন্য কিছুই দেখা যাবে না। এইভাবে কোন বিষয়কে ধারণা করতে পারলে পরবর্তী স্তরে সাধন লাভ হয়। এই সাধন লাভ করা অবশ্যই দার্শনিক জীবনে সর্বাধিক দুঃসাধ্য। প্রসঙ্গত বক্তব্য, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ বলতে যে অন্যায়ের অপ্রতিরোধ বোঝায়, তা স্বামীজি পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, বাহ্যতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ করলেও আমরা অন্তরে বিষণ্ণতা বোধ করি। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করল বা কুৎসিত আচরণ করল। তবুও নিজেকে সংযত করে ক্রোধ প্রকাশ করলাম না। কিন্তু আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা থাকতে পারে এবং আমি লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারি। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়। এমনকি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকবে যেন প্রতিহিংসাকর কিছুই না ঘটে। কেবল সেই অবস্থায় উপনীত হলেই অপ্রতিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এর পূর্বে নয়।[১০]

তিতিক্ষা

স্বামীজি 'তিতিক্ষা' সম্বন্ধে বলেছেন, দুঃখ প্রতিরোধ করবার অথবা দূর করবার চিন্তামাত্র না করেও মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রেখে সর্ববিধ দুঃখের যে সহনশীলতা তাই ''তিতিক্ষা' । স্বামীজি আরো বলেছেন -- মনে কর, অশুভের প্রতিরোধ না করার ফলে গুরুতর অনিষ্ট হল। আমার যদি তিতিক্ষা থাকে তা হলে অশুভ প্রতিরোধ না করার জন্য আমার অনুশোচনা থাকে না। সেই অবস্থায় উন্নীত হলে মন তিতিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীরা এই তিতিক্ষা অভ্যাসের জন্য অপূর্ব সাধনায় রত হন। তাঁরা কিছু গ্রাহ্য না করে তীব্র শীত ও উষ্ণ সহ্য করেন, তাঁরা

তুষারও গ্রাহ্য করেন না, কেননা দেহ সম্বন্ধে তাঁদের কোন চিন্তাই থাকে না। দেহের ভাবনা দেহই করে, এটা যেন একটা বাইরের জিনিস।[১১]

সত্যলাভের উপায়

অতঃপর স্বামীজি মানুষের একমাত্র সত্য আরাধ্য সম্পর্কে বলেছেন, মানুষ সত্যকে পেতে চায়, সত্যকে অনুভব করতে চায়, সত্যকে ধারণা করতে চায় । কিন্তু সত্যকে লাভ করা অতি দুষ্কর । তাকে পাওয়ার জন্য যারপরনাই প্রয়াসশীল হতে হবে। তাতে যদি বার বার বিফলতা আসে ক্ষতি নেই। স্বামীজি বলেছেন, যদি জীবনে বিফলতা না থাকত তবে তাকে জয় করার চেষ্টাও থাকত না। তাই বিফলতা দেখে ভয় পেয়ে নিশ্চেষ্ট হলে চলবে না। বেদে এইরূপ ঘোষণা করেছেন ঃ "হে অমৃতের পুত্রগণ যিনি সকল তমসার পারে, তাঁকে জানতে পারলেই অজ্ঞানান্ধকার হতে সত্য আলোকে যাওয়া যায় — মুক্তির আর কোন উপায় নেই।[১২]

রাজযোগ বিজ্ঞানের লক্ষ্য সেই সত্যকে লাভ করার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ প্রণালী আছে। তাই স্বামীজি বলেছেন, তুমি যদি জ্যোতির্বিদ হতে ইচ্ছা কর, আর বসে বসে কেবল 'জ্যোতিষ জ্যোতিষ' বলে চিৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিশাস্ত্রে অধিকারী হতে পারবে না। জ্যোতির্বিদ হতে হলে তোমাকে মন মন্দিরে গিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ - নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে হবেই, তবে জ্যোতির্বিদ হতে পারবে। রসায়ণ শাস্ত্র সম্বন্ধেও একই কথা। এখানেও একটা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। পরীক্ষাগারে গিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিতে হবে ঐগুলি মিশিয়ে যৌগিক পদার্থে পরিণত করতে হবে, পরে ঐগুলি নিয়ে পরীক্ষা করলে তুমি রসায়নবিৎ হতে পারবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। তাই স্বামীজি বলেছেন, আমি তোমাদেরকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি চেষ্টা না কর, সাধনা না কর, তোমরা কখনই সফল হতে পারবে না; সকল যুগে সকল দেশেই শুদ্ধস্বভাব জ্ঞানী মহাপুরুষেরা এই সত্য প্রচার করে গিয়েছেন। আর তাঁরা সকলকে আহ্বান করেছেন। একটা নির্দিষ্ট আন্তরিক সাধনপ্রণালী নিয়ে সত্যকে পরীক্ষা করতে আহ্বান করেছেন। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী নিয়ে নিষ্ঠাপূর্বক সত্যকে লাভ করার সাধনা করতে হবে। আর এই ধ্যান, ধারণা, তিতিক্ষারূপ সাধনার দ্বারা অবশ্যই একদিন না একদিন ফল লাভ হবেই।[১৩]

এই রাজযোগ সাধনার দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন। এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংযম বিষয়ক, কিন্তু এর অধিকাংশ মন-সংযম বিষয়ক। এখানে বক্তব্য, মন শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। মন শরীরস্থ সূক্ষ্ম আন্তর ইন্দ্রিয়রূপ তৈজস শক্তি বিশেষ, সুতরাং এই মন শরীরের উপর কার্য করে, আবার এটাও বক্তব্য যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। আমরা জানি শরীর অসুস্থ হলে মনও অসুস্থ হয়,

শরীর সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ এবং সতেজ থাকে। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হলে শরীরও অস্থির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাদের মন অতি অল্প বিকশিত। মনের উপর তাদের কোন প্রভুত্ব নেই। একমাত্র মনীষীগণই মনকে স্বেচ্ছাধীন করতে পারেন। মনকে বশে এনে বিষয় থেকে সর্বতোভাবে উপরত করে আত্মস্থ করতে পারেন। মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য — শরীর ও মনকে বশীভূত করবার জন্য আমাদের আসন প্রাণায়ামাদি দৈহিক সাধন ও যম নিয়ম, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি আন্তর সাধনের একান্ত প্রয়োজন। এই ভাবে যোগসাধনার দ্বারা শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হবে, এবং সর্বথা বশীভূত হবে তখন সেই শরীর ও মনকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করতে পারব। ফলত বিশুদ্ধ মনের সাত্ত্বিক শক্তিগুলি সাধনার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ফল লাভ করতে সমর্থ হবে।[১৪]

মনঃসংযমের নিয়ম ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়

স্বামীজি বলেছেন, যোগী যেমন প্রতিনিয়ত সাধনা অভ্যাস করেন, সেরূপ যাঁরা সাধনার দ্বারা ফল লাভ করতে চান তাঁদেরকে নীরব নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে। কারণ নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্তকে ক্ষিপ্ত করে, আবার বেশি কথা বলাও অসমীচীন, কেননা তাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়। আর বেশি কাজও করা উচিত নয়। কারণ বেশি কাজ করলে মনকে সংযত করা যায় না। আর যিনি এই সব নিয়ম মেনে কাজ করতে পারেন তিনি অবশ্যই ফল লাভ করবেন। স্বামীজি সাধনা সম্বন্ধে আরো বলেছেন যে, যাঁরা শীঘ্র কঠোর সাধনা করে ফল লাভ করতে চান তাঁদের আহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাঁদের দুধ ও মাছই সাধন জীবনের সহায়ক হবে। এইভাবে শরীর সম্পর্কে সচেতন থেকে সাধনায় এগিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি, ধ্যান-ধারণাই যোগীর জীবন সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়। আর যদি আমরা সত্যই কৃতার্থ হতে চাই ও অপরের জীবন ধন্য করতে ইচ্ছা করি তা হলে আমাদের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আর এটা কার্যে পরিণত করবার একমাত্র উপায় মনকে কোনরূপ বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাদের সঙ্গে কথা বললে মনের চঞ্চলতা আসে, তাদের সঙ্গ পরিহার করা। স্বামীজি আরো বলেছেন যে, তোমরা সকলেই জানো যে, কতকগুলি স্থান কোন কোন ব্যক্তি ও কিছু কিছু খাদ্য যেগুলি খুবই বিরক্তিকর সেগুলি সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। অসৎ সঙ্গ সর্বদাই ত্যাগ করতে হবে। খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা করতে হবে। জীবন মরণ কিছুই গ্রাহ্য করা চলবে না, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করে সাধনাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। যদি খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন যোগী হতে পারবে। এবং ফললাভ অবশ্যই করবে। আর যারা সাধনে অধ্যবসায়হীন তারা ধর্ম কথা শুনে মনে করে - বাঃ এ তো বেশ। তারপর বাড়ি গিয়ে সব ভুলে যায়। সাধনার সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়শীল সাধক হতে হবে। একদিন তার মনে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় অবশ্যই হবে, আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান

করতে পারব, আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হয়ে যাবে। এইরূপ তেজ ও এরূপ সংকল্প আশ্রয় করে খুব দৃঢ় ভাবে সাধনা (ধ্যান, ধারণা করলে) নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্যে উপনীত হবেন।[১৫]

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ধ্যানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভের কথা বলেছেন —

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা,
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।"[১৬]

কেউ কেউ ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণের বুদ্ধিতে সাক্ষীভূত প্রত্যক্‌চৈতন্যকে দর্শন করেন। অন্য কেউ জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং অপরে কেউ কর্মযোগ দ্বরা আত্মদর্শন করেন।

স্বামীজির ধ্যান, ধারণা ও সমাধি

স্বামীজি ধ্যান, ধারণা ও তিতিক্ষা রূপ কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[১৭] বিদেশী শাসকবর্গের পদতলে পরাধীন ভারতবর্ষে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দলিত ও মথিত দেশবাসীর যে আর্তনাদ উঠেছিল তাতে বিচলিত হল যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়। এই কর্মযোগী যুবসন্ন্যাসী ধ্যানধারণাদি সাধনার দ্বারা স্বয়ং নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর স্বপ্নময় গতিপথ। স্বামীজি জীবন ও জগৎকে অসার বিবেচনা করে শুধু আত্মানন্দের সন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকবেন এই সংকল্পে তিনি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। মাতা ও ভ্রাতাদের অর্ধাশন, অনশন, অসহায় দশা, প্রিয় ভগিনীর শোচনীয় মৃত্যু কোন কিছুই তাঁর দুর্দম গতিপথকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। প্রাণপ্রিয় গুরুভাইদের স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনও তাঁকে টলাতে পারেনি। ভ্রাতা ও ভগিনীর, মাতা ও গুরুভাইদের ছেড়ে যেতে হৃদয় প্রপীড়িত হয়েছে, কিন্তু সঙ্কল্প থেকে একচুলও তিনি সরে আসেননি।[১৮] ভারতবাসীর মুক্তি সধানায় উদগ্র প্রেরণায় ও তীব্র ব্যাকুলতায় উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দ গিরিগুহায় ধ্যানজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কখনো কাশি, কখনো গাজীপুর, কখনো বৃন্দাবন,কখনো হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কখনো আলমোড়া, কখনো বা হিমালয়ের নির্জনতার প্রদেশে গিয়ে তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। বহুবার গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও তাঁর হয়েছে। আলমোড়ার অনতিদূরে কাঁকড়ি ঘাটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে এবং হৃষীকেশে চন্দ্রেশ্বর মন্দিরের নিকটস্থ এক পর্ণকুটিরে গভীর ধ্যান সাধনায় তাঁর কতদিন যে বিনিদ্র রজনী কেটে ছিল তার ইয়ত্তা নেই।[১৯]

কন্যাকুমারীতে ধ্যানমগ্ন স্বামীজির ভবিষ্যৎ দর্শন

স্বামীজি ভারত পরিক্রমা শেষে কন্যাকুমারীর শিলাপীঠে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি এখানে কার ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন ? আত্মমুক্তির ধ্যানে, না সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ধ্যানে ? আমাদের মনে হয়, স্বামীজির সর্ব প্রথম ধ্যানে ঈশ্বর লাভের ঐশী শক্তি লাভের ইচ্ছা ছিল। তা তিনি লাভও

করেছিলেন। আর আত্মমুক্তির সাধনাও তিনি করেছিলেন এবং ফললাভ তাঁর হয়েছিল কঠোর সাধনার দ্বারা। তবে তিনি এখানে যে ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ ''তাঁর চিন্তার মুখ্য বস্তু ছিল বহু ধর্মের জন্মস্থান ও মিলন ক্ষেত্র অতীতের গৌরবময় অধ্যাত্ম- মহিমোজ্জ্বল পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ আর বর্তমানের দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত হতবীর্য, হতগৌরব, হতাধ্যাত্মসম্পদ ভারতবর্ষ এবং তার তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভারতের এরূপ অবস্থা দেখে স্বামীজি অতিশয় শঙ্কিত হয়েছিলেন। তার বারবার মনে হয়েছিল যে, গৌরবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় ভারত কেমন করে অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে আসল। দীর্ঘ ভারত পরিক্রমাকালে দেশের নানা স্থানে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে তিনি বারং বার শুনিয়েছেন, অপধর্মই এদেশের অধঃপতনের মূল কারণ। কর্মের বিকৃতি, ধর্মের নামে চূড়ান্ত ভ্রষ্টাচার, অনাচার এবং শোষণের ভয়াবহরূপ তিনিও স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু ভারতপরিক্রমার সুবাদে যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁর লাভ হয়েছিল তার আলোকে সমাজের বর্তমান অধঃপতনের জন্য ধর্মের কোন অনিষ্টকর ভূমিকা তো নেইই, বরং ধর্মকে যথাযথভাবে অনুশীলন ও পালনের ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী।[২০] সেই নির্জন দ্বীপে ধ্যানমগ্ন এই সন্ন্যাসীর মন খুঁজে বেড়াতে লাগল ভারতের ভবিষ্যতের পথ। স্বামীজির সকল আবেগের কেন্দ্রে ছিল না বঙ্গদেশ, আর্যবর্ত বা দাক্ষিণাত্য। সকল ভাবনার শীর্ষে ছিল একমাত্র অখণ্ড ভারত। স্বামীজির কন্যাকুমারীর ধ্যান ঈশ্বরের ধ্যান না হয়ে পর্যবসিত হলো নবীন ভারত আবিষ্কারের ধারণায়। আত্মমুক্তিপ্রয়াসী সন্ন্যাসী রূপান্তরিত হলেন সুমহান দেশপ্রেমিক ও সংগঠন শক্তিধর দেশনায়কে। ঈশ্বরের নাম নয়, ওষ্ঠে তাঁর ইষ্টমন্ত্র — ''আমার ভারতঅমর ভারত।''

উপনিষৎ সাহিত্যের একটি মাত্র শব্দে বিবেকানন্দের জীবন দর্শন বিধৃত হল — 'অভীঃ'। নবজাগ্রত ভারতবাসীর হৃদয়ে এই 'অভীঃ' মন্ত্র সঞ্চারই ছিল তাঁর অপরিসীম কর্ম- সাধনার মূল প্রেরণা।

কন্যাকুমারীর শিলাসনে ধ্যানের গভীরে স্বামীজি উপলব্ধি করলেন ভারতের সেই অনির্বাণ দীপশিখা যা জগতের সভ্যতাকে, চিরকাল ধ্রুব নক্ষত্রের পথ দেখাবে বাঁচার পথ, জীবনের পথ, উত্তরণের পথ। আর সেই উপলব্ধিই পরবর্তীকালে তাঁর লেখনীতে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল ঃ ''ভারত কি মরে যাবে ? তা হলে জগৎ হতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হবে, চরিত্রের মহান আদর্শসকল বিলুপ্ত হবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হবে; তাঁর স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাবে। অর্থ সেই পূজার পুরোহিত; প্রতারণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পূজা পদ্ধতি আর মানবাত্মা তার বলি।[২১]

স্বামীজি কন্যাকুমারীর শিলাতটে ধ্যানের অসাধারণ সাধনার দ্বারা দেখতে পেলেন —''ভারত আবার উঠবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; আধ্যাত্মিকতার বিজয় পতাকা নিয়ে। তিনি আরো বললেন ''আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি,

আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জেগে উঠবে। পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হয়ে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।"[২২]

স্বামীজি কন্যাকুমারীর শিলাভূমিতে ধ্যানাবস্থার মধ্যে আরো উপলব্ধি করলেন যে, সুবিশাল অখণ্ড ভারত ভূখণ্ড তাঁর চেতনাকে অধিকার করে রয়েছে। তিনি ধ্যানের স্বচ্ছ আলোকে তাঁর এতদিনের বিশ্বাস, ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি এক নতুন ও গভীর মাত্রা লাভ করল। এবং সেগুলির এখন উপলব্ধির স্তরে উত্তরণ ঘটল। কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতারও বিকাশ লাভ ঘটেনি, তখন ভারতের সভ্যতা কোন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, দ্রাবিড় ও তার পূর্বতন সভ্যতা কিভাবে আর্য বা বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মত বিনিময় করেছে, কি ভাবে বিভেদ ও বৈষম্যকে দূর করে ও একে অপরকে অথবা অপর সকলকে সহ্য করে ভারতবর্ষকে একটি সর্বধর্ম সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমিরূপে নির্মাণ করার ভিত্তি স্থাপন করেছে। ধ্যানের আলোকে তিনি ভারতের এই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করলেন। তিনি আরো উপলব্ধি করলেন, ভারতের সেই অপূর্ব জীবনদর্শন যা অপরকে ছাড়িয়ে যেতে অবশ্যই প্রেরণা দেবে, কিন্তু কখনো কাউকে মাড়িয়ে যেতে বলবে না।[২৩]

বিবেকানন্দের স্বীকৃত স্বাঙ্গীকরণ পদ্ধতি

স্বামীজি আরো উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের এই অপূর্ব ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে "স্বাঙ্গীকরণ পদ্ধতি"। 'স্বাঙ্গীকরণ' বলতে বোঝায় বিজাতীয় বা বিরুদ্ধ কোন বস্তু বা ভাবকে নিজের অঙ্গের বা দেহের অংশীভূত করে নেওয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে স্বামীজিই সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম এই অশ্রুতপূর্ব শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজি আরও একটি অনবদ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটি হল 'আত্মস্যাৎ'। স্বামীজি তাঁর ধ্যাননেত্রে দেখেছিলেন, ভারতবর্ষ তার বিশাল হৃদয়ে সবাইকে শুধু স্থানই দেয়নি, সবাইকে তার অঙ্গে অংশ করেও নিয়েছে। এইভাবে স্বামীজি ধ্যানের আলোকে লাভ করলেন বিশ্বজয়ী ভারতের ইতিহাস।[২৪]

ভারতবিজয়

অতঃপর স্বামীজির ধ্যান যখন ভাঙল তখন তাঁর উন্মীলিত নয়নদ্বয় পতিত হল দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্রের উপর। বোঁমা রোলাঁ লিখেছেন ঃ যখন স্বামীজির ধ্যান ভাঙল তখন তিনি সমস্ত বিশ্বের কাছে আবেদন করলেন, ভারতকে সমস্ত বিশ্বই চাইবে। ভারতের সুস্থ জীবন ও ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব জড়িয়ে থাকবে। সেই মুহূর্তে স্বামীজি সমুদ্রপারের দেশগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। মনে মনে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করলেন, ভারতের চিরন্তন বাণী ও আদর্শকে সেখানে সেখানে পৌঁছে দেবেন। তিনি ভারতের

আধ্যাত্মিক দূত হবেন। বহির্বিশ্ব বুঝবে, ভারত মরে নি, ভারত মরবে না। বুঝবে, ভারত সভ্যতার ধাত্রী জননী, পৃথিবীর সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে ভারতের স্থায়িত্বের উপর। এই কথা ভেবে তিনি মনে মনে অনুভব করেছিলেন পাশ্চাত্যকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন যে, পাশ্চাত্যে যাবেন কি করে ? গুরুদেবের আদেশ যে তিনি পাননি। এভাবে গভীর চিন্তা করতে করতে তিনি নিদ্রিত হলেন। আর ঐ নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন এবং যেতে যেতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন "যাও ঝঞ্ঝার বেগে পাশ্চাত্যকে আক্রমণ কর এবং পাশ্চাত্যকে জয় কর। আর ঐ বিজয় দ্বারা তুমি নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করবে, উত্তোলন করবে এবং জগৎকে রক্ষা করবে।[২৫]

অতঃপর ঐ বাণী স্বামীজির কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তাঁর প্রাণে আনন্দের ধ্বনি উঠল। তাঁর হৃদয় এক অভূতপূর্ব গর্ব ও আনন্দে শিহরিত হতে লাগল। এই উপলব্ধিতে তিনি সহস্র বিপর্যয় ও শত আঘাত সত্ত্বেও জয়ধ্বনি তুললেন —

"আমার ভারত, অমর ভারত !"[২৬]

স্বামীজির পাশ্চাত্য গমনের আগে পাশ্চাত্য জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না সত্য, কিন্তু কন্যাকুমারীর ধ্যান যেমন ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্যকে, চিরন্তন ভারতকে তাঁর মানসনেত্রের সামনে উন্মোচিত করেছিল, তেমনই পাশ্চাত্যের আত্মিক প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতার দুর্বলতাকেও উন্মোচিত করেছিল। এর পর যে বাণী ও আদর্শ তিনি পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তাতে শুধু ভারত নয়, পাশ্চাত্য তথা সমগ্র জগতের কল্যাণ নিহিত। স্বামীজি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে পাশ্চাত্যের চরিত্র তিনি সম্যক্‌ভাবে অবহিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্যে পদার্পণের আগেই কন্যাকুমারীতে তিনি ধ্যানের আলোকে জেনেছিলেন — ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও পরমত অসহিষ্ণুতা পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিবে। এই কথা ভেবে তিনি মনে মনে অনুভব করেছিলেন পাশ্চাত্যকে রক্ষা করতে হবে। পরে স্বামীজি পাশ্চাত্য সমাজকে স্বচক্ষে দেখে মনে করেছিলেন, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত এবং যে কোন মুহূর্তে তা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।[২৭]

উপসংহারে বলা যায়, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ — এটি কোন স্বদেশপ্রেমিক বা স্বজাতিপ্রেমিকের উক্তি নয়. এটা প্রকৃতপক্ষে একজন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক, একজন বাস্তব বিশ্বপ্রেমিকের উক্তি। এটি এমন একজনের উক্তি, যাঁকে বিধাতার অমোঘ নির্দেশে পরিব্রাজকের বেশে আসমুদ্রহিমাচল ভারত পরিভ্রমণ ও একতামুখী ধর্মের বাণী প্রচার করতে হয়েছিল, এটি এমন একজনের উক্তি যাঁকে যুগপ্রয়োজনে খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে বর্তমান সভ্য পৃথিবীর অলিগলি ঘুরে সত্যের ও শান্তির বাণী প্রচার করতে হয়েছিল। যিনি মানুষের বর্তমান সভ্যতার দুর্বলতাকে দেখেছেন, যিনি চিরন্তন মানুষের শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়েছেন, যিনি উদাত্ত কণ্ঠে নিদ্রিত প্রাচ্যকে জাগ্রত করে দিয়েছেন,

এবং যিনি শান্ত মধুর কণ্ঠে উভয়কে আহ্বান করেছেন মিলিতভাবে এক পূর্ণাঙ্গ নবতর আধ্যাত্মিক সভ্যতা গড়ে তুলতে, তিনিই আমাদের এই স্বামীজি বিবেকানন্দ ।

স্বামীজি প্রধানতঃ ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগ আসছে — জড়বাদের পর স্বাভাবিক নিয়মেই আগামী সভ্যতার বিশেষত্ব হবে অধ্যাত্মবাদ। ভারতীয় যোগদর্শনোক্ত সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও জ্ঞানের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হবে। এবং ভারতও আধ্যাত্মিকতার সামর্থ্যে দারিদ্র্য ও দুঃখে কাল যাপন করবে না, জড়বিজ্ঞানপ্রসূত ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে বন্টিত হবে এবং ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানও মানুষের পশুত্ব বিনষ্ট করে তাকে যথার্থ 'মানব'পদবীতে ভূষিত করবে। এই উভয়বিধ উন্নতির সামঞ্জস্য বিধানের কেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ।

আরো বলা যায়, ভারতভূমিতে দীর্ঘ কয়েক দশকের পরাধীনতা জাতীয় জীবনকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। নানা কুসংস্কার, জাতিভেদ, অপবিত্রতা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা জাতীয় জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। যদি স্বামীজির মত একজন সমাজ সংস্কারক মেধাবী, বৈরাগ্য ও বিবেকবান মহাপুরুষ না জন্মাতেন, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ যে ক্রমশ অতিশয় পিছিয়ে পড়ত এবং কুসংস্কারে জর্জরিত হত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আসক্তিহীনতা, অনন্ত দৃষ্টি, ধ্যান, তন্ময়তা, তীব্র মনঃসংযম তাঁকে অধ্যাত্মভূমি ও অদ্বৈতভূমির চূড়ান্ত শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর সেই সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল সমগ্র বিশ্বের সম্মান, জাতির শ্রেষ্ঠতা, সামাজিক পুনর্গঠন ও যুবকদের নবচেতনা। নেতাজী সুভাষের মত বড় উদীপ্ত তেজস্বী সৈনিক স্বামীজির ভাবাদর্শেরই ধারক ও বাহক। শুধু নেতাজীই নন, শতাধিক বছর ধরে সহস্র যুবক আজ যে স্বদেশ ও বিদেশের হিতকামনায় ''আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে আত্মাহুতি দিয়েছে ও দিচ্ছে — এসবই স্বামীজির ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধ্যান, ধারণা, তন্ময়তা, বিশ্বাস, আর দৃঢ়তার অবশ্যম্ভাবী ফল।

১। দুঃসাহসিক অভিযান। পৃঃ - ১৮
২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৫
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ২৮৪ ।
কঠোপনিষদ্ ২/৩/১০-১, ১৮
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ২/৮ - ১৪
৪। বেদান্তদর্শন শারীরক ভাষ্য ২/১/২ দ্রষ্টব্য ।
৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৩৩০
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। প্রথম খণ্ড । পৃঃ ৩৪৯
৭। ঐ, তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৬৮
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। প্রথম খণ্ড । পৃঃ ২৬৯

৯। যোগদর্শন
১০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **প্রথম খণ্ড** । পৃঃ ২০৮ - ২০৯
১১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **দ্বিতীয় খণ্ড** । পৃঃ ২৯৬
১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । **প্রথম খণ্ড**। পৃঃ ১৬৭
১৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **প্রথম খণ্ড**। পৃঃ ১৬৮
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **প্রথম খণ্ড**। পৃঃ ১৭০-১৭১
১৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **প্রথম খণ্ড**। পৃঃ ২১০-২১১
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা । ৩ /২৫
১৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **পঞ্চম খণ্ড**। পৃঃ ১৬৬ - ১৬৭
১৮। স্বামী বিবেকানন্দ। প্রমথনাথ বসু। প্রথম ভাগ। পৃঃ ১৬২
১৯। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৩৮৬
২০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **ষষ্ঠ খণ্ড**। পৃঃ ৪১২-৪১৩
২১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। **পঞ্চম খণ্ড**। পৃঃ ৪৬২
২২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। পৃঃ ৪৫৬ - ৪৬৬
২৩। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৪০২
২৪। বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ । পৃঃ ৪৩
২৫। বিবেকানন্দের জীবন । পৃঃ ১৮ - ১৯
২৬। Life of Vivekananda. P. 27
২৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। পঞ্চম খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ। পৃঃ ১৭২, ৫১ - ৫২

নানা বিচ্ছিন্নতা পীড়িত বর্তমান সমাজে স্বামীজির মতাদর্শ ও অদ্বৈতবেদান্তের অপরিহার্যতা

দুঃখদৈন্য আধিব্যাধিবিড়ম্বিত ও মোহসাগরনিমগ্ন মানব সমাজকে অভিনব ভাব সম্পদ ও ধর্ম চিন্তার প্রেরণা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে মহামানবেরা আবির্ভূত হয়। বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে দিশাহারা হয়ে মানুষ যখন প্রকৃত কল্যাণের পথ অনুসন্ধান করতে থাকে, পার্থিব সুখ সম্ভোগের উদগ্র আকাঙক্ষার তাড়নায় অধীর হয়েও যথার্থ শান্তির শীতল বারির স্পর্শ না পেয়ে মানবের আন্তরাত্মা যখন মর্মঘাতী যাতনায় হাহাকার করে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে তখনই শান্তির ললিত বাণী বহন করে ধরাধামে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মানব সমাজের একান্ত দুঃসময়ে দুর্গতের পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়ে মহামানবগণ স্বীয় অমোঘ শক্তি প্রভাবে সামাজিক ধারাকে নতুন মহিমার অমৃতরসে সিঞ্চিত করেন, তার ফলে খোলস ত্যাগ করে সমাজদেহ নতুনত্ব লাভ করে। সুতরাং সমাজ মৃত্তিকায় সম্ভাব্যতার বীজ নিহিত থাকে বলেই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রকাশে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে, মানুষ নতুন পথে পরিচালিত হয়।

যুগাবতার পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তরসাধক বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁর বহুমুখী কর্মপদ্ধতি যদি আমরা অবলোকন করি তাহলে জানি যে, ভারতের তথা বাংলাদেশের এক মহাদুর্দিনে নিজের অসামান্য সাধনা ও কর্মের প্রভাবে এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত করে আত্মবিস্মৃত ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে তিনি বলীয়ান ও গরীয়ান করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১]

স্বামীজির আদর্শ

বিবেকানন্দের স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ছিল এক অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যে দার্শনিক তত্ত্ব তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের মধ্যে তিনি মানবের যে মহত্ত্ব ও গৌরব প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে অভিজ্ঞতা তাঁকে ঐ অমিত শক্তির অধিকারী করেছিল। কিন্তু তাঁর গুরুদেবের প্রয়াণের কিছুকাল পরেই তিনি ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে ঘুরে রাজন্যবর্গ থেকে কৃষকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী থেকে অস্পৃশ্য জাতি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় মহা তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন— আমি এখন কাশি ছেড়ে চললাম, আবার যখন এখানে ফিরব তখন সমাজের উপর একটা বোমার মত ফেটে পড়ব, আর সমাজ

আমাকে অন্ধের মত অনুসরণ করবে।[২]

বিবেকানন্দের নিজের জীবন ও বাণীর মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ উচ্চস্থান করে নিয়েছিল। দেশবাসীর বাস্তব দারিদ্র্য এবং দুরবস্থা দেখে স্বামীজি গভীরভাবে ব্যথিত হন। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি তেমন ধর্মে আদৌ বিশ্বাস করি না যা বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, অনাথের হাহাকার বন্ধ করতে পারে না।[৩]

সামাজিক দুঃখদুর্দশার কারণ ও স্বামীজি কর্তৃক তার প্রতীকারের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম এমন একজন ধর্মনেতাকে ভারতবর্ষ লাভ করল, যিনি মানবসমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের অধঃপতনের কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন, সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটা বিভ্রান্তি চলে আসছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে যেখানে এই বিভ্রান্তি পূর্বে কখনও ছিল না, কিছু দিন যাবৎ সেখানেও এটি প্রবেশ করেছে। সেই ভ্রম অধিকারী বিচার না করে সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা প্রদান করে। প্রকৃত পক্ষে সকলের একই পথ নয়। তিনি আরো বললেন যে, সন্ন্যাস আশ্রমই হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য। যখন মানুষ ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝবে যে সংসার অসার, তখন তাকে সংসার ত্যাগ করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে হিন্দু জীবনের আদর্শ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গেছে। এটা মহাভুল। ভারতে যে দুঃখ-দারিদ্র্য দেখা যাচ্ছে তা অনেকটা এই কারণেই হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্র্যের মূলে একটি সামাজিক কারণকেও মুখ্যতঃ দায়ী করেছেন। সেটি হল অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিত শ্রেণীর শোষণ ও নির্মম নিষ্পেষণ। পৌরোহিত্য চক্রের নির্মম শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তিনি বলেছেন যে, দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশবিশ লাখ সাধু আর ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন ও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক।"[৪]

জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর নিদারুণ শোষণ ও নিষ্পেষণ সম্পর্কে স্বামীজি বলেছেন যে, তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গত জনের কান্না তাদের কানে পৌঁছায়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার করেছে, তখন ধনীরা তাদের সোনা রূপার থালায় অন্ন গ্রহণ করেছে।[৫]

তৃতীয়তঃ বিবেকানন্দের মতে ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল অর্থনৈতিক কারণ। বিবেকানন্দ ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইংরেজ বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল,

ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। এবং ভারতের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে।[৬]

চতুর্থতঃ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সমাজে মুষ্টিমেয়ের আধিপত্যের ভয়াবহ পরিণামকে বর্তমান সমাজের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান ধনিক সভ্যতায় মুষ্টিমেয়ের বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ রয়েছে, যার ফলে দরিদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছে সবকিছু থেকেই, এবং পুনরায় তারা দরিদ্রতর হচ্ছে। এখানে তাঁর চিন্তার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দরিদ্ররা দরিদ্রতর হবে একথাটি মার্কসও ব্যবহার করেছেন একই প্রসঙ্গে। বিবেকানন্দ বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এক বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন, বলেছেন যে, একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বিদ্যমান, কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ । একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে।[৭] তিনি আরো বলেছেন যে, বর্তমানে যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ দ্বারা অসাধারণ শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে এবং এমন সব অধিকার দাবি করা হচ্ছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা হয়নি। এই কারণেই বেদান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে বিশেষ মানবজাতির উপর এই উৎপীড়ন চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে।[৮]

স্বামীজির বিশ্বমানবতাবাদ

বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম ও ভাবতসেবা তাঁর মানবপ্রেম ও মানবসেবারই একটি দিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম সর্ব জাতি নির্বিশেষে মানবপ্রেম নয়, গণ্ডিবদ্ধ স্বদেশ প্রেম। তাঁর মানবতাবাদ আসলে হয় তো বা শুধু স্বীয় জাতীয়তাবাদ ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু বক্তব্য এই, স্বামীজির জীবনের কোন কোন ঘটনা ও উক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচারের ফলে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর অন্যরূপ উক্তি এবং অন্য তাৎপর্যব্যঞ্জক ঘটনাগুলি জানলে তাঁর মানবতাবাদ যে শুধু ভারতবাসীকে কেন্দ্র করে নেই সকল দেশ ও জাতিকুল নির্বিশেষে সকল মানুষকেই বিষয় করে রয়েছে, তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁর প্রেম সহানুভূতি সেবা প্রবৃত্তি ভারতবাসীর দিকে স্বভাবতই প্রথমে ধাবিত হয়েছে ।[৯]

স্বামীজি বর্তমান সমাজের অবস্থা কল্পনা করে যখন পরিব্রাজক রূপে ভারতবর্ষকে ও তার ভারতীয় মানুষকে দেখলেন তখন তিনি দেশের মানুষের অপরিসীম দুঃখ এবং অধঃপতন দেখে শিউরে উঠেছেন বার বার। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখেছেন নিদারুণ অসঙ্গতি। মানবিক আচরণ নিয়ে কী সর্বনাশ অবমূল্যায়ন, দুর্লভ মানবতার কী ভয়াবহ নির্মম পরিহাস। মানুষে মানুষে এ কী ব্যবধান, সর্বত্র দুরূহ দুর্লঙ্ঘ্য বিভেদের প্রাচীর।

একদিকে স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য ও কুবেরের রত্নভাণ্ডার, আর একদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ মানুষের পশুর মতন জীবন যাপন। এক মুঠো অন্নের জন্য সে কি সকরুণ আর্তনাদ, দুঃসহ হাহাকার। একদিকে উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থহীন আকাশচুম্বী দম্ভ ও নির্লজ্জ নগ্ন আভিজাত্য, আর একদিকে চির নির্যাতিত নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীর সহায়-সম্বলহীন মানুষের আর্তক্রন্দন ও ক্রম নৈরাশ্য । মানুষের প্রতি মানুষের নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ নারীঘাতী। মাতৃপিতৃভ্রাতৃঘাতী কুৎসিত পৃথিবীতে মানুষের পাশবিক জীবনের দৃশ্য তিনি স্বচোখে দেখেছেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে। তারপর তিনি লক্ষ্য করেছেন, পুরুষশাসিত সমাজে নারীজাতির প্রতি কি নিষ্ঠুর অবহেলা ও নির্যাতন। অতএব স্বামীজি বলেছেন যে, নতুন ভারতবর্ষকে জাগাতে হলে চাই ঘরে বাইরে সর্বত্র সহৃদয় মানবিক সম্পর্কের বন্ধন। ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, অবহেলা নির্যাতন নয়; প্রসারিত করতে হবে সকলের জন্য প্রীতি ও প্রেমের প্রসন্ন হৃদয়। রচনা করতে হবে ভারত জুড়ে একটি প্রেমের পবিত্র সংসার।[১০]

স্বামীজি দুঃখ করে আবার বলেছেন যে, এদেশের পুরুষ ও মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্র বলেছেন, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। পুরুষসমাজকে কটাক্ষ করে বলেছেন, তোরা মেয়েদের অপারগতার নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস ? পরিশেষে নিজেই এগিয়ে এসে নারী জাতির উন্নয়নের পথ নির্দেশ করলেন ঃ ''নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যার মীমাংসা নিজেরাই করে নিতে পারে। তাদের হয়ে অপর কেউ এ কাজ করতে পারে না, করবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। আর জগতের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।''[১১]

স্বামীজি পদদলিত নিপীড়িত দরিদ্র ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে কত যে রাত্রি না ঘুমিয়ে কত উষ্ণ অশ্রু মোচন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমেরিকা থেকে স্বামীজি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট তারিখে লিখেছেন ঃ আমেরিকায় যা যা দেখলাম তার মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস এই যে, কারাবাসিগণের সঙ্গে কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন ভাবে তাদের চরিত্র সংশোধিত হয় এবং তারা ফিরে গিয়ে আবার সমাজের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর ! এটা দেখে তারপর যখন দেশের কথা ভাবলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কিভাবে রাখি । তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই, পালাবার রাস্তা নেই, উঠবার উপায় নেই, ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পীড়িতগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই, সে যতই চেষ্টা করুক তার উঠবার উপায় নেই, তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করছে, তার বেদনা তারা অনুভব করছে । কিন্তু তারা জানে না — কোথা হতে এ আঘাত আসছে। তারাও যে মানুষ, এটা তারা ভুলে গেছে। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর সাহায্য আসবেই আসবে। তোমরা এদের ভালো করে দেখ। এ ব্রত

গুরুতর। আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়, ভগবানের জয় হোক। আমরা সিদ্ধি লাভ করবই করব। কেবল বিশ্বাসী হও।[১২]

নেতাজী সুভাষের মতে স্বামীজির সাম্যবাদ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সাম্যবাদের পুনঃ প্রবর্তনেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাই বিবেকানন্দের উত্তর সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, স্বামীজি সাম্যবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'সাম্যবাদ' শব্দটি কোনও বিদেশী নয়, তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। সুভাষচন্দ্রের মতে স্বামীজি সেই সাম্যবাদে বিশ্বাস করেছেন — যে সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করেছিল ভারতের দর্শন, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে, সেই সাম্যবাদ প্রসারিত হয়েছিল বিবেকানন্দের আহ্বানে। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম''[১৩] এই শাশ্বত বাণীকে পারমার্থিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করবার প্রয়াসী হয়েছেন কিন্তু বিবেকানন্দ বেদান্তকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে সাম্যবাদকে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই ভগবান্ আছেন। দেশকে ভালবাসো, দেশের সেবা করো দেশের সেবার জন্য সমস্ত স্বার্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলি দাও। 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব' এই মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে বর্তমান সমাজে দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন করে তাকে পরমসুখী নারায়ণে পরিণত করা যায়। এই পথ বিবেকানন্দই প্রথম দেখিয়েছিলেন।[১৪]

স্বামীজি সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পতিবিয়োগে বধূর প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধরণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করতে সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলকে জাগরিত করতেই যেন তাঁর জন্ম।[১৫]

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা উন্মূলনে স্বামীজির বক্তব্য

স্বামীজি নানা বিচ্ছিন্নতা পীড়িত বর্তমান অন্ধ সমাজের এক আলোকবর্ত্তিকা, যিনি সর্ব যুগের সর্বকালের ও সর্বদেশের মূর্ত্ত জ্ঞানস্বরূপ। তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষ নন, তত্ত্বমাত্র। তুমি আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপমাত্র। এই অসীম অনন্ত সনাতন তত্ত্বের যত বেশি কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি ততই সার্থকতর হয়েছেন। সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে।[১৬] এই তত্ত্বটি প্রস্ফুটিত করা একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজি এই তত্ত্বের আলোকে নতুনকে আহ্বান করে বলেছেন, প্রাচীন কুসংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব, একেবারে সম্পূর্ণ নতুন, সরল অথচ সবল সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।[১৭]

স্বামীজির মতে আমাদের ভারত দরিদ্রের দেশ। এই দরিদ্রতা দূর করতে হবে, বেকারত্ব দূর করতে হবে, জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে সাংসারিক ও

সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে। একথা আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে। স্বামীজি যুবসমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সকলকে গিয়ে বল "ওঠ জাগো, আর ঘুমিও না, সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তা হলেই এ শক্তি জেগে উঠবে।"[১৮]

নানা বিচ্ছিন্নতাপীড়িত বর্তমান সমাজের ভাবী মঙ্গল কামনায় স্বামীজি বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় — মানুষ এই বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন, তাই যত মানুষ আছে, সব একেরই নানারূপে অভিব্যক্তি। অতএব কাউকে আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। আবার তোমার অন্তর হতে ঘৃণারাশি বাইরে বের হওয়া মাত্র অপর কাউকেও তা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হতে প্রেম নির্গত হলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাবে, কারণ আমিই বিশ্ব, বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, কিন্তু আমার সে অনুভূতি নেই। আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হবে, তখনই আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটবে।[১৯]

স্বামীজি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হতে সাম্যবাদে উপনীত হলেন, যেখানে জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই। অতি মূর্খ মানব, অতি অজ্ঞানী শিশু ও ঈশ্বর এবং ভবিষ্যতে যাঁরা মহামানব হবেন, তাঁরা সবাই সমভাবে মহান। প্রত্যেক জীবের অন্তরে চিরকালের জন্য সেই এক অনন্ত সত্তা নিহিত রয়েছে। বিচ্ছিন্নতাপীড়িত বর্তমান সমাজে স্বামীজির একটা বিশেষ অবদান হল কর্মে পরিণত বেদান্তের (Practical Vedanta) বলিষ্ঠ চিন্তাসূত্র। পূর্বেই এ বিষয়টি বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ সকলের মনে রেখাপাত করেছিল সেই ভেদ দূর করে স্বামীজি চিরভাস্বর একটি নতুন দিক উন্মোচন করলেন। অদ্বৈতবাদের মহৎ তত্ত্বটিকে স্বামীজি সহজ ও সরলভাবে সর্বজনীন কার্যকর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। কর্মে পরিণত বেদান্ত বিষয়ে তিনি চারটি অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন — বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করতে চায়, তবে একে একান্তভাবে কার্যকর করতে হবে। শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাও দূর করে দিতে হবে। কারণ বেদান্ত সকল বিভেদের মাঝে এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ধর্মের আদর্শ সকলের জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। আমাদের প্রত্যেকের চিন্তার ভিতর যেন এক সুর প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[২০]

স্বামীজির দৃষ্টিতে কর্মে পরিণত অদ্বৈতবাদ জগদ্বাসীর ভবিষ্যতের আশ্রয়। মানবজাতির স্থায়ী জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণসাধন করতে সমর্থ অদ্বৈতবাদ ধর্মের

এবং চিন্তার শেষ কথা। কেবল অদ্বৈত ভাবনাতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস, এই ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের সর্ব ধর্মে সমদর্শিতার তত্ত্বে হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র পৌছানোর কৃতিত্বটুকু অবশ্যই পেতে পারে।[২১]

স্বামীজি বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ স্বীকার করে এটাই বলতে চেয়েছেন, মানুষের নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানব সত্তা অনাদি অসীম নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত। মানবের প্রতিকূল পরিবেশ কারাবন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, মানুষকে আবরণমুক্ত করে অমৃতের অংশীদার ও পূর্ণতার অধিকারী করে তুলতে হবে। সেই আবরণ দূর করার সহজ উপায় স্বামীজিপ্রদর্শিত কর্মে পরিণত বেদান্ত প্রয়োগ । এখানে বেদান্ত বলতে মনে রাখতে হবে স্বামীজির বাণী — "The word Vedanta must cover the whole ground of Indian religious life."[২২]

বর্তমান সমাজে সকল রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের অগ্নিবাণী শাণিত কৃপাণের মত বারবার ঝলসে উঠেছে। শোষিত সর্বহারাদের প্রতি তাঁর অসীম সমবেদনা ও গভীর ভালোবাসা সকলের চিন্তা ও কর্মকে সর্বদা প্রণোদিত এবং তাঁদের চরিত্রকে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে ।

স্বামীজি প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন — সমাজে যারা ক্লিষ্ট, পিষ্ট ও পীড়িত তাদের মুখে দিতে হবে অন্ন, কণ্ঠে দিতে হবে ভাষা, বুকে সঞ্চারিত করতে হবে বল। তাই সেই সতেজ মুক্তিবার্ত্তায় শোষণজীবীদের চক্রান্ত ও হীন মনোবৃত্তি তীব্রভাবে ধিকৃত হয়েছিল।[২৩]

স্বামীজি পরাধীন অন্ধকারা থেকেই স্বদেশকে মুক্ত করে তার সত্য স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। সেই স্বরূপটি একান্তভাবেই আন্তর বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানময়। যে মাতৃভূমিকে তিনি স্বদেশবাসীর চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন তা জ্ঞানে গরীয়সী, কর্মে সৃষ্টিশীলা ও প্রেমে বিশ্বপরিব্যাপিনী। কোন গণ্ডির পূজা সেখানে স্বীকৃতি পায়নি। ভারতের রূপকাররা স্বধর্মকে ততক্ষণ শ্রদ্ধা করেছেন যতক্ষণ তা বিশ্বজনীন শাশ্বত ধর্মকে আঘাত না করেছে, স্বীয় সমাজের আনুগত্য তাঁরা ততদূর পর্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত যতদূর পর্যন্ত সে আনুগত্য মনুষ্যত্বের সাধনাকে ব্যাহত না করে। স্বদেশের প্রতি স্বামীজির ভালোবাসা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গভীর, কিন্তু যেখানে স্বদেশপ্রীতি বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত দেশপ্রেমকে বড় করে দেখেননি। কারণ বৃহতের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তিনি আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রকে কখনই বিপর্যস্ত হতে দেননি। চতুর্দশ ভুবনব্যাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন নিত্য নিরতিশয় বিশ্বাত্মসত্তায় তিনি স্বদেশের মননশীল সত্তাকে অলক্ষ্যে প্রবহমান হতে দেখেছেন। সমগ্রের সেই উপাসনায় অংশ অবহেলিত হয় নি, তবে অংশের সার্থকতা যে সমগ্রের রূপায়ণে, সে সত্যটি দ্বিধাহীন ভাবে অনুভব করেছেন। সেখানে অংশের প্রতি আসক্তিবশতঃ পূর্ণের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই 'পাপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই পূর্ণের আরাধনার পথেই ভারতের ইতিহাস দেশ, কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে মহামানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের আধ্যাত্মিক ধর্ম সাধনা, স্বদেশ সাধনা প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বমানবতার পূজা উপচারের এক একটি অঙ্গ বিশেষ। সে পূজায় যুগে যুগে যে বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রটি উদগীত হয়েছে তার মূল সুরটি হল যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক করে দেখে তারাই সত্যকে দেখে ।[২৪]

স্বামীজি ইসলাম সম্পর্কে যে বিখ্যাত উক্তি করেছেন তা হল, আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্মে পরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সেটা সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরাণও নেই অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয় দ্বারা একটা সুমহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবার অন্যত্র বলেছেন — ''আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এই বিপদ- বিশৃঙ্খলা ভেদ পূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠেছেন। আবার তিনি বললেন, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, কেবল অদ্বৈতভূমি হতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পাবে, আর এটাই হল ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের ধর্ম ।[২৫]

স্বামীজি বিচ্ছিন্নতাপীড়িত বর্তমান সমাজের কথা চিন্তা করে জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গ সম্পর্কে বলেছেন, ভারতবাসীদের জন্মগত জাতিভেদপ্রথা বিসর্জন দিতে হবে। জাতিভেদ প্রথা একটিঅন্ধ কুসংস্কার মাত্র। তিনি আরো বলেছেন, যেহেতু শক্তিক্ষয়কারী সমস্ত রকম কূপমণ্ডুকতাই মানবতার শত্রু, সেই হেতু সেটি আমাদের জাতীয় সমুন্নতির প্রধান অন্তরায়। মহা অনিষ্টকারী এই জাতিভেদের দুরূহ অচলায়তন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। জাতিভেদ পরিত্যাগ করতে কিন্তু শুনিনি তাঁর সে কথা। মুখে আমরা প্রগতিসম্পন্ন যত বড় বড় কথাই বলি, কার্যতঃ আমরা আজও নৈতিক দুর্বলতামুক্ত হতে পারিনি। তাই উচ্চ নিম্ন অসবর্ণের অন্তহীন গোলক ধাঁধায় অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছি। ''বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন — এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান্'' — বলে ঘরের ছেলেমেয়েদের গান গাইতে শেখাচ্ছি, কিংবা ''বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই'' প্রভৃতিমহৎ বাণীসকল শুধু উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে তালিম দিচ্ছি । কিন্তু একই দেশে একই বাতাবরণে লালিত পালিত হয়েও একই রকম সুখে, দুঃখে, স্বপ্নে সাধে মানুষ হয়েও নিম্নশ্রেণী নিজেরই স্বদেশবাসীর হাতে জল গ্রহণ করব কিনা, এই দুর্ভাগা দেশে আজও এনিয়ে প্রশ্ন। অস্পৃশ্যতা আজও এদেশের অভিশাপের মত আমাদের সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে ।[২৬]

স্বামীজি বর্তমান সমাজে নানা বিচ্ছিন্নতাপীড়িত মানুষের দিকে দৃষ্টি রেখে সকল জনগণকে আহ্বান করে বলেছেন যে, এস আমরা প্রার্থনা করি "তমসো মা জ্যোতির্গময়"[২৭] তাহলে নিশ্চয় আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে, আমাদের পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গল হস্ত প্রসারিত হবে।[২৮]

স্বামীজি লক্ষ্য করেছিলেন, জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় ভারতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। শিক্ষিত নামধেয় তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর জীবগণ তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে এদেরকে পরিত্যাগ করতে এবং নতুন নতুন সমাজ ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপূর্বক হিন্দুধর্মের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করতে নিরত। ধর্মভূমি ভারতবর্ষ আজ কেবল প্রাণহীন আচার নিয়মের সমষ্টি ও কুসংস্কারের লীলাভূমি। কিন্তু স্বামীজি এই সংশয় সংকোচ কাটিয়ে অদ্বৈত বেদান্তের ভেরী নিনাদে ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটালেন।[২৯]

কিন্তু তাঁর চরম সিদ্ধান্ত যে বেদান্ত, তা হল অদ্বৈত বেদান্ত। স্বামীজির এই অদ্বৈতবেদান্ত কোন কোন স্থলে একটু বিজ্ঞানঘেঁষা, একটু আধুনিক যুক্তিবাদঘেঁষা হলেও মূলতঃ সম্পূর্ণরূপে শঙ্করানুগামী। তবে বিবেকানন্দ দীন দরিদ্র অবহেলিতের প্রতি তাঁর স্বভাবগত সহানুভূতির আবেগ এবং ভারতভাগ্যবিধাত্রী জগন্মাতার ইচ্ছায় সেই সকল তত্ত্বের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন মানবসমাজের উন্নয়নে। বিশেষতঃ ভারতের দরিদ্র, মূর্খ, অবহেলিত নিম্নজাতির উন্নয়নের কারণ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় নিম্নজাতির ব্যক্তিরা উন্নত না হলে ভারতে উন্নতি হতে পারে না। এরা বঞ্চিত, মূর্খ, ধর্মজ্ঞানহীন থাকার ফলেই ভারতের পরাধীনতা ধর্মহীনতা প্রভৃতি সঙঘটিত হয়েছে।[৩০] তাই বিবেকানন্দের অদ্বৈতবেদান্তের উদ্দেশ্য ঃ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগতো হিতায় চ"[৩১] বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান গীতাতেও বলা হয়েছে, সকল প্রাণীর হিত সাধনে রত থেকে সংযতাত্মা ঋষিগণ পাপরহিত ও নিঃসংশয় হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।[৩২]

সর্বশেষে বলা যায়, বিবেকানন্দের সকল চিন্তাই অদ্বৈতবেদান্তের অনুসরণে অগ্রসর হয়েছে। স্বামীজি সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শনের মধ্যেও দরিদ্র, বঞ্চিত, মূর্খ, পতিত মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাদের সেবা — এই বিরাট ঈশ্বরের পূজা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে চেয়েছিলেন। তার কারণ এই যে, তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবাসীগণের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, তাদেরকে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিক্ষিত করে তোলার অসামর্থ্যই ভারতের অধঃপতনের ও পরাধীনতার প্রধান কারণ। অতঃপর বলা যায়, এই দরিদ্র ভারতের বিচ্ছিন্নতা পীড়িত মানুষদের উদ্ধারে অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৩]

উপসংহারে বলা যায়, আমাদের সমাজ বিচ্ছিন্নতাবাদে পরিপূর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাতে পঙ্গু। নিজের নিজের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে অপর জনের মত ও পথকে অস্বীকার করার প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়। স্বামীজির মত হল,

বিচ্ছিন্নতা নয়; ঐকতান, বিদ্বেষ নয়, ভালবাসা; সাম্প্রদায়িকতা নয়, সংহতি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর ভাব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নীতি একটি জাতি ও দেশকে করতে পারে সর্বতোভাবে মহীয়ান। আপন সংকীর্ণতা দূরে ফেলে দিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাবকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই দেশ ও জাতির পক্ষে সুমঙ্গল। শুধু দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে নয় — সমগ্র পৃথিবীর শান্তি আনয়নের ক্ষেত্রে স্বামীজিপ্রদর্শিত ভাব বিনিময়ের প্রথা অতুলনীয়।

অদ্বৈতভাব সমস্ত মত ও পথে চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করে এই কারণে যে, মানুষ ক্ষুদ্র নয়। সসীমের মধ্যেই বিরাজ করে অসীমতা। সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষের শান্তি। মানুষই ভগবানের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে, যদি ভাগবত সত্তাসমূহ ও গুণাবলী অর্জনে সে সক্ষম হয়। তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে ঋষির মত আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষকে। যাজ্ঞবল্ক্যের মত বলতে পারবে, প্রত্যেকের মধ্যেই নিহিত আছে অমৃত। অরণ্যে নয়, সমাজের স্তরে স্তরে প্রতিটি মানুষ যখন নিজেকে অমৃত বলে অনুভব করতে পারে তখনই সফল হবে প্রকৃত অধ্যাত্মচেতনা-ভিত্তিক ধর্মসাধনা। স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষ এই অদ্বৈত চেতনা লাভ করুক। অন্ধকারের মধ্যে হাত নাড়তে নাড়তে তদানীন্তন সমাজের মানুষ অন্ধের মত অন্ধকে অনুসরণ করছিল। স্বামীজি অবিদ্যার মধ্যে থেকে নিয়ে এলেন পরা বিদ্যা আলোর দিশারী যা মানুষকে অসৎ থেকে সৎ-এ, তম থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যায়।

অসতো মা সদ্‌গময় ।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।[৩৪]

স্বামীজি বন্ধ হওয়া দরজাতে করেছিলেন করাঘাত। আর সেই আঘাতে ভবের হাটে বৈদান্তিক ধন প্রাচুর্য্য ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের মাঝে, মানুষের মাঝে অধ্যাত্মচেতনার ভিতর দিয়ে। বিশ্ব হয়েছিল আলোড়িত রমাঁরোলা, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বিমুগ্ধ হয়েছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিপ্লবকে ('Indian Spiritual cyclone' কে) জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভ্যর্থনা। সকলেই স্বীকার করেছিলেন অদ্বৈতের অপরিহার্যতা, যা কিনা অধ্যাত্মচেতনার সর্বোচ্চ স্তর —

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"[৩৫]

১। স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ । পৃঃ ১৭৫

২। Life vol-1. P-248

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। পঞ্চম খণ্ড। পৃঃ - ২

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ষষ্ঠ খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ । (১৩৮৩) পৃঃ ৪১১

৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। দশম কণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ । (১৩৮৪) পৃঃ ২৩৮

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৮ম খণ্ড। পৃঃ ৪৮

৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । ৩য় খণ্ড। পৃঃ ২৫০
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৩য় খণ্ড। পৃঃ ২৫২
৯। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। পৃঃ ৬৭৯
১০। স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ। পৃঃ ৫২
১১। ঐ। পৃঃ ৫৩ - ৫৪
১২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ষষ্ঠ খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩) পৃঃ ৩৬৩-৩৬৭
১৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৩/১৪/১
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের স্মারক গরন্থ। পৃঃ ৬৮-৬৯
১৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । নবম খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮) পৃঃ ৪৯
১৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সপ্তম খণ্ড । চতুর্থ সংস্করণ । (১৩৮৪)। পৃঃ ২৯৩
১৭। ঐ পৃঃ -২৯৩
১৮। ঐ নবম খণ্ড । পৃঃ ৬
১৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ।তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৪২ - ২৪৩
২০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। দ্বিতীয় খণ্ড। পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪) পৃঃ ২১৯
২১। ঐ, অষ্টম খণ্ড।চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪) পৃঃ ৩৮-৯ দ্রষ্টব্য ।
২২। The complete works, Vol. III, P. 230
২৩। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। পৃঃ ১৬১
২৪। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। পৃঃ ১৯২ - ১৯৩
২৫। স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ। পৃঃ ৫৬-৫৭
২৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।ষষ্ঠ খণ্ড। পৃঃ ১৯৪
২৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৪/২৮
২৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। সপ্তম খণ্ড। পৃঃ ৫৯
২৯। বিবেকানন্দ চরিত। পৃঃ ৯২
৩০। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ । পৃঃ ৭১৬
৩১। স্বামীজি যে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙেঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মূল নীতি। স্বামীজির বেদান্তের মুক্তি বাণী হতে গৃহীত।
৩২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫/২৫
৩৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ । তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ১৬৬
৩৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৪/২৮
৩৫। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। ৩/৮ / ৬-১৫